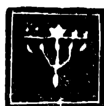
ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা

১৯৪০-১৯৫০

রেণু চক্রবর্তী



মনীষা

প্রকাশক

মণি সান্যাল

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ

৫৪/এ হরি ঘোষ স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক

অহীন্দ্র ভৌমিক

কালান্তর প্রেস

৩০/৬ ঝাউতলা রোড

কলকাতা-৭০০০১৭

সূচিপত্র

১।	প্রথম জাগরণের সাড়া	১
২।	যুদ্ধ-আতংকের মোকাবিলায়	১৬
৩।	বাঁচার লড়াই	২৭
৪।	সমাজ জীবনের পুনর্গঠন	৪৯
৫।	জাগ্রত কিষাণ	৭০
৬।	সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা	৮০
৭।	মোহভঙ্গ ও সংগ্রাম	৯১
৮।	তেলেঙ্গানার অমর কাহিনী	১০০
৯।	কেরালার পুন্নাপ্রা-ভায়লার	১১৯
১০।	পাঞ্জাবের নারী জাগরণ	১২৫
১১।	ওয়রলিদের দাসত্ব হতে মুক্তি	১৩৪
১২।	সংগ্রামে নারী-শ্রমিক	১৪০
১৩।	সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	১৫৩
১৪।	নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কাজ	১৬১
১৫।	বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণ	১৭৭
১৬।	পশ্চাৎ পট	১৮১

উৎসর্গ

পি, সি, যোশী স্মরণে

যিনি সকলের চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহ নিয়ে আমাদের শিখিয়েছিলেন, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও চূড়ান্ত অধঃপতনের নাগপাশ থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সাথীরূপে একটি সংগ্রামী নারী আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে।

লেখিকার নিবেদন

সবিনয়ে ও স্বল্প প্রত্যাশায় বইখানির আত্মপ্রকাশ।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নারী সমাজের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার সুযোগ আমি পেয়েছি। এ আমার গৌরব। এই থেকেই একটা মূলকথা বুঝতে পেরেছিলাম, যে সমাজে শোষণ নেই, মুনাফা ও লোভ থেকে যে সমাজ মুক্ত, মেয়েরা পুরুষের সম্পত্তি ও গৃহপালিত জীব নয়, সেখানেই নারীর প্রকৃত মুক্তি ঘটতে পারে। আর এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তন সম্ভব হতে পারে গণআন্দোলনের পথ ধরে। শ্রমিক মেয়ে, কৃষক মেয়ে, কৃষি কাজে নিযুক্ত মেয়ে এবং শহরের গরীব মেয়ে—এরাই তো আমাদের দেশের নারী জাতির সুবিশাল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। বহু শতাব্দীর নিপীড়নে ও শোষণে এই বিশাল নারী সমাজ নিষ্প্রাণ পঙ্গুতায় অবসন্ন। এ থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। কিন্তু প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত মেয়েদের প্রচেষ্টায় স্থানীয়ভাবে যে সব ছোট বড় সংগঠন গড়ে উঠেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী তো উঁচুতলার সমাজের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আটকে পড়ে আছে। কমিউনিস্ট মেয়েরা এইসব সংগঠনকে শহর ও গ্রামের অগণিত প্রাণোচ্ছল মেয়েদের কাছে টেনে এনে সুবৃহৎ গণসংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টা কিভাবে করে এসেছে, সে কাহিনী প্রকাশের চেষ্টা আজ অবধি তেমন কিছু দেখা যায়নি।

এ বইখানি সেই গল্প বলার একটি ক্ষুদ্র হলেও প্রথম প্রয়াস। বিগত চল্লিশ বছর নারী আন্দোলনে যাঁরা আমার বন্ধু ও সহকর্মী তাঁদের অনুরোধে আমার এ লেখা। মনের মধ্যে কিছুটা সঙ্কোচ ও ভয় নিয়েই কাজটি শুরু করেছি। কারণ লিখিত তথ্য তেমন কিছু নেই। তবুও সহকর্মী বন্ধুদের অনুরোধ ও উৎসাহ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। চল্লিশ বছর ধরে আমরা যারা কাজ করে এসেছি, তাদের অনেকেই এখন বয়ঃসীমার দিকে পা বাড়িয়েছেন। অনেকে আমাদের ছেড়েও গেছেন। তাই হাতে আমাদের সীমাবদ্ধ সময়। যেসব

পুরাতন কর্মীরা নারী আন্দোলনকে এতকাল ধরে লালন করে এসেছেন, তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাই এই কাহিনীর উৎস।

আরও একটি কারণে লেখাটি হাতে নিতে আমি সাহসী হয়েছি। আজকাল যেসব নতুন মুখ মহিলা আন্দোলনের কর্মী হয়েছেন তাদের জানা নেই সেই প্রথম যুগে কিভাবে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কি কি অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে—সে সব জানলে তাদের কাজে লাগবে। এই অনুভূতিটুকু আমাকে উদ্বুদ্ধ করে।

দিন তারিখের অনেক গোলমাল হয়তো থাকবে, অনেকের নামও সম্ভবতঃ বাদ গেছে। কিন্তু সেসব ইচ্ছাকৃত নয়। অনেক বছর আগেকার অনেক ঘটনাই হয়তো স্তিমিত, স্মৃতির পর্দা থেকে মুছেও গিয়ে থাকবে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমার যেসব কমরেড ও সহকর্মীদের কাছ থেকে আমি এই লেখার ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছি, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। তেলেঙ্গানার যশস্বী কমরেড রবিনারায়ণ রেড্ডির সঙ্গে পার্লামেন্টে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তেলেঙ্গানার সংগ্রামে সেখানকার মেয়েরা কিভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, কতখানি সমৃদ্ধ করেছিল সেসব তথ্য দিয়ে রেড্ডি আমায় সাহায্য করেছেন। কমরেড পি সুন্দরাইয়ার লেখা তেলেঙ্গানা সম্বন্ধে বইখানা এবং ঐ বিষয়েই কমরেড সি, রাজেশ্বর রাও-এর লিখিত পুস্তিকাটির জন্য আমি ঋণী। শ্রীমতি ঊষাতাই ডাঙ্গের লেখা মারাঠি ভাষায় 'কে-ই বা শুনবে?' নামক আত্মজীবনী থেকে অনেক সাহায্য আমি পেয়েছি। পার্বতীবাই ভোরের জীবনস্মৃতি থেকেও পেয়েছি অনেক তথ্য। শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছেন মীনাক্ষী সানে। তাঁর কাছ থেকে ঐ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। 'আদিবাসী বিদ্রোহ' শ্রীমতী গোদাবরী পারুলেকারের লেখা বই। তাতে পেয়েছি 'ওয়রলি' আন্দোলনের ও তাতে বিশেষভাবে 'ওয়রলি' মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে অমূল্য সব তথ্য। মহান তেভাগা অভ্যুত্থানের ত্রয়োদশ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করেছিলেন কয়েকজনের ঐ বিষয়ে লেখা কতগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ সম্বলিত একখানি বই। সেই কৃষক অভ্যুত্থান ও তাতে কৃষক মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে। নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এবং নিখিল ভারত মহিলা কনফারেন্সের কয়েকটি সম্মেলন রিপোর্ট থেকে

নানা খবর জানতে পেরেছি। সব থেকে বেশী তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি পার্টির দিল্লী কেন্দ্রীয় দপ্তর অজয় ভবনে সুরক্ষিত 'পিপল্‌স্ ওয়ার', 'পিপল্‌স্ এজ' ও 'জনযুদ্ধের' ফাইলগুলো থেকে।

এছাড়া জামালুন্নেসা বেগম, প্রমীলা মহেন্দ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যে তথ্য পেয়েছি, সেজন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাই। এইভাবেই লিট্টো ঘোষ, পেরিন রমেশচন্দ্র, মণিকুন্তলা সেন, মায়া লাহিড়ী প্রভৃতি কমরেডদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারে অনেক জানতে পেরেছি। কারণ এঁরা নানাভাবে মহিলা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বীরেন্দ্রকুমারের অনুমতি নিয়ে ছবি প্রচ্ছদপটের জন্য ব্যবহার করতে পেরেছি—সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ভারতের মহিলা আন্দোলনে এখন যেসব নতুন মেয়েরা কাজ করছেন, যেসব জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা এই সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী, আর যাঁরা মহিলা আন্দোলন সম্পর্কে একটি ছবি পেতে চান, এ বইটি যদি তাঁদের কাজে লাগে তো সেটা-ই হবে আমার বড় পুরস্কার।

আশায় থাকবো নারী আন্দোলন নিয়ে লেখায় আমার এই প্রথম প্রয়াসের পরে ভবিষ্যতে আরও বেশী চেষ্টা যত্নে আরও বেশী পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ আকারে এই বিষয়টির উপর লেখা প্রকাশ পাবে।

রেণু চক্রবর্তী

১১ই নভেম্বর, ১৯৮০

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম নবজাগরণের সাড়া

আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মেয়েদের অংশগ্রহণ একটি সুবিশেষ অর্থবহ ঘটনা। জাতীয় আন্দোলন যখন দেশব্যাপী গণসংগ্রামের রূপ নেয়, জাতীয় নেতৃবর্গ তখন দেশের বিশাল নারীসমাজকে এই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার গুরুত্ব অনুভব করে একাজে সচেতনভাবে ব্রতী হন। গান্ধীজী তাঁর দূরদৃষ্টিতে বুঝেছিলেন গৃহশৃঙ্খলমুক্ত কৃষক মেয়েদের দেশমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় যোগদান একান্তভাবে প্রয়োজন। একাজ যদি করা না হোত তবে তো দেশের অর্দ্ধাংশেরও বেশী শক্তি মুক্তি সংগ্রামের এত বড় আবর্তের বাইরেই পড়ে থাকতো।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য ও জরুরী অংশরূপে মেয়েদের স্বীকৃতিলাভ বস্তুতঃপক্ষে গান্ধীজীর আমলের আগেই ঘটেছিল। উনিশ শতকে তখনকার ভারতীয় সমাজের সংস্কারকামী উচ্চবিত্তগণ যে সময়ে স্বশাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলেন, তখন থেকে তাঁরাও নারীসমাজের শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত গণ্ডীর বাইরে এসে ব্যাপক রাজনৈতিক গণসংগ্রামের রূপ নেয়, তখন এ সংগ্রামে সাথী করা হবে সে বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। তখন নারীসমাজের পৃথক সংস্কারসাধনের প্রশ্নটি পরিবর্তিত হোল, কি করে তাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় অংশ হিসাবে আনা যায়। গান্ধীজী নির্দ্বিধায় ঘোষণা করলেন নারীজাতিকে সামন্তযুগীয় কুসংস্কারের অন্ধকারে রাখা চলতে পারে না এবং সচ্ছল সংসারের রুচিমাফিক গৃহসজ্জা-রূপেও নয়। তিনি বলেন: "আমি যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতাম তবে পুরুষের ক্রীড়নক হয়ে থাকার বিরুদ্ধে আমি নিশ্চয় বিদ্রোহী হয়ে উঠতাম।"

বিংশ দশকে অসহযোগ আন্দোলনে এবং পরবর্তী ত্রিশের দশকে ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে তাঁর উদাত্ত আহ্বান নরনারী উভয়ের জন্যই ছিল। মেয়েরাও ভারতে এই প্রথম পুরুষের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তি সংগ্রামে পথে নামলো। বৃটিশের শয়তানী আইন ভাঙার আবেদন রাখলেন গান্ধীজী—আর শত সহস্র মেয়েরা এ কাজে অংশ নিয়ে কারাগার বরণ করলেন। এই থেকেই দেশে প্রথম নারীমুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত হোল। এই প্রথমই নারীচিত্তে শক্তিশালী সংগ্রামের বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটলো। সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির দরজা খুললো। নারী পুরুষের সমান অধিকার ভারতে স্বীকৃত হোল। আইন করে এ স্বীকৃতি আসেনি—এসেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে।

ভারতে নারীমুক্তি সাধনের এই পরিবেশে আমি ও আমার সমসাময়িক মেয়েরা বেড়ে উঠেছি। সে সময়ে স্বাধীনতার জন্য নবজাগ্রত চেতনা ছিল মহান নেতৃবর্গের গৌরবময় স্মৃতিবিজড়িত। কংগ্রেস মঞ্চে প্রথম জাতীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হোল শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর কণ্ঠে। সেদিনের পরিবেশে এটাই যেন মানিয়েছিল ভাল। অ্যানি বেশান্ত ও সরোজিনী নাইডুর মতন ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীরা সেদিন খ্যাতিমান পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়ালেন আপন আপন গৌরবোজ্জ্বল প্রতিভা নিয়ে।

এ ছাড়াও আমার সমকালীন অনেক মেয়েদের কথা শুনেছি আত্মত্যাগ ও আত্মবলি দিয়েছেন দেশমুক্তির জন্য ছেলেদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এমনকি যেসব পরিবার এ ধরনের আন্দোলনকে সুচোখে দেখতেন না তাদের ঘরেও ভগৎ সিং, যতীন দাস প্রভৃতির পাশাপাশি প্রীতি ওয়াদেদার, বীনা দাস, শান্তি, সুনীতি প্রভৃতি নামগুলো তাদের মনেও দেশপ্রেম ও এদের প্রতি সম্ভ্রম জাগাতো। অন্যদের তো কথাই নয়। আমার বালিকা বয়সে জানতামই না যে ভবিষ্যতে সমাজের উন্নততর পরিবর্তনের কাজে এইসব মেয়েদেরও আমরা সাথী হিসাবে পাবার সুযোগ পাবো।

ইংরেজদের হিসেব ছিল যে প্রচণ্ড দমননীতি দিয়েই এইসব বিপ্লবীদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামী স্পৃহাকে বোধহয় দমন করা যাবে। কিন্তু তার বদলে এসব বিপ্লবীরা কারান্তরালে অথবা সাগরপারের সেলুলার জেলে বসে চিন্তায় রত হলেন যে, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ অপেক্ষা গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করার তত্ত্বকথায়। এই পথেই ও এই অস্ত্রেই দেশবাসীকে মুক্তি-

সংগ্রামে ও সামাজিক বিবর্তন ঘটানোর কাজে টেনে আনা যাবে। এ সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌঁছালেন অন্যান্য দেশের মুক্তি আন্দোলন এবং বিশেষভাবে সোভিয়েত দেশের সফল বলশেভিক বিপ্লব থেকে। এ শুধু ঐসব বিপ্লবী কর্মীদের মনে সাড়া জাগিয়েছিল তাই নয়। আমাদের দেশের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল নেহরুর মতন দেশপ্রেমিক চিন্তানায়কদের মনের উপরেও ছাপ পড়তে লাগলো সোভিয়েতের বিপ্লবের ধারা ও তার উত্তরোত্তর বিস্তারলাভের নব নব রূপ রেখায়।

দেশের যুব জনতার চোখের সামনে খুলতে লাগলো এক নতুন চিত্র যেখানে তাদের অনুভূতি হোল বাস্তব রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে এক নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যোগস্থাপন যাতে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্যের ভিৎটা ভেঙে পড়বে। তাছাড়া নারীর সত্যকারের মুক্তি সম্ভব হতে পারে, অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত সমাজে। ১৯২১ সনে লেনিনের একটি বক্তৃতা আমি পড়তে পেয়েছিলাম যেটি তিনি দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষ্যে। লেখাটি আমি পাই অনেককাল পরেই। এই নতুন বিপ্লবী সভ্যতার কথা আমি প্রথম জানতে পাই ঐ লেখাটি থেকেই। এতে তিনি বলেছিলেন রাজনৈতিক জীবনে জনগণকে পুরোপুরি নিয়ে আসা যাবেনা যতক্ষণ না নারীসমাজ এতে অংশগ্রহণ না করে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণাও করলেন—পৃথিবীর কোন দেশের কোন পার্টি অথবা কোন বিপ্লব যা সম্ভব করতে সাহস হয়নি সেই কাজটি করছে সোভিয়েতের বলশেভিক বিপ্লব। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অসাম্যের পুরোপুরি মূলোচ্ছেদ ও নারীসমাজের উপর নিপীড়ন চিরতরে বন্ধ করছে এই বিপ্লব।

কিন্তু বলশেভিক বিপ্লব যে সব বন্ধনমুক্তির উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার ছাত্রীবয়সে ভারতে তার সমস্ত সংবাদ প্রবেশের দ্বার ছিল রুদ্ধ। ইংল্যাণ্ডে যখন পড়াশুনার জন্য গেলাম তখনই এসব বার্তা আমার কাছে পৌঁছালো। কিন্তু সেখানে পরস্পরবিরোধী দুটি ছবি আমার চিত্ত গঠনে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। শুধু আমি নই তৎকালীন সমস্ত যুব মানুষেরই মনের অবস্থা ছিল এই। একদিকে সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতি ছিল ঔৎসুক্য এবং তারও বেশী ছিল জানবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে, তেমনি ছিল, গ্যেটে, বিটোফেন, টমাসমান এবং আইনস্টাইন প্রভৃতি মহামতিদের দেশে সভ্যতার বিরুদ্ধে এবং নারীসমাজের মুক্তির বিরুদ্ধে

হিটলারের ফ্যাসিস্ট যুদ্ধে আমাদের অনেকের মন ছিল ঘৃণাবিতৃষ্ণায় পূর্ণ।

এই পরস্পরবিরোধী উত্তেজনায় ভরা তখনকার যুবসমাজের মানসপটে জন্ম নিল এক উন্নততর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা। আমাদের সমবয়সী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে গভীর মননশীল যাঁরা ছিলেন, সেই বিদেশে থেকেও আমরা যেন এই চিন্তাধারার মধ্যে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যেন একটা নতুন যোগসূত্র খুঁজে পেলাম এবং আমার মহান দেশের মাতা ভগ্নীদের সত্যকার মুক্তির সম্ভাবনাও যেন খুঁজে পেলাম ঐ নবাগত সমাজব্যবস্থার পথ বেয়ে।

১৯৩৭-'৩৯ সন ধরে স্বচক্ষে দেখেছি সারা ইউরোপে ফ্যাসিজমের মুখ এবং বার্লিনে দেখেছি ফ্যাসিস্ট মিলিটারী বাহিনীদের সেই হিংসর্গতি প্যারেড—আনটারডান লিন্‌ডেনের পথে পথে। মাত্র কয়েকমাস আগে আমরা অস্ট্রিয়া দেখতে গিয়েছিলাম। শুনলাম হিটলারের বর্বর বাহিনীর দখলে চলে গেছে সেই সুন্দর দেশটি। মনে পড়তে লাগলো মিমি সেঙ্কেলের মতন অনেক মুখগুলি। চোখের সামনে ভাসতে লাগলো তাদের সঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের দিনগুলি। পরবর্তী সময়ে এই মিমি সেঙ্কেলই ছিলেন সুভাষচন্দ্রের পত্নী। (তখন সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারীর কাজ করতেন তিনি)। আমরা ছিলাম ভারতের মহান গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মূল্য বোধের মধ্যে লালিত। তাই জাত্যাভিমান ও আর্যরক্ত খুঁজে বেড়ানো ও তার প্রাধান্যের ফ্যাসিস্ট প্রচারের প্রতি আমাদের ঘৃণা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ইহুদি ও কমিউনিস্টদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনীতে আমাদের রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতো, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে এঁদের উপর এই অত্যাচার এবং গ্যাস্‌চেম্বারে হাজারে হাজারে এঁদের শ্বাসরোধী মৃত্যুবরণ কাহিনী শুনে মন আমার আতঙ্কিত হোত। 'কিণ্ডার, কিরচিং, কুচি' অর্থাৎ সন্তান ধারণ, রন্ধনশালায় আবদ্ধ এবং গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করা—এই তিনটিই হচ্ছে নারীর একমাত্র ধর্মকর্ম। হিটলারের এই নির্দেশ আমি ঘৃণা করতাম।

হিটলারের যুদ্ধযন্ত্রটি ক্রমশঃ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলো। ইউরোপীয় মানুষদের মন তখন ভবিষ্যতের ভয়ে কম্পিত। চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর আক্রমণ, সুডেটেন ল্যাণ্ডকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং মিউনিকে চেম্বারলেনের

নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ এসব ঘটনাগুলো যেন হুড়মুড় করে ঘটে গেল। এরপর যুদ্ধ আর ক'দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে? ইউরোপ অধিবাসীদের মনজুড়ে যেন এই একটাই জিজ্ঞাসা তাদের সামনে আতঙ্ক হয়ে রইল।

পাশাপাশি একটি ফ্যাসিবিরোধী শক্তিশালী রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রলো। কালোমেঘে ঢাকা আকাশে আমাদের সামনে যেন ঐ একটি রূপোলী রেখা ছাড়া আর কিছু নেই। ঐ রেখাটিরই একটি ঝলক যেন দেখতে পেলাম ফ্র্যাঙ্কো ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে স্পেনীয় ফ্যাসীবিরোধী বাহিনীর দাঁতে দাঁত দিয়ে দুঃসাহসী লড়াই। ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে অবরুদ্ধ করতে গড়ে উঠলো আন্তর্জাতিক বাহিনী। প্রগতি ও সোস্যলিজমকে রক্ষা করা তাদের ব্রত। কিন্তু ফ্যাসিজ্‌মকে পরাস্ত করতে কত যে অমূল্য প্রাণ বলি হয়ে গেল। স্পেনের নেত্রী লা-পাসিয়োনারিয়ার সেই উদাত্ত আহ্বান যেন আমার মনের উপরে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।

১৯৩৯ সনটি আমার পক্ষেও যেন বহুমূল্যবান হয়ে উঠলো। তার কিছু আগে আমি দেশে ফিরেছি। কিন্তু ওখানকার অবস্থার উপলব্ধি আমার মনেও নিজের দেশের মুক্তিকামনায় প্রেরণা যোগালো। একটি জাতীয়তা-বাদী পরিবারে লালিত হবার পরিবেশ ছিল আমার পিছনে। বিদেশে পড়তে গিয়ে এর সঙ্গে আরও একটি চিন্তাধারা আমার মানসিকতায় নতুন করে দাগ কাটলো। আমাদের দেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অগণিত পদদলিত, ক্ষুধাক্লিষ্ট, নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষদের সামাজিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই এ অনুভূতি আমার এলো। জীবনে যেন প্রথম এই বুঝলাম আমাদের দেশের মানুষ কেন এত গরীব। ক্যামব্রিজে যখন ছিলাম তখন জন ষ্ট্র্যাচীর বক্তৃতা শুনতে গেছি—'সোস্যালিজম কি চায়, তার অর্থ কি?'

তিনি খুব সহজে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেন গরীবদের তো আর কিছু নেই, আছে শুধু বিক্রী করার মতন শ্রমশক্তি। তাই-ই তারা হয় জমির মালিককে অথবা শিল্প মালিককে বেচে—কারণ উৎপাদনের যন্ত্রটি তাদেরই হাতে রয়েছে। ঘর্মাক্ত কলেবরে এই গরীবরা যে সম্পদ ও উৎপাদন সৃষ্টি করে তার সবটুকু মুনাফা ঐ মালিকব্যক্তিরা ভোগ করে। ফলে গরীবরা আরও গরীব ও ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে। যতদিন না সমাজের এই অবস্থিতির পরিবর্তন না ঘটানো যাবে, পরিবর্তে এক ভিন্নতর রূপে সমাজের কাঠামো

গড়ে তোলা যাবে যেখানে সমাজের হাতেই ন্যস্ত হবে উৎপাদনের উপায়গুলি ততদিন আমাদের জনতা তাদের শ্রমের মূল্য পাবে না। এ শুধুমাত্র আইন দিয়ে, এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে সংবিধান তুলে দিলেই এ জিনিস সুরক্ষিত হবে না। এ কাজ সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র জাগ্রত জনসাধারণ দ্বারাই। শোষণ ও ব্যক্তিগত সম্ভোগের ভিত্তিতে যে সমাজব্যবস্থা গঠিত হয়েছে সেটাকে পালটাতেই হবে। দারিদ্র্যের কারণ এবং তা দূর করার উপায় সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকুই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

সোস্যালিজ্‌ম্‌ এর অর্থ বলতে এইটুকুই আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু পড়তাম আমি কনভেন্ট স্কুলে। সেখানে এর উল্টো কথাই শেখানো হোত। ওখানে বাইবেলের কথা আমাকে শেখানো হোত। তাতে বলা হোত "গরীবরা সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকবে", অর্থাৎ গরীবের গরীবী আর মোচন করা যাবে না। গরীবদের জন্য কেবলমাত্র সদয় ব্যবহারই আমরা করতে পারি।

১৯৩৯ সন আরও একটা দিক থেকে আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফ্যাসিজম্‌-এর উত্থান ও বীভৎসতা দেখে একটা জিনিস বুঝেছিলাম, আমার শত্রুর যে শত্রু সে আমার বন্ধু হতে পারে না। অনেকের মতের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কোন মিল ছিল না, যেমন জার্মানী ও জাপান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে বলেই তারা আমাদের স্বাধীনতা পাইয়ে দিতে সাহায্য করবে, এ কখনও সম্ভব হতে পারে না। আমি নিঃসংশয়ে বুঝেছিলাম সর্বশক্তি নিয়ে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের করতে হবে। কারণ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের কুৎসিততম রূপ হচ্ছে এই ফ্যাসিজম্‌। স্বাধীনতার সংগ্রাম অবশ্যই আমাদের করতে হবে কিন্তু ফ্যাসিজম্‌-এর সহায়তা করে নয়।

দেশে ফিরে এলাম। দেখলাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভ্যুত্থান অতি দ্রুত শক্তিমান হয়ে উঠছে। অপরদিকে ১৯৩৯ সনের যুদ্ধটা যেন ১৯৪১ সনে আমাদের দেশের দোড়গোড়ায় এনে ফেলেছে। অথচ আমাদের মুক্তি সংগ্রামে জয়ী হতে হলে বৃটিশ সম্রোজ্যবাদেয় বিরুদ্ধে সংগ্রামই হবে আমাদের প্রথম কর্তব্য। আমাদের জনসাধারণকে এ বিষয়ে জাগ্রত করতে হবে। এ কথাটা আমার চেতনায় অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে। শুধু বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামই নয়, আমাদের দেশের বিশাল জনতা যারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অভাবের

অভিশাপে পিষ্ট হয়েও খেটে মরছে সমাজে তাদের ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা চাই। এই দু'টি কাজই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলেই আমার মনে হোত।

একাজে মেয়েদেরও একটি বিশেষ অংশগ্রহণের কথাও আমি ভাবতাম। আমাদের দেশে মেয়েরা জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী। এরা যদি পরিবর্তনের গতিপথ রুদ্ধ করে অনড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়•তবে সামনে এগিয়ে যাবার পথ কোথায়? অথচ এরাই যদি সমাজের পরিবর্তনকামী জনতার সঙ্গে যুক্ত হয় তবে সাফল্যের পথে বাধা কোথায়!

কিন্তু চোখ খুললে চারদিকে যা দেখি তাতে এই বিশাল শক্তি শুধু তো ঘুমিয়ে আছে তাই-ই নয়। কতযুগের সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদতায় এরা ডুবে আছে। অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার এদের অক্টোপাসের মতন জড়িয়ে আছে। শিশুকালে এদের বিয়ে হয়ে যায় এবং মাতৃত্বের স্ফুরণ ঘটলেই এরা সন্তানবতী হয়। অনবরত সন্তানের জন্ম হচ্ছে। তাদের না আছে যত্ন, না আছে পুষ্টিকর খাদ্য। ফলে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার সর্বদা উচ্চসীমায়। মেয়েদের পর-পুরুষের মুখ দেখা বা গৃহের বাইরে পৃথিবীটাকে দেখার অধিকার নেই। জবরদস্ত পর্দা প্রথার আড়ালে তাদের বাস। এই জীবন-যাত্রার ফলে মেয়েদেরও বিশ্বাস হয়ে যায় যে সন্তানের মা হওয়া ছাড়া, এবং গৃহকর্মের একঘেয়ে বোঝা বয়ে বেড়ানো ছাড়া তাদের আর কিছু করার যেন ক্ষমতাও নেই। পুরুষের উপর অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা তো আছেই, তার উপর আছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কঠোর নিয়ম, পদে পদে শৃঙ্খল, এবং পুরুষের হাতে নিম্নতর জীবরূপে সামাজিক অবস্থান। ফলে মেয়েরাও পুরুষের হাতে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে বসে থাকে। সংসারে তারা জল বয়ে আনে, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনে, ক্ষেতের কৃষিকাজের ভারও তাদের বইতে হয়। গ্রামের মেয়েদের এই-ই তো নিত্য-কারের জীবন।

এসব থেকে আমার ধারণা হোল, যদি নারীসমাজকে সত্যকারের মুক্তির মধ্যে বিকশিত করতে হয়, তবে তাদের সাম্রাজ্যবাদের বন্দীদশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল করতে হবে, এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। আমার কাছে এ যেন একটা চ্যালেঞ্জরূপে উপস্থিত হোল, ছেলেদের মধ্যে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে তারা অনেকটা মুক্ত। কিন্তু মেয়েরা যে এই বন্ধনদশায় আবদ্ধ।

সুতরাং সামাজিক অধিকার পেতে হলেও আমাদের দেশে মেয়েদের সংগ্রামকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, এ সংগ্রাম ধনিকশ্রেণী ও সামন্তশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে একটি যৌথ সংগ্রাম। শুধু তাই নয় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাকে একই সঙ্গে লড়তে হবে এবং যেখানেই যে কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নারীসমাজের প্রগতি-বিরোধী হবে সেখানেই তাকে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। মেয়েদের যদি শান্তি ও সম্মান পেতে হয়, সংসার ও শিশুর অস্তিত্ব যদি সুনিশ্চিত করতে হয় তবে এ সংগ্রামে তাকে জিততে হবে। যে জনসাধারণ খেটে খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদের উন্নততর জীবনলাভের সংগ্রাম থেকে নারীমুক্তি সংগ্রামকে আলাদাও করা যায়না এবং তা সাফল্যও পেতে পারে না। এই অনুভূতিই আমাকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে এসেছে এবং কমিউনিস্ট পার্টিও কমিউনিস্ট মেয়েদের মনে এই নবচেতনা জাগ্রত করেছে।

আমার জন্মস্থান বাংলায় ফিরে এসে নতুন জিনিস দেখলাম। আমার চারদিকেই জনসাধারণের জাগ্রত হবার দৃশ্য দেখছি। সারাদেশটা জুড়ে এক বিশাল অভ্যুত্থানের ঘূর্ণী চলছে এবং তার মধ্য থেকে নানা শক্তি নানা রূপে ভেঙে বেরিয়ে আসছে।

বৃটিশরাজ যাদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে যেসব বিপ্লবীদের জেলে বন্দী রেখেছে তাদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হচ্ছে এবং মেয়েরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এই আন্দোলনের ফলে কিছু বন্দীরা ছাড়া পেলেন কিন্তু অনেকেই জেলখানায় আটক রয়ে গেলেন। নানা রাজনৈতিক মতবাদের মেয়েরা, কমিউনিস্ট, এবং কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মেয়েরা এই বন্দীমুক্তি আন্দোলনে একত্রে সমবেত হলেন। ৯৮ নং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে একটা অফিস খোলা হল। ওখান থেকেই মহিলা রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের আন্দোলন সংগঠিত করতেন। একত্র হয়ে সকলে মিলে কংগ্রেস মহিলা সংঘ গড়ে তুললেন। ওতে ছিলেন শ্রীসংঘের লীলা রায়, যুগান্তর গ্রুপের বীনা দাস ও কমলা দাসগুপ্ত, যুগান্তরের ভূতপূর্ব সদস্যা কমলা চ্যাটার্জী, যিনি পরে গোপন যুগের কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যা হলেন এবং আরও নানা মতের মেয়েরা। সম্মিলিত মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার এই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক মহিলা কর্মীরাই ছিলেন এর পুরোভাগে। ইতিপূর্বেই 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন' পশ্চিম

বাংলায় ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সংগ্রামী মহিলা কর্মীরা একে নারীসংগঠন হিসাবে তেমন মূল্য দিতেন না। কংগ্রেস মহিলা সংঘের মুখপত্র হিসাবে 'মন্দিরা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোল। এটি ছাপা হোত সরস্বতী প্রেসে এবং এর সম্পাদিকা ছিলেন কমলা চ্যাটার্জী। বছর খানেক কমলা চ্যাটার্জী এটা চালালেন। কিন্তু তার পরেই কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব শুরু হওয়ায় তিনি ছেড়ে দিলেন। নতুন সম্পাদিকা হলেন কমলা দাশগুপ্তা।

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ক্রমশঃই শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট মেয়েরাও সংখ্যায় বাড়তে লাগলেন। পার্টি অবশ্য তখন বেআইনী ঘোষিত ছিল। এ আন্দোলনে কংগ্রেস মহিলা সংঘ যোগ দিলেন। রাসবিহারী এভেনিউর মোড়ে মেয়েদের প্রথম একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় মেয়েদের দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা তখনকার দিনে খবই বিরল ঘটনা ছিল। লতিকা সেন, কমলা চ্যাটার্জী, মনিকুন্তলা সেন—প্রভৃতি কমিউনিস্ট মেয়েরা, শ্রীসংঘের লীলা রায় ও তাঁর সহকর্মীরা, গান্ধীবাদী কংগ্রেস সদস্যা লাবণ্য লতা চন্দ সবাই এই সভায় যোগ দিলেন। এই মিটিংএ মনিকুন্তলা সেন প্রকাশ্যে প্রথম বক্তৃতা করেন, যিনি পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট সুবক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মিটিং-এ প্রচুর লোক হোল। তাঁরা রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে মহিলাদের বক্তৃতা শুনলেন। শ্রোতাদের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সবাই মন দিয়ে শুনলেন। দাবীটা লোকের মনে দাগ কাটলো এবং আন্দোলনও বাড়তে শুরু করলো।

১৯৩৯ সনে আমি যখন দেশে ফিরেছি, তখন আন্দোলন খুব জোরদার চলছে, বিশেষ করে আন্দামানে যেসব বন্দীরা ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে সকলেই আগ্রহী। ছাত্ররা ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ১৯৩৯ সনের শেষ দিকে ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের (এ, আই, এস, এফ) জাতীয় সম্মেলন হোল। আমি তাতে যোগ দিয়েছিলাম। সুভাষচন্দ্র বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সুবক্তা তো তিনি ছিলেনই কিন্তু আমি তাঁর অনর্গল উর্দু বক্তৃতা শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম। এখানে স্থির হোল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতেও সে আন্দোলন চলবে। রাজবন্দীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন দ্বিতীয় মহা-

যুদ্ধের আরম্ভের সময়কার বন্দী। তাছাড়া আন্দামানের জীবন্ত নরকে দীর্ঘমেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীরা ভুগে মরছেন। দেউলী বন্দী-নিবাসেও তাই।

এ আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ছাত্রদের ডাকা বড় বড় সভা ও মিছিলে ছাত্রীরাও বহুসংখ্যায় যোগ দিতে লাগলো। এ চিত্র ছিল সারা ভারত-ব্যাপী। এ অবস্থায় ছাত্রীদের একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হোল। ছাত্র ফেডারেশনে ছাত্র সংখ্যা স্বভাবতঃই বেশী। ছাত্রীরা বহু সংখ্যায় এতে যোগ দিতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ছেলে মেয়েদের এক সঙ্গে পড়াশুনা করতেও অভিভাবকদের মনে বাধা ছিল। স্কুল কলেজে সহশিক্ষা তখনও সচল হয় নি। যাঁরা কন্যাদের উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে দিতে চাইতেন তাঁরাও ছেলেরাই যেখানে বেশী তেমন কলেজে মেয়েদের পড়তে দিতে আপত্তি করতেন।

সুতরাং এ, আই, এস্, এফ্ সিদ্ধান্ত নিল ছাত্রীদের জন্য একটা পৃথক কমিটি করবার। এ কমিটিতে কারা সদস্য ছিল আমার মনে নেই। শুধু একটি রোগা, ছোটখাটো কিন্তু যেন একটা বিদ্যুতের ফলার মতন একটি মেয়ের কথা আমার খুব মনে আছে। সে যশোহরের মেয়ে। নাম কনক দাশগুপ্ত, (পরে অবশ্য মুখার্জী হন)। সে আমার কাছে প্রায়ই আসতো এবং আমাকে ওদের বি, পি, এস্, এফ এর অন্ধকার খুপড়ি একখানা ঘরে নিয়ে যেতো। এখানেই আমার পরিচয় হতে লাগলো বেশ চোখা চৌকশ ছাত্রী কর্মীদের সঙ্গে। এরা অনেকে বে-আইনীযুগের কমিউনিস্ট পার্টিরও সদস্য ছিল। কল্যাণী মুখার্জীর সঙ্গে আমার ওখানেই দেখা হয়। পরবর্তীকালে সে ছিল কল্যাণী কুমারমঙ্গলম। সে ছিল বিখ্যাত ছাত্রনেতা, বিশ্বনাথ মুখার্জীর ভাই-ঝি। লেবার পার্টি থেকে এল গীতা ব্যানার্জী, এম, এন, রায় গ্রুপ থেকে শোভা মজুমদার ও সৌম্যেন ঠাকুরের গ্রুপ থেকে এলো অনিমা মজুমদার। তখনকার ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল দেশের বিভিন্ন দলমত থেকে আগত সংগ্রামী ও সমাজের আমূল পরিবর্তনকামী মেয়েরা। ১৯৪০ সনে লক্ষ্ণৌতে ভারতের সব প্রদেশ থেকে আগত ছাত্রী মেয়েদের একটি সমাবেশ হোল। এটি ছিল ছাত্রীদের প্রথম সারাভারত সম্মেলন। এদিক থেকে ইতিহাসে এর একটা স্থান অবশ্যই আছে, লক্ষ্ণৌ-এর বড়াদারী নামক একটি বিখ্যাত ভাস্কর্যমণ্ডিত স্থানে সেদিন যেসব অল্পবয়সী, ও উজ্জ্বল

দীপ্তিশালী মেয়েদের দেখেছিলাম তাদের কথা এখনও মনে পড়ে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, যিনি ছিলেন যৌবনের ধাত্রী এবং নিজে যিনি কখনও যৌবনোত্তর হননি—তিনিই উদ্বোধন করলেন এই সম্মেলনের। তাঁর বাগ্মিতা ও কবিতা সবই যেন অনলবর্ষী। তিনি ঐ মেয়েদের বললেন 'দেশের ভবিষ্যৎ তোমাদেরই হাতে, যদি তোমরা গৃহাভ্যন্তরের একঘেয়েমী অলসতায় জীবনের অপচয় না করো'। বললেন "ছাত্রদের সঙ্গে সম্মিলিত হও এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান প্রবাহধারার সঙ্গে যুক্ত হও," ঐ সভায় সভা-নেত্রীত্ব করবার সম্মান আমি পেয়েছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম ফ্যাসি-বাদের বীভৎসতার কথা—যা ছিল সাম্রাজ্যবাদেরই চূড়ান্তরূপ। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনীয়দের অভূতপূর্ব বিক্রমশালী সংগ্রামের কথা, আর তার নেত্রী লা-পাসিওনারিয়া, যিনি ছিলেন পৃথিবীর নারীজাতির গৌরব—এসব কথা বলেছি। আর তা ছাড়া এই ফ্যাসিবাদের গতি স্তব্ধ করার জন্য ইউরোপ থেকে চীন পর্যন্ত যে অভূতপূর্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে—তার কথাও বললাম। এই সম্মেলন ওখানে একটি সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। দীর্ঘকাল পরে যখন আমি পার্লামেন্টে প্রবেশ করি, মনে পড়ে তখন শ্রীরামমনোহর লোহিয়া একদিন আমায় বলেন, তিনি নাকি সেই লক্ষ্ণৌ-এর ছাত্রী সম্মেলন দেখেছিলেন এবং আজও সেকথা তাঁর মনে আছে। আমি নিজে একবার কালকা মেইলে কলকাতা আসার পথে আসানসোলে উপরের বার্থ থেকে এক মহিলা আমাকে খুব লক্ষ্য করছেন দেখলাম, এতে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মহিলাটি আর চেপে রাখতে পারলেন না। নীচের বার্থে নেমে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন, একটু দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা আপনি কি কখনো লক্ষ্ণৌ-এ ছাত্রী সম্মেলনে গিয়েছিলেন? বললাম, হ্যাঁ গিয়েছিলাম তো! সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে লাগলাম মহিলাটি কে। উল্টে তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি কি রেণু চক্রবর্তী?' উত্তরে বললাম 'হ্যাঁ'। তাঁর নাম জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'শকুন্তলা কিদোয়াই'। এখন তিনি দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলারের পত্নী। ভাবছিলাম সেই প্রথম সারাভারতে ছাত্রী সম্মেলনে সমাজের কত বিভিন্ন স্তর থেকে কত মেয়েই না এসেছিল।

লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে একটা মজার ব্যাপারও ঘটেছিল। হিন্দু আইনকে

বিধিবদ্ধ করার বিরুদ্ধে একটা জনমত তখন দেখা দিয়েছিল, এ বিষয়ে সম্মেলনে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাবের উপরে উত্তেজিত বক্তৃতারত কনক দাসগুপ্তের একটি ছোট পাখির মতন চেহারাটি ও তেজ দেখে খুবই আমোদ পেয়েছিলেন এবং খুব খুসীও হয়েছিলেন। এর পর দিল্লীতে সারা ভারত জাতীয় ছাত্র সম্মেলন হয়। লক্ষ্ণৌতে যে ছাত্রী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, শুধু বাংলায় নয়, বম্বে ও পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য স্থানেও ছাত্রী সংগঠন হতে থাকে। অনেকের নাম আমার মনে পড়ছে। নার্গিস বাটলিওয়ালা, পেরিন ভারুচা, শান্তা গান্ধী, কনক দাসগুপ্তা, গীতা রায়চৌধুরী এবং আরও অনেক অল্পবয়সী মেয়েরা মহা উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে সর্বত্র ঘুরে ছাত্রীদের সংগঠিত করতে লাগলো।

সে সময়ে এইসব ছাত্রী মেয়েরাই ছিল মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিত অংশ। মহিলাদের নানাবিধ সমস্যা থেকে এরা কখনও দূরে থাকেনি। যেসব ছাত্রী নেত্রীরা বুঝেছিল তাদের ছাত্রীজীবন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বর্তমান পরিবেশে খুব বেশী দিনের জন্য নয়, আজ তাদের ধন্যবাদ জানাতে হয়। এরা বুঝেছিল ভারতের সাগর সমান বিশাল নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে তারাই একটু লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছে। তাই নারী সমাজের অন্য সমস্ত সমস্যা থেকে তাদেরও রেহাই নেই—একমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগটুকু ছাড়া। অতএব এই বিশাল নারীসমাজকে সংগঠিত করার সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাদের গ্রহণ করতে হবে। প্রায় সর্বত্রই মহিলা আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে অল্পবয়সী ছাত্রী নেত্রীরাই বহুল পরিমানে দায়িত্ব নিয়েছে। ছাত্রী আন্দোলন ও মহিলা আন্দোলনকে যে সব ছাত্রী নেত্রী দুটিকে পৃথক অস্তিত্বরূপে দেখেনি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এরাই মহিলা আন্দোলন গড়ে তোলে। অবশ্য ছাত্রী সংগঠনের কাজ শুধু ছাত্রীদের মধ্যেই থাকবে এরকম মতবাদও ছিল। এই সমস্যার সমাপ্তি ঘটে ছাত্রীদের পৃথক সংগঠন তুলে দিয়ে এ, আই, এস, এফ এর মধ্যে সোজাসুজি মিশে যাবার মধ্য দিয়ে।

বাংলা, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সংগ্রামী মহিলা গণসংগঠনের পত্তন এদের দ্বারাই হয়েছিল। বাংলাতে তো সব জেলাতেই এরকম হয়েছিল।

পাঞ্জাবে পেরিন ভারুচা, লিট্টো রায়, পূরণ মেহতা, শীলা ভাটিয়া ছাত্রী আন্দোলনের সঙ্গে এসে গেল। কি করে ছাত্রীদের সংগঠিত করতে হবে

এরাই সে চিন্তা শুরু করে। ছাত্রীদের তখন কোন পৃথক সংগঠন ছিল না। কিন্তু কিছু ছাত্রীদের নিয়ে ছোট একটি সমিতি ছিল। ১৯৪০ সনে লিট্টো রায় তার সভানেত্রী হয়। সে সময়ে জেড্ এ আমেদ, সাজ্জাদ জাহির, করণ সিং মান এরা সবাই কমিউনিস্টদের শিক্ষা ক্লাশে (ষ্টাডি সার্কেল) আসতেন। সে সময়কার বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ঐ মেয়েরা এঁদের পড়ানোর ক্লাশে যোগ দিত, এরা কিনার্ড, ফতেচাঁদ এবং লাহোর কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে কাজ শুরু করে। অনেকে মেয়েদের কমনরুমে গিয়ে পুস্তিকা, প্রচারপত্র এবং বই বিলি করতে যেত। এসব তখন নিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা ছিল, লায়ালপুর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে ছাত্রী সংগঠন গড়ে উঠলো।

১৯৪১ সনে দিল্লীতে ২০,০০০ ছাত্রদের একটি বিশাল শোভাযাত্রা হয়। এতে বহু সংখ্যক ছাত্রীরা ছিল। কমিউনিস্ট সদস্যা সরলা গুপ্তও তাতে ছিলেন। এরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে এবং আন্দামান বন্দীসহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করে।

ছাত্রীরা আরও একটি কাজ তখন করতো। এরা সাধারণভাবে শিক্ষিকাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করত। অনেক মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষিকাদের কাছেও যেতো। দেশের বহু জায়গায় মহিলাদেরও মিটিং, সম্মেলন ইত্যাদি হতে শুরু করলো।

এই সময়ে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। যুদ্ধের কালো ছায়া খাদ্যের দোকানের সামনে বিরাট লাইনের রূপ নিল। শীলা ভাটিয়া গান লিখতে ও গাইতে শুরু করলেন। এ গান ছিল ঐ লাইনে দাঁড়ানো ক্ষুধাকাতর মেয়েদের কাছে তার আশার বাণী। স্বতন্ত্র ভগতের দেওয়া মর্মস্পর্শী সুরে বাংলার দুর্ভিক্ষের কাহিনী শীলা মেয়েদের কাছে গেয়ে শোনাতো যা তাদের হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতো। এই সব প্রাত্যহিক জীবন কাহিনী নিয়ে কত না নাটক লিখেছে এবং নিজেরাই অভিনয় করে দিয়েছে। সাথে সাথে পার্টির ষ্টাডি ক্লাশগুলিরও জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

বাংলায় এই সময়ে যশোরে একটি ছাত্রী সম্মেলন হয়। খুব বড় সমাবেশ হয়েছিল। ছাত্রী আন্দোলন যে কি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল এ সমাবেশ দেখে তা বোঝা গেল। তখনও কিন্তু ছাত্রীদের বাইরে গিয়ে কাজ করায় সমাজের বাধা যথেষ্টই ছিল। প্রায় প্রতিটি মেয়েকেই এ নিয়ে বাড়ীর সঙ্গে মতান্তর ও রাগারাগি সহ্য করতে হোত। অনেক মেয়েকে তো অবস্থা

অসম্ভব হবার জন্য পরিবার ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। না হলে কাজ করতে পারতো না। এতে বোঝা যায় ঐ সব মেয়েদের রাজনৈতিক চেতনা, একাজে যার নির্দেশ তারা পেয়ে যেতো।

১৯৪০ সনে কনক দাসগুপ্তকে বৃটিশ সরকার বাংলার বাইরে বহিস্কার করেছিল। ছাত্রীসংঘের দায়িত্ব তখন কল্যাণী মুখার্জীকে নিতে হোল।

১৯৪১ সনে পাটনায় ছাত্র সম্মেলন হয়, তখন ছাত্রী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৫০,০০০ হাজার। কলকাতা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পাটনা, রাজশাহী, বাঁকুড়া এবং অন্য সর্বত্র এই সংগঠনের শাখা স্থাপিত হয়। কনক দাসগুপ্ত ও কল্যাণী মুখার্জী ছাড়াও কত ছাত্রী নেত্রীরা এসে গেল। কলকাতায় অলকা মজুমদার, শোভা রায়, শান্তি সরকার, পাবনার প্রতিমা দাসগুপ্ত, রাজশাহীর প্রীতি সরকার, বরিশালের বাণী দাসগুপ্ত, আর যশোর থেকে সদ্য চলে এলো এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা গীতা রায়চৌধুরী, পরে সে গীতা মুখার্জী হয়েছিল।

জাতীয় জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন জুড়ে স্বাধীনতার আন্দোলন তখন বেড়ে চলেছে। এটা বোঝা গেল, যেরূপ দ্রুতগতিতে ফ্যাসিস্টরা এগিয়ে এসেছে তাদের ঠেকানোর জন্য দেশের জনসাধারণের সমাবেশ ঘটানো বৃটিশ রাজদের পক্ষে অসম্ভব। উল্টে বরং তারা ১৯৪২ এর ৯ই আগষ্ট তারিখে গান্ধীজীকেই গ্রেপ্তার করে বসল। দেশের প্রায় সব নেতাদেরই জেলে আটক করলো। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বৃটিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধের রূপে ফেটে পড়লো। সরকার মিটিং এর উপর নিয়ন্ত্রণ চালু করলো। জনতার উপরে ছেড়ে দেওয়া হোল বল্গাহীন অত্যাচার। গান্ধীজীর আটক ও অন্যান্য কংগ্রেস বন্দীদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ছাত্র ফেডারেশন স্ট্রাইকের ডাক দিল। কমিউনিষ্ট পার্টি ডাক দিল অবিলম্বে নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। তাঁদের সঙ্গে সরকার আলোচনা সভায় মিলিত হোন, কি করে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠিত হতে পারে তার উপায় স্থির করা হোক। কারণ একমাত্র জাতীয় সরকারই ফ্যাসিষ্টদের উদ্যত আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে পারে। কমিউনিষ্ট পার্টি নিজেরাই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য প্রচার করতে লাগলো। কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে এবং ফ্যাসিবাদ রুখতে হলে এটাই একমাত্র পথ। কমিউনিষ্ট মেয়েরাও এই প্রচারে নামলেন। একদিকে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠনের

প্রয়োজনে জাতীয় নেতাদের মুক্তি, অপর দিকে বাংলাদেশকে দ্রুত দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করা, তাছাড়া 'যুদ্ধের প্রচেষ্টার' নাম করে জনসাধারণের উপর নিরর্থক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো—এসবই যেন একসঙ্গে কমিউনিষ্ট মেয়েদের উপরে এসে পড়লো এবং এক বিপুল কর্মোদ্যমের পথে তাদের ঠেলে নিয়ে চললো।

কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ১৯৪২ সনের ২ মাস বাদে উঠে গেল। বাংলায় প্রথম পার্টির প্রাদেশিক মহিলা ফ্রন্ট গঠিত হোল।

কমিউনিষ্ট মেয়েরা পূর্ববর্ণিত কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এলো এবং এ কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য মহিলাদের সংগঠিত করতে লাগলো। এ কাজে কমিউনিষ্ট মেয়েরা প্রত্যেকটি বাড়ী বাড়ী ও দুয়োরে দুয়োরে উপস্থিত হতে লাগলো। দরজা খুলে মেয়েরা বেরিয়ে এলে আমার তাদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে বর্তমান বিপদের অবস্থায় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের দেশকে রক্ষা ও আমাদের সম্মানরক্ষা—এতো আমাদেরই করতে হবে। এতে আমাদের স্বনির্ভরতা চাই। তাই জাতীয় সরকার গঠনের জন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কাজে আমাদেরও সাহায্য করতে হবে। সেই সরকারই পারবে সমস্ত জাতিকে একত্র সমবেত করতে। এই জন্যই জাতীয় নেতাদের মুক্তি আমাদের পেতেই হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ-আতঙ্কের মোকাবিলায়

১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাস। সারা পৃথিবীকে আতঙ্কে কাঁপিয়ে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৪০ এর মাঝামাঝি নাগাদ ইওরোপের অধিকাংশ দখল করে নিল হিটলার বাহিনী। ১৯৪১ এর গ্রীষ্মকালে আক্রান্ত হল সোভিয়েত রাশিয়াও। চতুর্দিক থেকে একযোগে আক্রমণ। যেমন অভূতপূর্ব এই আক্রমণ, তেমনি অভূতপূর্ব ৯০০ দিন ধরে অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের বীর নর নারীর দুর্ধর্ষ প্রতিরোধ।

হিটলার রাশিয়াকে শুধু জয় করতে চায়নি, চেয়েছিল একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে। তাই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে দলে দলে নিরীহ মানুষকে পশুর মত গাদাগাদি করে নির্মমভাবে মেরে ফেলেছে গ্যাস চেম্বারে ঠুসে দিয়ে।

পুরুষরা যুদ্ধে গেলে মেয়েরা যে শুধু ক্ষেত-খামার কল-কারখানাই চালু রেখেছে তা নয়। তারা লড়াইয়ের হাতিয়ারও তুলে নিয়েছে হাতে। হাজারে হাজারে সোভিয়েত বালিকা আর নারী গেরিলা যুদ্ধের সৈনিক হয়ে অসম সাহসে, মরণজয়ী নির্ভীকতায় লড়েছে, যে বীরত্বের তুলনা নেই কোন দেশে বা কালে।

এই বীর নারীদের বীর্যের প্রতীক হয়ে রইল জয়া কসমভেমইয়ানস্কায়া। বালিকা জয়া, বালক শুরা—দুটি ভাইবোন দুই দুর্ধর্ষ গেরিলা ভয় জানেনি, মৃত্যু মানেনি, অত্যাচার গায়ে মাখেনি। তাদের হাতে পদে পদে পর্যুদস্ত হয়েছে বর্বর নাৎসী শক্তি। অবশেষে ধরা পড়ে জয়া। বালিকা বন্দিনীর ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলেছে দিনের পর দিন, তার নজির দুনিয়ার বর্বরতার ইতিহাসেও নেই। তবু মুখ খোলেনি বালিকার।

ইওরোপের অন্যপ্রান্তে, ফ্রান্সে তখন আরেক ইতিহাস রচনা করে চলেছেন

সেখানকার গুপ্ত বাহিনীর নারী সৈনিকরা—ড্যানিয়েল ক্যাসানোভা যাদের অন্যতমা শহীদ। আমেরিকার পুকিপসিতে ১৯৩৮ সনে অনুষ্ঠিত যুব কংগ্রেসে ড্যানিয়েল ক্যাসানোভার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

গুপ্ত বাহিনীর প্রথম সারির পেছনে থেকে হাজার হাজার নারী সৈনিক অদম্য সাহসে, অমিতবীর্যে লড়েছে। কোন যুদ্ধে এত বেশী সংখ্যায় নারীদের যোগদান এই প্রথম এবং এক ইতিহাস। হিটলারী নীতিতে নারীরা শুধু রান্নাঘর এবং সন্তান ধারণেরই যোগ্য। ফরাসী দেশে সেই নারীদের কাছেই বিপুলভাবে লাঞ্ছিত, বিপর্যস্ত হতে লাগল হিটলারের বাহিনী। স্বভাবতঃই স্বাতন্ত্র্য এবং প্রগতিকামী নারীর ঘৃণিততম শত্রু হল প্রগতি বিরোধী, স্বাতন্ত্র্য-হন্তা, বর্বর অত্যাচারী নাৎসীবাদ।

এক দিকে ইওরোপে দেশের পর দেশ জয় করে চলেছে নাৎসী বাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নির্ভীক মানুষের মরণ-জয়ী সংগ্রাম। এশিয়ায় মাথা তুলেছে জাপানী ফ্যাসিবাদ—তার বিরুদ্ধে চলেছে চীনের মানুষের গণ প্রতিরোধ।

ইওরোপ, এশিয়ার জাগ্রত জনতার বুকের আগুনের হল্কা এসে পৌঁছেছে ভারতের মানুষের বুকেও।

জাপানীরা দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে বিশ্ব-যুদ্ধ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

জাপানীরা ক্রমশঃ ভারত সীমান্তে এগিয়ে আসে। আমাদের সামনেও আসে যুদ্ধের সংকট। বৃটিশ শক্তি পিছিয়ে এসে বঙ্গ দেশে ঘাঁটি স্থাপন করে আসাম-বাংলা ফ্রন্টে যুদ্ধ চালাবার জন্য। যুদ্ধের কৌশল হিসাবে উপকূল ভাগের সব নৌকা ধ্বংস করে ফেলা হয়, চাষ-বাস নিষিদ্ধ হয়। জাপান রেঙ্গুন অধিকার করার পর, রেঙ্গুনের চালও না পাওয়া যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়। সেই সঙ্গে মজুতদার, মুনাফাখোররা তৎপর হল। মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের সামান্য যা জোগান ছিল, তা গিয়ে তাদের গোপন গুদাম জাত হয়। একে অভাব, যেটুকুও পাওয়া যায় তারও দাম আকাশ-ছোঁয়া। যুদ্ধের শংকা, খাদ্য-বস্ত্র-জ্বালানীর অভাব মিলে এমন একটা বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হল—যা ভারতে আর কখনও হয়নি।

তারপর মিত্র শক্তির মিলিত বাহিনীও দলে দলে এসে জমায়েত হতে

লাগল। দেশের নানা জায়গায় বিমানক্ষেত্র তৈরী হতে লাগল। সৈন্যদের জন্য রসদ সংগ্রহের ফলে আরো খাদ্যাভাব হল। চালের দাম আরো বাড়ল, তা বাজার থেকে উধাও হতে লাগল কালো-বাজারীদের কৃপায়। এক অকল্পনীয় অবস্থা। কত মানুষ না খেয়ে মরল, বস্ত্রের অভাবে লজ্জায় আত্মহত্যা করল কত নারী তার হিসাব নাই।

তার ওপরে বৃটিশ ও মার্কিনী সৈন্যদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নারীর ওপর অত্যাচারের সংবাদও আসতে লাগল। যুদ্ধ-কালীন সেন্সর ব্যবস্থার দৌলতে এইসব খবর সংবাদপত্রে ছাপা হত না। নোয়াখালির গ্রামে ঘটিত একটি এই রকম অত্যাচারের কাহিনী জানান শ্রীমতী সুশীলা মিত্র ও তাঁর কর্মীদল, যাঁরা পরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আমরা মহিলাদের সই সংগ্রহ করে একটি স্মারকলিপি বড়লাটের কাছে পাঠাই।

জাপানী আক্রমণ এগিয়ে আসতে থাকে। ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম জাপানী বোমা পড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে পড়ে পাঁচবার। অন্যান্য জায়গা থেকেও বোমা পড়ার খবর আসতে থাকে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম এবং কাঁকিনাড়ায়ও বোমা পড়ে।

প্রথমবার বোমা পড়তেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। শহর ছেড়ে যাবার হিড়িক পড়ে যায়। যে রকম যান হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই ধরে পাগলের মত দিক-বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে মানুষ ছোটে গ্রামে গঞ্জে মফঃস্বল শহরে যেখানে বোমার ভয় কম। ঘর বাড়ী ছেড়ে এমনি দিশে-হারা ছোটা জানা ছিল না ভারতের। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। শহর প্রায় শূন্য হয়ে গেল। যাওয়া হল না শুধু নিম্ন-বিত্ত আর খেটে-খাওয়া মানুষদের। কলকাতার মাটি আঁকড়ে থাকতেই হল তাদের। রুজি রোজগার ছেড়ে গেলে খাবেই বা কি, আর খাওয়াবেই বা কি? তাই রয়ে গেল বস্তির মানুষ আর গরীবের দল।

এর মধ্যে অনলস কাজ করে চলে আমাদের কর্মীরা। এই ছত্রখান আর সন্ত্রাসের অবস্থার মধ্যেও এদের বিয়ে হয়েছে কি না, ছেলেপুলে কটি এমনি ধারা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আশ্চর্য! আজীবন অশিক্ষা, কুসংস্কার আর আব্রুঢাকা গণ্ডীকাটা জীবনের মধ্যে থেকে এই মেয়েদের মনগুলিও এঁদো পল্বলের মতই হয়ে গেছে। আমরা ঘরে ঘরে যাই সকলের সঙ্গে বিনা

সঙ্কোচে কথা বলি দেখে ওরা আমাদের আলাদা একটা জাত ভাবত। আবার সহানুভূতিও পেয়েছি। কারণ আমরা এদের সঙ্গে আলোচনা করেছি খাদ্য সমস্যা নিয়ে, জাপানী বোমার হাত থেকে বাঁচার সমস্যা নিয়ে, দেশ রক্ষার প্রশ্ন নিয়ে—অর্থাৎ যা এদের, এদের পরিবার আর সন্তানদের রোজকার জীবনের সাথে জড়িয়ে ছিল, সেই সব অতি বাস্তব, অতি জীবন্ত তখনকার সব সমস্যা নিয়ে। অনেকেই আমাদের আঞ্চলিক সমিতির সদস্যও হলেন। আবার দেখা মাত্র অনেকেই তাড়িয়েও দিতেন। পুরুষেরা অনেক অশালীন মন্তব্য করতেন ; বাড়ীর মেয়েদের আমাদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন। এর মধ্যে কাজ করা কত যে কঠিন ছিল তা আর কি বলব। তবু পিছিয়ে থাকেনি কাজ। আমাদের কর্মী মেয়েদের ধৈর্য ও পরিশ্রমে তা এগিয়েই গেছে।

বিশেষ করে এই জন্য যে, তাঁরা বুঝেছিলেন পরিস্থিতি যেমন কঠিন, সমস্যাও তেমনি গুরুতর ; তাই মেয়েদের এসব বুঝিয়ে বলতেই হবে—এ কাজ যতই কঠিন হোক আর নিজেদের যতই কষ্ট হোক কাজ চালিয়ে যেতেই হবে, এবং গেছেও।

আরেক দিক থেকে এল আক্রমণ। তখন "ভারত ছাড়" আন্দোলন চলছে। আন্দোলনকারীরা বলতে লাগলেন—তাঁদের এই আন্দোলন জাতীয়তার আন্দোলন। যেহেতু, তাঁরা যুদ্ধ-বর্জন ও যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে বানচাল করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। এই জাতীয়তাবাদীরা আমাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালাতে লাগলেন যে কম্যুনিস্ট মেয়েরা এই ভারত-ছাড় আন্দোলনে যোগ না দিয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারত-রক্ষার আন্দোলন চালাচ্ছে, অতএব তারা জাতীয়তা-বিরোধী। এই জাতীয়তা-বাদী দলগুলোর মধ্যে—সবচেয়ে বেশী বিষোদ্‌গারী ছিল ফরোয়ার্ড ব্লক। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল জাপানীদের সাহায্যে ভারত উদ্ধারের জন্য স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র আসছেন জাপানী বাহিনীর সঙ্গে। সুতরাং এই সব দলের উগ্র এবং রূঢ় প্রচারের মোকাবিলা কিভাবে যে আমাদের কর্মীদের করতে হয়, তা বর্ণনার অতীত। দৈহিক আক্রমণ থেকেও বাদ পড়েনি তারা।

আমরা যে শুধু ফ্যাসীবাদের কবল থেকে ভারতকে বাঁচাবার জন্য লড়ছিলাম তা নয় ; সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির জন্য এবং জাতীয়

সংহতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যও আন্দোলন করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা সে সব আমলেই আনেনি।

এই সময়েই একদিকে চলে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের এক গৌরবময় অধ্যায়; আর একদিকে ভারত সীমান্তের দিকে জাপানীদের অগ্রগতি। ভারতের মেয়েরা রুদ্ধ-নিশ্বাসে আর মুগ্ধ-বিস্ময়ে শোনে স্তালিনগ্রাদ্ ফ্রন্টে, ইস্পাত-কারখানার কর্মী অলা কোবালোবা ও তার মত হাজার হাজার নারীর আত্ম-দানের কথা—জ্ঞাত অজ্ঞাত আরো কত কোবালোভার রক্তের অবদানের কথা। যুদ্ধের প্রথম ক'দিনেই প্রাণ হারায় অগণিত পুরুষ, নারী, শিশু। কিন্তু তার পর ফ্যাসী শক্তিকে থামতে হয়। শুধু থামতে হয় না, ফ্যাসীবাদের সমাধি রচিত হয় স্তালিনগ্রাদের মাটিতে, লাখো বলিষ্ঠ প্রাণের রক্তের মূল্যে। স্তালিনগ্রাদের জয় হয়, জনগণের জয় হয়। স্তালিনগ্রাদের জয় শুধু যে সোভিয়েট রাশিয়ার জয় তা নয়। এই জয় ভারতের ইতিহাসেরও মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ফ্যাসি শক্তির পরাজয় এখানে না ঘটলে, হিটলারের বুটের তলায় ভারতের পিষে মরার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল।

রাশিয়ার নারীদের এই দৃষ্টান্তে আমরা ভারতের নারীরাও প্রাণ পাই, উদ্দীপ্ত হই। সভায় সভায় এই কথা আমরা শোনাই—বলি, রাশিয়ার মেয়েরা যদি পারে, আমরা ভারতের মেয়েরা কেন পারব না! বহু গান বাঁধা হয়, ছোট ছোট নাটক লেখা হয়, অভিনীত হয় মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগাবার জন্য। প্রথম প্রথম সভায় সমিতিতে মেয়েদের আনাই কঠিন ছিল. আরো কঠিন ছিল বেশীক্ষণ কোন বিষয়ে তাদের মন বসান। আমাদের কর্মীর সংখ্যাও তেমন বেশী ছিল না। তবু নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সেই অল্প সংখ্যক কর্মীরাই ঘুরে ঘুরে মহিলাদের বোঝানর কাজ করে যান অটুট ধৈর্যের সঙ্গে। কোথাও সভা হবার কথা হলে তারা প্রতিটি বাড়ীতে যেত, একবার দুবার নয়—বহুবার। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হত সভায়। শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন মহিলারা। শিশুদের কান্নায় সভার ব্যাঘাত হত। মহিলাদেরও মন চলে যেত অল্পক্ষণের মধ্যে; তাঁরা নিজেদের মধ্যে গল্প-গাছা করতে আরম্ভ করতেন। নাটক অভিনয় আরম্ভ হলে তাঁরা চুপ করতেন। তাই নাটকাদি দিয়ে চোখের মাধ্যমে তাঁদের অবস্থা বোঝান আর চুপ করানো—এক ঢিলে দুই পাখী মারার কাজের ব্যবস্থা করতে হয়।

ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হল। পাড়ায় পাড়ায় সমিতি গড়ার কাজ আরম্ভ হল, কারণ নিজের পাড়া ছেড়ে বেশী দূর যেতে পারতেন না মহিলারা। সমিতির জন্য উৎসাহী কর্মীও পাওয়া যেতে লাগল। খাদ্য পরিস্থিতি ক্রমশ আরো খারাপ হওয়ায় মহিলারা আরো সক্রিয় হলেন।

১৯৪২ সনের মধ্যে বরিশালে সাতটি আত্ম-রক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিতে মহিলাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও লাঠি খেলা শেখান হয়। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে বহু বৈঠক হয়। এই সব বৈঠকে ফ্যাসী-বিরোধী সংগ্রামে মেয়েদের ভূমিকার কথা আলোচিত হত। রাশিয়া ও চীনের মেয়েরা এই সংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করেন, তার ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হত। উত্তরবঙ্গের পাবনাতে প্রভাত-ফেরী, প্রদর্শনী এবং সভা-সমিতির আয়োজন করা হয়। হুগলি, বালি, চুঁচুড়া ও ২৪ পরগণার মহেশতলায় আত্মরক্ষা সমিতি গঠন করা হয়। পরিস্থিতি যে কত সংকট-জনক তা বোঝান ও প্রচারের কাজ অব্যাহত থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃস্থানীয় সক্রিয় মহিলাদের একটি সভা হয়। উপস্থিতদের মধ্যে আমার যতদূর মনে আছে, ছিলেন কমলা চ্যাটার্জি, মণিকুন্তলা সেন, এলা রীড্ এবং আমি। শহর এলাকায়, গ্রামে, বস্তিতে যে সব সমিতিগুলো বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠছিল, সেগুলিকে সংহত করে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই অনুভূত হচ্ছিল। নূতন নূতন এলাকা থেকে ডাকও আসছিল। অতএব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একটা সংগঠন কমিটি নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এও ঠিক হল যে শ্রীমতী এলা রীড্ই আমাদের প্রথম সংগঠন সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করবেন। আরম্ভটি নেহাৎই সামান্য। সংগঠন কমিটির অফিসটি হল শ্রীমতী রীডের বাড়ীতেই। সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে সম্ভাবিত বিরাট একটি গণ-সংগঠনের প্রথম বীজটি এভাবে উপ্ত হল।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জেলায়, এমন কি গ্রামের অভ্যন্তর পর্যন্ত। প্রথম যখন বঙ্গদেশে জাপানী বোমা পড়ে, সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নটি অতি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। মহিলা আত্মরক্ষা

সমিতির কর্মীরা ফ্যাসী আক্রমণের বিপদ সম্পর্কে মহিলাদের বোঝাতে লাগলেন; সেই সঙ্গে ইওরোপের নানা জায়গায় ফ্যাসী-বিরোধী সংগ্রামে মহিলারা কিভাবে অসম সাহসের সঙ্গে লড়ছেন—সেই সব কথা শুনিয়ে তাঁদের অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টাও হতে লাগল। আমাদের কর্মীদের বিশেষ করে প্রেরণা জোগাল সোভিয়েত নারীদের তুলনাহীন বীর্য ও সাহসের দৃষ্টান্ত।

স্বদেশ এবং নারীর মর্যাদা-রক্ষার সংকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এবার মহিলারা মন দিয়ে শোনেন, কেননা, তাঁদের দেশ যে আক্রান্ত তা তাঁরা চোখের সামনেই দেখছিলেন। মহিলারা যে শুধু প্রাথমিক চিকিৎসা ও আগুন নেভান শিখেই ক্ষান্ত হলেন তা নয়, এও তাঁরা বুঝতে শিখলেন যে বন্দী নেতারা জেল থেকে ছাড়া না পেলে এবং দেশ রক্ষার জন্য একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করা না হলে, জাপ অভিযানকে রুখবার জন্য সমস্ত মানুষকে সংগঠিত করা সম্ভব হবে না। এর জন্য আরও প্রয়োজন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য জাতীয় দলের মিলন। মানুষকে এ সব বোঝান কঠিন হল, কারণ, জাতীয় নেতাদের কারাবরণের পরেই ১৯৪২-আন্দোলন এই প্রত্যয়কেই গ্রহণ করল যে ইংরেজ এখনও আমাদের প্রভু হয়ে আছে; অতএব জাপানীদের বিরোধিতাই তখনকার সব চেয়ে বড় কাজ নয়। বড় কাজ হল সব দিক থেকে ইংরেজ সরকারকে অচল করে দেওয়া।

এদিকে যে দেশ ফ্যাসি অধিকারে গেলে বিপদের সীমা থাকবে না, তা ওঁরা দেখলেন না। সে কথা বলতে গেলেই দেশের-শত্রু নাম কিনতে হয়। দেশের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি বলে চিহ্নিত হতে হয়। একটি মত হল যে ইংরেজ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এখন নাজেহাল। এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। এই মতের শরিক ছিলেন প্রধানতঃ কংগ্রেসী আর সোশ্যালিষ্টরা, যারা নেতাদের গ্রেপ্তারের পর তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং ১৯৪২-এর আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেন। আর এক দলের বিশ্বাস হল যে জাপানী সাহায্যে এবং নিজে জাতীয় ফৌজ গঠন করে রেঙ্গুন আক্রমণ করতে আসছেন শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু এবং তিনিই ভারতের স্বাধীনতা এনে দেবেন। এই দলের মধ্যে ছিল ফরোয়ার্ড ব্লক ও তাদের সমর্থকরা। এই দুই আগুনের

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কর্মীদের একথা বোঝাতে অত্যন্ত বেগ পেতে হয় যে ফ্যাসিদের হাত থেকে স্বাধীনতা আসবে না--কারণ ফ্যাসিবাদই হল সাম্রাজ্যবাদের করালতম রূপ। তা ছাড়া ওরা জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস ওদের অস্থিতে মজ্জায়। একবার আমাদের ঘাড়ে চাপলে পায়ের তলায় পিষে মারবে। এ সব কথা বোঝান আরো অসম্ভব ছিল এই কারণে যে ভারতবাসী বহু দশক থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ে আসছে—যার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেহারাটা ওদের কাছে বড় বাস্তব এবং অতি কাছেরও। ফ্যাসিবাদ কোথায় কোন দূরে, তাকে কেউ চেনেও না। কাজেই ফ্যাসিবাদের বিপদ বোঝা জনগণের পক্ষে শক্তই ছিল। এতএব কমিউনিস্টদের বৃটিশ তাঁবেদার বলে মার্কামারা হতে হল। চলতে লাগল কমিউনিস্ট-বিরোধিতা। কমিউনিস্টদের অফিসের ওপর, কর্মীদের ওপর চলতে লাগল হামলা, এমনকি কমিউনিস্ট মেয়েদের ওপরও। এসব ছিল তখনকার দিনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

এই পর্বে নারী-আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল তিনটি। এক—দেশরক্ষা; দুই জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা; তিন—দুর্ভিক্ষে মরার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা।

একদিকে যুদ্ধের সংকট অর্থাৎ মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন এমনিতেই। আর একদিকে ভয়াবহ খাদ্য সংকটের করাল ছায়া সারা বাংলার বুকের ওপর। তার ওপর জাতীয় নেতারা জেলে। তাঁদের মুক্তি দরকার; আরও দরকার সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার এবং সেই জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের।

এই কাজগুলি হাসিল করতে গিয়ে জন্ম নিল বিরাট এক নারী আন্দোলন।

এই তিনটি কাজই হাতে নিল—বাংলার মহিলা সংগঠন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। সমিতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল জেলায় জেলায়—কমিউনিস্ট মেয়েরা বুঝিয়ে দিতে লাগল যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার রাজনৈতিক সমাধান না হলে আর জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণের অনুকূল একটি দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য না লড়লে মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তি কোন মতেই সম্ভব নয়। সুতরাং এর জন্যই চাই জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও তার জন্য

লড়াই। এবং এই লড়াই রাজনৈতিক। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কবলিত বাংলা-দেশের আর্তের সেবায়ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াল। মানব সেবা ও রাজনৈতিক কাজ এক হয়ে মিশে গেল।

চাটগাঁয়ের মহিলারা জাপানী-বোমার আক্রমণের সামনের সারিতে ছিলেন। ১৯৪৩-এর মে মাসের মধ্যেই নারী সমিতি গড়ে ওঠে ৩৬টি প্রাথমিক সমিতি নিয়ে। এদের মোট সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০০ তে। রক্ষা-ব্যবস্থা এবং খাদ্যের আন্দোলন পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে দশটি মহিলা স্কোয়াড্।

সুদূর আসামের সিলেটে কৃষক রমণীদের মধ্যে নারী সংগঠন ব্যাপ্ত হয়। সুরমাভ্যালী এবং শিলং-এ (বর্তমানে মেঘালয়ের রাজধানী) মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়; তাতে যোগ দেন পাথারকাণ্ডির মণিপুরী মহিলাগণ, মধ্যবিত্ত মহিলাগণ, শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের নেতৃস্থানীয়ারা প্রভৃতি নানা স্তরের মহিলাবৃন্দ। একটি প্রতিনিধিত্বমূলক অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় যাতে কংগ্রেস মহিলা সংঘ এবং নিঃ ভাঃ মঃ সম্মেলনের জনকয়েক সদস্যও যোগদান করেন। আবার গোলমাল বাধাবার মানুষও ছিল। কংগ্রেস মহিলা সংঘের ডিক্টেটর আখ্যাধারী শ্রীমতী সুপ্রভা পুরকায়স্থ কম্যুনিস্ট বিরোধী জিগির তোলেন, যে-হেতু কম্যুনিস্ট মেয়েরা দেশের নিরাপত্তা এবং আত্মরক্ষার জন্য একটি সর্বদলীয় সংগঠন গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ৬০০ নূতন সদস্য হন, এবং ১৬টি প্রাথমিক সমিতি গড়া হয়।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, তার প্রথম জন্ম-লগ্ন হতেই "গান্ধীজীর মুক্তি চাই" এই আওয়াজ তোলে, এবং আন্দোলনকে নিয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম গ্রামান্তরে। তাঁরা মহিলাদের বুঝতে শেখান যে একটি লোকায়ত সরকার না হলে যুদ্ধ এবং অকালজনিত এই ভয়াবহ দুর্দশার নিরসন হবে না। অর্থাৎ চাই গান্ধীজী প্রমুখ জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং বৃটিশ সরকারের খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সরকারের বদলে একটি জাতীয় সরকার। ছোট বড় বহু সভা হয়। ১৯৪৩-এর ২৮ শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গদেশের ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দুইশত মহিলা উপস্থিত থাকেন। তারপর আবার ২রা মার্চ তারিখে আরেকটি বিরাট সভা হয়—দুটিরই দাবী ছিল—গান্ধীজীর মুক্তি।

১৯৪৩-এর ১লা মার্চ রাজসাহী জেলার নওগাঁ গ্রামে একটি সভায় গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করা হয়। রাজশাহীর মহিলারা এগারটি বৈঠক করেন এবং একটি পথসভা করেন—গান্ধীজীর মুক্তি কেন চাই তা মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্য। এই সব ছোটখাট সভায় মুস্লিম মহিলারাও যোগদান করেন এবং বক্তাদের কথা শোনবার পর সকলেই সভার উদ্দেশ্য সমর্থন করেন। মহাত্মাজীর মুক্তির দাবীর ওপর একটা সই সংগ্রহের অভিযান হয়, এবং একটি মিছিলও হয়। এই মিছিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম লীগ এই সময়ে জোর কংগ্রেস-বিরোধী প্রচার চালাচ্ছিল মুসলমানদের মধ্যে। ঠিক সেই সময়ে সর্ব সম্প্রদায়ের সংযুক্ত এই মিছিলটি একটি বিরাট সাফল্য।

৩রা মার্চ বাঁকুড়ায় ৬০০০ ছাত্র, মহিলা, পুরুষ এবং নারী শ্রমিকদের একটা বিরাট সমাবেশ হয়, যাতে মহাত্মাজীর মুক্তির দাবী করা হয়, এবং সকলে একযোগে সেই দাবীর আওয়াজে কণ্ঠ মেলান। এ ছাড়াও অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে পাঁচটি বৈঠক হয়।

সরকারের নৃশংস দমননীতি আর অমানুষিক অত্যাচার চলছিল বেপরোয়াভাবে। তার ফলে মানুষের দুর্গতির শেষ ছিল না। এর প্রতিবাদে গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন ১৯৪৩-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী।

হাওড়ার ডোমজুড়ে হাজার দেড়েক গৃহিণী একটি শোভা-যাত্রা বের করেন। কৃষক মহিলারাও সেই মিছিলে যোগদান করেন এবং তাঁদের কণ্ঠ থেকে আওয়াজ ওঠে "গান্ধীজীর মুক্তি দিয়ে জাতির মুক্তি হাসিল কর", "খাদ্যের জন্য এক প্রাণ এক হও" ইত্যাদি।

কলকাতায় মুস্লিম মহিলা আত্মরক্ষা কমিটির দৌলতে ৫০০ মুসলিম মহিলা শ্রমিক, গান্ধীজীর মুক্তি-আন্দোলনের শরিক হন। নাজিমুন্নেসা আহ্মেদ নামে একটি তরুণী কম্যুনিস্ট এই কমিটির নেত্রী ছিলেন।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির হাওড়া, বাঁকুড়া, হুগলি এবং চুঁচুড়া শাখা হতে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করে বহু টেলিগ্রাম পাঠান হয়।

বরিশালের কীর্তিপাশায় মহিলারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাড়ী বাড়ী তাঁদের শপথ বহন করে নিয়ে যান—"গান্ধীজীকে মরতে দেওয়া হবে না—আমাদের সমবেত দাবী দিয়ে তাঁকে আমরা মুক্ত করবই।" এই দ্বারে দ্বারে অভিযানে

তাঁরা কমপক্ষে ৬00 মহিলার কাছে ওই আওয়াজ পৌঁছে দেন। একই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা সাতটি সভা করেন। ওই একই উদ্দেশ্যে ৫00 মহিলা পোস্টার নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন।

ঢাকা জেলার কামারখাড়া গ্রামে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করে একটি সভা হয়। ফরিদপুরে ৫টি স্কোয়াড্ অনুরূপ দাবীর প্রচার করে বেড়ায়। মাদারীপুর এবং ফরিদপুরে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বরিশালে জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একটি সভা হয় ১৯৪৩-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী। উক্ত সভায় অনতিবিলম্বে ও বিনাশর্তে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করা হয়।

শুধু বঙ্গদেশেই নয়, অন্যান্য রাজ্যেও জাতীয় নেতাদের মুক্তি আন্দোলন চলে। কম্যুনিস্ট মেয়েরা এই আন্দোলনের শরিক হয়। দেশের ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে তাঁরা পূর্ণ উদ্যমে মানুষকে বোঝান এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্যে প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই দেশ ব্রতে কম্যুনিস্ট মেয়েরা পিছিয়ে থাকেন নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঁচার লড়াই

যুদ্ধ এগিয়ে আসে আমাদের সীমান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে বিশেষ করে বঙ্গদেশকে গ্রাস করে আর এক ভয়াল সংকট। এক ভয়াবহ আকাল। কালোবাজারী, মুনাফাখোর, বৃটিশ সরকারের হৃদয়হীন অপদার্থ আমলা-তন্ত্রের চক্রান্তে আর অকর্মণ্যতায়, খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানী, ঔষধ সব একেবারে উবে যায়। দলে দলে অনাহারী, মৃতকল্প নারী, পুরুষ, শিশু গ্রাম ছেড়ে ছোটে কলকাতা বা মফঃস্বল শহরগুলির দিকে। কাতারে কাতারে শুধু সরু সরু শক্তিহীন টেনে টেনে চলা পায়ের মিছিল। ঢলে-পড়া ভুখা শিশু কোলে নিয়ে অস্থি-চর্ম-সার মায়েদের "মা গো একটু ফ্যান দাও" এর বুক ফাটা কান্নায় শহরগুলির আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হয় দিন আর রাত। সে দিনের এই বিভীষিকার দুঃস্বপ্নের সাক্ষী যারা, আজো তাদের কানে বাজে সেই কান্না।

নিত্য-প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যক দ্রব্য সব উধাও। দুঃসাহসী কম্যুনিস্ট ছেলে মেয়েরা এসে দাঁড়ায় এই সংকটের মোকাবিলা করতে। কংগ্রেসী আর সোস্যালিষ্টরা বলেন নেতারা বাইরে না এলে কিছু হবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার জন্য আরেক দল চান, আরও চরমে উঠুক মানুষের দুর্গতি। কিন্তু আর্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় কম্যুনিস্ট ছেলে মেয়েরা। তারা এই আর্ত-মানুষগুলোকে সংঘবদ্ধ করে—বাধ্য করে সরকারকে খাদ্য দিতে, বস্ত্র-জ্বালানী দিতে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে সারা ভারতে আওয়াজ ওঠে "বাঙ্গাল ভুখা হ্যায়"। কংগ্রেস, মুসলীম লিগ, হিন্দু মহাসভাকে এই মহা-সংগ্রামের শরিক করবার জন্য নিরলস নিরন্তর চেষ্টা করে যায় কম্যুনিস্টরা। আন্দাজ করা হয় শহরগুলিতে এবং গ্রামে কমপক্ষে ৩০ লক্ষ মানুষ মরে এই দুর্ভিক্ষে। বেশী মরে নারী আর শিশু। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই কৃষি-শ্রমিক, ভাগ-চাষী, দরিদ্র কৃষক ও

শহর নগরের নিম্ন বিত্তের দল। ৬০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষই ভেঙ্গে চুরে তছনছ হয়ে যায়। প্রায় ৩০ লক্ষ পরিবারে উপার্জন করার মত কেউ থাকে না। দশ লাখ বাঙ্গালী গৃহহারা হয়। শতকরা প্রায় ২৫ জন চাষী জমি হারায়।

১৯৪২-এর এপ্রিল মাস হতেই চালের দাম চড়তে থাকে। প্রথমে মণকরা ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা হয়। পরের চার মাস অবস্থা আরো খারাপ হয়। দেখতে দেখতে হুহু করে দাম চড়তে থাকে ৩০, ৪০, ৫০ টাকায়। ১৯৪৩-এর মার্চ থেকে ১৯৪৪-এর জানুয়ারী পর্যন্ত সময়কার বেদনাময় ইতিহাস তৎকালের মানুষের বুকে গাঁথা আছে। কাতারে কাতারে মানুষ, একদিন যারা জমি চষেছে, ফসল ফলিয়েছে, অন্নদান করেছে বাংলার মানুষকে, তারা আজ অন্নহীন—গ্রামে একদানা চাল নেই—বুভুক্ষায়, ভয়ে, ত্রাসে তারা চলেছে শহরের দিকে। আশ্রয় নিয়েছে ফুটপাতে ; আবর্জনা ঘেঁটে অখাদ্য খেয়েছে, ফ্যানের জন্য আর্তনাদ করেছে—তারপর ধীরে ধীরে দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়েছে এবং রাস্তারই ধারে কত বাড়ীর দরজার সামনে তারা চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে। এ দৃশ্য বর্ণনার অতীত।

১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর থেকে কম্যুনিস্ট মেয়েরা কলকাতার বস্তি এবং গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করে। কলকাতা, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, দিনাজপুর জেলায় মহিলারাই প্রথম দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজ আরম্ভ করেন। কনট্রোলের দোকানের সামনে লম্বা লাইন পড়লে দোকানীরা লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার, মার-ধোরও পর্যন্ত করে। মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকারা গিয়ে ক্রেতাদের সাহায্য করেন, এবং মহিলা ক্রেতারা যাতে বিধিমত জিনিস পান, সে বিষয়ে ব্যবস্থা করেন। বস্তীর মেয়েরাও এসে এই কাজে যোগ দেন। ৩।৪ মাস আগেও যারা পরদানসীন ছিল, তারাও স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে এগিয়ে এল। মধ্যবিত্ত মহিলারাও তাঁদের ঘরের কাজ ফেলে সেই সকাল থেকে এসে এ কাজে লেগে যেতেন।

কিন্তু এ ভাবে তো আর বহুদিন চলতে পারে না। খাদ্যের অবস্থা আরো সংকটজনক হলে সরকারকে চাপ দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর রইল না। লাখে লাখে ভুখা মানুষের আর্তনাদ কর্তাদের কানে পৌঁছে দেবার জন্য সংসদ অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

১৯৪৩-এর ১৭ই মার্চ, কলকাতার বস্তীবাসী এবং উত্তর দক্ষিণের

শহরতলীর ৫০০০ মহিলা শোভাযাত্রা করে বিধানসভার অভিমুখে যান খাদ্যের দাবীতে এবং উচ্চ মূল্যের প্রতিবাদ জানাতে, কারণ খাদ্য পরিস্থিতি আরো খারাপ হল। সরকারী নির্বিকল্প ভাব আরো প্রকট হয় দিনের পর দিন। গোটা কলকাতা শহরে মাত্র গোটা পঞ্চাশ কনট্রোলের দোকান। কলকাতা শহরের জনসংখ্যা তখন ২০ লাখ। ওই ৫০টি দোকানে মাত্র ২০,০০০ মানুষকে খাদ্য দেওয়া সম্ভব। গ্রামে খাদ্য নাই। কনট্রোলের দোকানের সামনে লাইন প্রতিদিন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়। পায়ের চাপে মানুষ মরে। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য।

বিধানসভায় ভুখ-মিছিল সর্বপ্রথম সংগঠিত করেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এবং মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা লীগ। উভয় সমিতির কম্যুনিস্ট মেয়েরাই অগ্রবর্তী হন।

সুতো সুতো হয়ে ছেঁড়া ন্যাকরার ফালি পরা হাড়িডসার শত সহস্র মায়ের দল তেমনি হাড় জিরজিরে মুমূর্ষু শিশু কোলে নিয়ে কলকাতাবাসীর চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।…এদের অবস্থা সম্বন্ধে মুখের কথায় আর কলমের লেখায় যা এতদিন বলা হয়েছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশী বলে গেল এই কঙ্কালের মিছিল। অভূতপূর্ব দৃশ্য ওই কঙ্কালের মিছিলের সুশৃংখল, সুসম্বদ্ধভাবে সুদীর্ঘ চলা। পুলিশ, কম্যুনিস্ট-শিকারী কেউ কিছু করতে পারে নি। অভূতপূর্ব ছাপ রেখে গেল মানুষের মনে ওই ভুখ-মিছিল।

মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক জানালেন তিনি অসহায়। অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসন্তোষ বসু জানালেন অন্য রাজ্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে তিনি পারেন নি। কেন্দ্র এগিয়ে না এলে তাঁরাও অসহায়। অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের সচিব মিঃ পিনেল বললেন, "চাষীরা খাদ্য মজুত করছে। তাদের ধরতে না পারলে, বাজার থেকে সব খাদ্য উধাও হবে।"

কিন্তু দমল না মেয়েরা। তারা দাঁড়িয়ে রইল শক্ত হয়ে। তখন মুখ্যমন্ত্রী হুকুম দিলেন একশ বস্তা চাল এদের তক্ষুণি বণ্টন করে দিতে।

এটা হল মহিলাদের প্রথমতম সংগ্রামী মোর্চা—যা নাড়িয়ে দিয়ে গেল গোটা শহরকে, পিঠ সোজা করে বসতে হল সরকারকে। নারী আন্দোলনে এক নতুন পর্যায় এল। সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত আন্দোলন থেকে কলকাতার মঃ আঃ রঃ সঃ পৌঁছল শ্রমিক গৃহিণীদের স্তরে এবং তাদের বাণী পৌঁছে দিল গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে।

ভুখ মিছিলের আগে ১৯২৪ সনের ২৪ শে জানুয়ারী জনরক্ষা সমিতির ডাকে টাউনহলে একটি খাদ্য সম্মেলন হয়। কলকাতা, বাগবাজার, এনটালি, পার্কসার্কাস প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের বস্তি এলাকা থেকে ৫০০-৬০০ মহিলাদের একটি জমায়েত টাউনহলে যায় এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই সব সমাবেশ, শোভা-যাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে অবশেষে রেশনের ব্যবস্থা হয়। সারা ভারতে কলকাতাই একমাত্র শহর, যেখানে বিধিবদ্ধ রেশন-ব্যবস্থা আজও চালু আছে। এবং এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও একটি বড় ভূমিকা পালন করেন।

কলকাতার ভুখ-মিছিল যখন হয়, প্রায় ঐ সময়েই—১২ই মার্চ, ১৯৪৩, বাঁকুড়ার শ'চারেক কৃষক-রমণী কনট্রোল দোকানের দাবীতে ভুখ-মিছিল করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান। তাতে কিছু ফল হল না দেখে ১৫ই মার্চ দূর দূরান্তর গ্রাম থেকে একশত শ্রমিক রমণী আবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান।

২৭শে মার্চ কৃষক-শ্রমিক রমণীদের বিরাট এক মিছিল আবার যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, এবারে তাঁদের সংখ্যা হাজার। জনগণের চাপে এইবারে ম্যাজিস্ট্রেট ৫টি কনট্রোল দোকান খুলে রেশনের পরিমাণ ঠিক করে কার্ড বিলি করতে রাজী হলেন। দোকানের বন্টন-ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার তদারকীর জন্য মঃ আঃ রঃ সঃ-র সভ্যদের স্বেচ্ছাসেবিকা হতে অনুরোধ করা হয়।

১৯৪৩-এর মার্চ মাসে পাবনার ৬০০ মহিলা ভুখ-মিছিল করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান। এই ৬০০র মধ্যে পাঁচশ'ই ছিলেন মুসলমান মহিলা। মঃ আঃ রঃ সঃ এঁদের কাছে ভুখ মিছিল সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার করে। শয়ে শয়ে অনাহার-ক্লিষ্ট হিন্দু-মুসলিম মহিলা দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে মিছিল করে যায়। ভয় পায় আমলাতন্ত্র। এই বিক্ষোভ-প্রদর্শনের কথা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে যান। মেয়েরা গিয়ে টাউনহলে জমায়েত হয়ে একটি সভা করেন এবং শপথ নেন: "এবারে আমরা আসব ১০,০০০; তখন সরকারের টনক নড়বে।"

১৯৪৩-এর ২৫শে মার্চ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে ২০০০ মহিলা খাদ্যের দাবীতে মিছিল করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান। তাঁদের কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে শুনতে হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত গোপন চাল খুঁজে বের করে ফুড কমিটির মারফৎ ১৫ টাকা দরে বিক্রী করার আদেশ দেন। স্বেচ্ছাসেবকরা চরমাগুরিয়া

এবং মাদারীপুরের বাজারে যান এবং জনগণের সাহায্যে ২৫০০ মণ চাল এবং ৫০০ মণ ধানের গোপন মজুত উদ্ধার করেন। ৮নৌকা চাল ও ৬ নৌকা ধানও আটক করা হয়।

জলপাইগুড়ির কালিয়াগঞ্জ বাজারে পাইকারী ব্যবসায়ীরা ধানের দাম হঠাৎ ৭.৫০ টাকা থেকে ১১টাকায় চড়িয়ে দেয়। কৃষক মহিলারা নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে এক জোট হয়ে গিয়ে দাবী জানান যে ধান ৮ টাকা দরেই বেচতে হবে। তাদের দৃঢ়তা দেখে ব্যবসায়ীরা ৮ টাকা দরেই চাল বেচতে বাধ্য হন।

১৯৪৩-এর ২০শে মার্চ দুই শতাধিক মহিলা মিছিল করে এসে জমায়েত হয়ে একটি সভা করেন এবং মঃ আঃরঃ সঃ-র একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

একদিন স্থানীয় জনরক্ষা সমিতি ৮১ মণ চাল, ১৬ মণ ধান এবং ৩৬ মণ ভুট্টার লুকানো মজুতসহ একটি নৌকা আটক করে। মঃ আঃ রঃ সঃ-র মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা উদ্যোগী হয়ে সেই সব খাদ্যশস্য জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেন।

১৯৪৫-এর মার্চ মাসে বরিশালে ফুড কমিটির ডাকে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে একটি সভা আহূত হয়। বড় বড় ঘরের মা বৌরা, গরীব ঘরের গৃহিণীরা দলে দলে এই সভায় যোগ দেন এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের জন্য সস্তায় খাদ্য-শস্যের দোকান খোলার দাবী জানান হয়। মহিলাদের এই উদ্যোগ গোটা শহরের মানুষকে উৎসাহিত করে।

১৯৮৩ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুরের অন্তর্গত দাসপুরে ৮ জন কিসান মহিলার নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা ৩০ মাইল পথ হেঁটে এসে জেলা কিষান সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রায় ৬০০ জন কিসান মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেন যদি আমাদের কিসান ভাইয়েরা এত দাবী আদায় করতে পারেন, আমরা কেন তা পারব না। একশত মহিলা তক্ষুণি কিসান-সমিতিতে যোগদান করেন। সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদতার আওতা থেকে বাইরে আসার এই তাদের প্রথম পদক্ষেপ। একজন মহিলা বলেন: ''ছেলেদের সঙ্গে এতদূরে আসার জন্য আমায় হয়ত কাল জাত থেকে ঠেলে দেবে জাত ভাইয়েরা। কিন্তু আমার তাতে বয়েই গেল। আমি জানি সমিতি ঠিক কথা বলছে আর সমাজ বলছে ভুল।"

১৯৪৩-এর ১লা এপ্রিল ৫০০ মহিলা ভুখ-মিছিল করে অন্ন ও বস্ত্রের দাবী নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান।

গ্রামের এবং শহরের দরিদ্র মহিলাদের পক্ষে এই সব প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তৎকালে ছিল এক বৃহৎ পদক্ষেপ। এই সংগ্রামই তাদের বুঝিয়ে দিল যে আন্দোলনই হল বাঁচার একমাত্র পথ। এই আন্দোলনের জন্য চাই ঐক্যবদ্ধ সু-সংগঠিত প্রতিষ্ঠান। এর এক বিশিষ্ট উদাহরণ রেখেছেন রংপুর জেলার এক মহিলা। এক সভায় এক কম্যুনিস্ট ভাই-এর ভাষণ শুনে মহিলা বললেন: "প্রথমে তো ভেবেই মরি ছেঁড়া কাপড়ে কি করে সভায় যাব? এখন বুঝছি, এই ন্যাংটো-থাকা ঘোচাবার জন্যই সভায় আসতে হবে, আন্দোলন করতে হবে, লড়তে হবে।"

নোহালি গ্রাম। সেই গ্রামের এক মুসলমান মহিলা এক হিন্দু মেয়েকে বলল: "এই পর্দাই আমাদের কাল, বোঝনা? গ্রামের মাইয়া বৌ ঝি গোর এক সভা ডাক। শহর থাইককা কেউ আইসসা দুই চার কথা কউক। যামু সেই সভায়, যা থাকে কপালে।"

আমাদের কম্যুনিস্ট মেয়েরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন একেবারে গোড়া ধরে—তার ফল ফলতে আরম্ভ করল। সামগ্রিকভাবে মেয়েদের মধ্যে চেতনার উন্মেষ হতে লাগল। এমন কি সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা গ্রামেও মেয়েরা সংগঠিত হবার প্রয়োজন বুঝল। কম্যুনিস্ট মেয়েদের এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য ও অবদান।

রংপুর জেলার কুড়িগ্রামে মঃ আঃ রঃ সঃ-র পাঁচটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাখাগুলি চরকার দাবী জানায়, নিজেদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র তারা নিজেরাই বুনে নেবে। রংপুরের এই আন্দোলনে কিসান মেয়েরাই নেতৃত্ব দেন। শুধু এই জেলাতেই ১৯৪৩-এ সমিতির সভ্য সংখ্যা হয় তিন হাজার।

দিনাজপুরে কিসান মহিলারা সংগঠিত হবার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই ৪০০ মহিলা সমিতির সভ্য হন।

শ্রীমতী আশা চক্রবর্তী ঠাকুরগাঁওএর গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। মহিলাদের ছোট ছোট বৈঠক করেন—মেয়েদের আন্দোলনে আনবার পক্ষে এইসব ছোট ছোট বৈঠকই সবচেয়ে কার্যকর হয়। এইভাবে তিনি মেয়েদের বেশ কয়েকটি সংগঠন করতে সমর্থ হন। সিংগিয়াতে ২৯ জন, শিবরামপুরে ২৬ জন, ধনগাঁওতে ৯১ জন, খাগড়ায় ৬০ জন মহিলা এই সব সংগঠনে আসেন। বহু

রাজবংশী (ক্ষত্রিয়) মহিলারাও এইসব সংগঠনে আসেন। মুসলমান মহিলারাও অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১৯৪৩-এর ১৭ই জানুয়ারী পাটনিকোলা গ্রাম থেকে মহিলারা শিশু কোলে আর পোষ্টার হাতে নিয়ে তিন মাইল হেঁটে মিছিল করে করোই-কোবায় খাদ্য সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন।

১৯৪৩ এর ১৯শে মার্চ নারায়ণগঞ্জে মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সারা জেলা থেকে ১০০ মহিলা প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রায় ৭০০ মহিলা অংশগ্রহণ করেন। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী জুঁইফুল বসু। বরিশালের নেত্রী শ্রীমতী সরযূ সেন এবং ঢাকার শ্রীমতী নিবেদিতা চৌধুরী বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি বুঝিয়ে বলেন।

এইসব সভায়, মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি, খাদ্য ও বস্ত্র সংকট এবং আত্ম-রক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আলোচিত হয়।

কলকাতায় মঃ আঃ রঃ সঃ-র প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪৩-এর ২৮ এবং ২৯ শে মার্চ। প্রায় ৫০০ মহিলা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এঁরা প্রধানতঃ বস্তী এলাকার এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে মধ্য, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব কলকাতায় বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর মহিলারা এই সব সভায় উপস্থিত থাকতেন; খাদ্য ও আত্ম রক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব প্রধানতঃ গৃহীত হত।

১৯৪৩-এর ২৮শে এপ্রিল প্রকাশ্য অধিবেশন হয় আর্য-সমাজ হলে। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী শ্রীমতী মোহিনী দেবী এই সভার সভানেত্রীত্ব করেন। তিনি সমিতির কাজের প্রশংসা করেন এবং এই সংকটের দিনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। আমাদের সংগঠন-সম্পাদিকা শ্রীমতী এলা রীড্ সমিতির কাজের একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। শুধু কলকাতার সভ্য সংখ্যাই ছিল ৪০০০। এর পরে কমলা চ্যাটার্জি, মণিকুন্তলা সেন ও আমি বিভিন্ন প্রস্তাবের ওপর আমাদের বক্তব্য রাখি। ছোট ছোট মেয়েরা বৃন্দগান করে—সমবেত মহিলারা মুগ্ধ হয়ে সেই গান শোনেন। সবচেয়ে তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার হল—শ্রমিক শ্রেণীর এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের এই সভায় যোগদান। দূর দুরান্তর থেকে তাঁরা হেঁটে আসেন।

১১ জন সভ্য নিয়ে একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। রাজ্য সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ৪০ জন ডেলিগেট নির্বাচিত হন।

জেলার সর্বত্র মঃ আঃ রঃ সঃ ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়। সর্বস্তরের মহিলারা এসে মঃ আঃ রঃ সঃ-র শ্রী এবং শক্তিবৃদ্ধি করেন।

এইভাবে দ্রুত প্রসারের ফলে চারদিকে ছড়ান কাজের সংহতি ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে আরম্ভ করে। ১৯৪৩-এর ৮ই মার্চ কলকাতার ওভারটুন হলে প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এইটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। বহু মহিলা "মহাত্মা গান্ধীর ও জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই", "ফ্যাসী হামলাবাজ মুর্দাবাদ", "সকলের জন্য খাদ্য চাই" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে দলে দলে হেঁটে সভায় আসেন। তাঁরা এতদিনে এটা শিখেছেন যে বেঁচে থাকার সমস্যা থেকে জাতীয় রাজনীতিকে আলাদা করা যায় না। সম্মেলনে প্রতিনিধি আসেন সেই সুদূর বোমার মার-খাওয়া চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর, উত্তরবঙ্গের রংপুর হতে কলকাতা এবং নিকটবর্তী জেলাগুলো থেকে। সংযুক্ত বাংলার ২১টি জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা আসেন। মঃ আঃ রঃ সঃ বড় হয়ে হল নিখিল বঙ্গ আত্মরক্ষা সমিতি; এবং এরই মধ্যে নারী আন্দোলন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল।

শতাধিক ডেলিগেট ও ৪ শতাধিক দর্শকে একেবারে ভরে যায় ওভারটুন হল। সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে শহর নগর থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের অর্ধেক প্রায় শ্রমিকশ্রেণীয় এবং শহরের দুর্বলতর শ্রেণীর; বাকী অর্ধেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। আর জেলা থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে নারী আন্দোলন এখন আর শুধু মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যেই সীমিত হয়ে নেই। শ্রমিক-কৃষক-বস্তিবাসী মহিলারা তা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন।

পোস্টারে পোস্টারে অপরূপ হয়ে উঠেছিল হল। এই সব পোস্টারে মূর্ত হয়ে উঠেছিল মহিলাদের খাদ্যের জন্য লড়াই, ফ্যাসি প্রতিরোধ, জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং জাতীয় ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টার দৃঢ় সংকল্প।

এই সব পোস্টারের পাশাপাশিই ছিল সেই সব সোভিয়েট নারীদের পোস্টার, যাঁরা নিজেদের এবং সমগ্র নারী জাতির মুক্তির জন্য লড়ছিলেন। এই সব ছবি সভায় উপস্থিত মহিলাদের উদ্দীপনা যোগায়। বিশেষ করে নিরক্ষর মহিলাদের কাছে এই সব পোস্টারের ছবির বাণী মুখের শত কথার

চেয়ে অনেক বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন পরিমণ্ডল থেকে আসা এই সব মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য, পোস্টার, ছবি, গান, নাটক ইত্যাদি বহু প্রকার উপায় অবলম্বন করতে হত ঐসব দিনে।

পোস্টার ছাড়াও ছিল হস্তশিল্পের একটি প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে দেখাবার চেষ্টা হয় যে ওই তীব্র অর্থসংকটের দিনে, নেহাৎই সাময়িক এবং সামান্য হলেও হাতের কাজ করে কিছু উপার্জন করা যেতে পারে।

বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ব্যাণ্ড নিয়ে আসে জলি ক্লাবের মেয়েরা। প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্র। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠান শ্রীযুক্তা অবলা বসু, রেনুকা রায় এবং হাজরা বেগম।

শ্রীমতী এলা রীড তাঁর প্রতিবেদনে বলেন যে এক বৎসর আগে যখন ভারতের মাটিতে জাপানী বোমা পড়ে, তখন থেকেই মেয়েদের মনে ফ্যাসি-বিরোধী চেতনা জাগে। তারা বুঝেছে যে নিজেদের রক্ষা, সেই সঙ্গে দেশ রক্ষা এবং ফ্যাসিদের ঠেকাতে হলে, এক সঙ্গে হতে হবে। তারপর দেশের এই সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বস্ত্র সংকট, এ সবের মোকাবিলা করতে তারা বদ্ধপরিকর হয়। তিনি আরো বলেন যে সে-দিনের এই এতটুকু সংগঠন আজ এই বিরাট সংগঠন হয়েছে যার সভ্য-সংখ্যা ২২০০০।

খাদ্য সংকট সম্বন্ধে প্রস্তাবটি পেশ করেন মণিকুন্তলা সেন। সমর্থন করেন বরিশালের যুঁইফুল রায়। অধ্যাপিকা কল্যাণী সেন উত্থাপন করেন হস্ত-শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। সমর্থন করেন বরিশালের মনোরমা বসু।

যুগযুগ ধরে মেয়েরা যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবিচার সয়ে আসছে, সে সম্বন্ধে বলেন অপর্ণা সেন। আর কাল বিলম্ব না করে মেয়েদের এখনই এ নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করতে বলেন তিনি।

কল্যাণী মুখার্জি বুঝিয়ে বলেন কি ভাবে রাজনীতি জড়িয়ে থাকে জীবনের নানা সমস্যার সঙ্গে এবং সে কারণেই তা বর্জন করা যায় না। জাপানী আক্রমণ, খাদ্য-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

মুক্ত একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি। অতএব মেয়েদের এইগুলির জন্যও লড়তে হবে।

প্রস্তাবটি সমর্থন করেন ঢাকার নিবেদিতা চৌধুরী।

আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সোভিয়েত নারীদের অভিনন্দন জানিয়ে এবং ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের জন্য একটি দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার দাবির ওপর।

রাজ্য-কমিটির সভানেত্রী হন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সহ-সভানেত্রী, সম্পাদিকা এবং দুই জন সহ-সম্পাদিকা নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীমতী ডি এম বসু, এলা রীড এবং মণিকুন্তলা সেন ও অমিয়া দেবী।

রাজ্য সম্মেলনে যথেষ্ঠ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় মহিলাদের মধ্যে। তাঁরা জেলায় জেলায় মঃ আঃ রঃ সঃ-কে ছড়িয়ে দেবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করার অঙ্গীকার করেন।

মঃ আঃ রঃ সঃ-র উদ্যোগে ১৯৪৩-এর জুন মাসে মেদিনীপুরে তমলুক থানার দুই নম্বর ইউনিয়নের দুই শ হিন্দু ও মুসলিম মহিলা কোলাঘাট, রূপনারায়ণপুর ধানকলে যান এবং ১০্ মণ দরে চাল বিক্রীর দাবী জানান। এর পর মহিলারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সমিতিতে যোগ দেন।

মালদহ জেলাতেও মঃ আঃ রঃ সঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাপক প্রচারের ফলে মহিলাদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং একটি সংগঠন কমিটি স্থাপিত হয়।

১৯৪৩-এর শেষের দিকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা তীব্রতর হয় এবং সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। মঃ আঃ রঃ সঃ-র কর্মীরা কলকাতার শহরতলীতে অবস্থিত ২৪ পরগণার চম্পাহাটি পরিদর্শনে যান। তাঁরা সেখানে যে অবস্থা দেখেন তার এক হৃদয়বিদারক বর্ণনা দেন: "আমরা রাস্তায় রাস্তায় মানুষের মাথার খুলি ছড়ান দেখি। সে চোখে দেখা যায় না। দেখে মনে হয় যেন শ্মশানে এসেছি। দূরে দূরে সব কুটির দেখা যায়। সে গুলো পড়ো পড়ো। তাতে মানুষ জন নেই। হয় তারা ক্ষুধার তাড়নায় দেশ ছেড়ে গেছে, নয়, মানুষের শেষ আশ্রয় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

"চম্পাহাটির চারদিকের ২৭টি গ্রামের একই দৃশ্য। মৃতদেহ সৎকারের কোন উপায়ই ছিল না; হয় ডোবায়, নয় জলায় শবগুলিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। শেয়াল কুকুরে ওগুলোকে টেনে ছিঁড়ে খায়; গ্রামের আকাশ বাতাস পুতিগন্ধে ভরা। সর্বত্র মৃতদেহ এবং মাথার খুলি ছড়ান, সামান্য যে কয়জন

গ্রামবাসী জীবিত ছিলেন ঐ নরকেই তাদের নাক গুঁজে থাকতে হয়। রোজ কলেরায় মরার খবর আসে।"

মঃ আঃ রঃ সঃ ব্যাপ্ত হয়। প্রথম রাজ্য সম্মেলনের পরে, রাজশাহী জেলা সম্মেলন হয় ১১ই জুলাই রাজশাহী টাউনহলে। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ২৫০ মহিলা—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবারের। ছাত্র-নেত্রী প্রীতি সরকারের নেতৃত্বে একটি গানের দল আসে। মধু-কণ্ঠী প্রীতির কণ্ঠে লহর ওঠে: "দেশে উঠল দারুণ হাহাকার"—যে গান এর পর কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে বিখ্যাত হয়। শ্রোতারা গভীরভাবে অভিভূত হন। সম্পাদিকা অনুপমা বাগচী তৎকালীন সংকটে সমিতির কর্তব্যের ওপর বক্তব্য রাখেন। ছাত্রী সমিতির সম্পাদিকা বলেন, বর্তমান দারুণ সংকটে প্রতিটি পরিবার ধ্বংসের মুখে; অতএব ছাত্রীদের মধ্যে কাজ আরো জোরদার হতে হবে। আর একজন ছাত্রী সমিতির কার্যকলাপ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝান। এইভাবে ছাত্রীরা নানা আকর্ষক উপায়ে মহিলা সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াস করেন।

১৯৪৩-এর ৬ই জুলাই খুলনার মুসলমানপাড়ার হিন্দু-মুসলমান মহিলাদের একটি সভা হয়। অত্যন্ত কড়া পর্দা থাকা সত্ত্বেও ৮৫ জন মুসলমান মহিলা সভায় আসেন। কংগ্রেস কর্মী ক্ষণপ্রভাদেবী সাধারণ কর্মসূচীতে আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে সম্মত হন।

ভয়াবহভাবে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু হতে আরম্ভ করে। যৌন-ব্যাধিও, যার স্থানীয় নাম ছিল "আরাকানের ঘা," ভীষণভাবে বাড়ে সৈন্যদের ছাউনী কাছে থাকায়। রংপুরে আমন ধানের মরশুমে পুরুষরা গেল ধান কাটতে। মেয়েরা রয়ে গেল। দেখা গেল একটা ক্যাম্পের ১০৪ জন মেয়ের মধ্যে ৮০ জনেরই ওই আরাকান ঘা। এ সব মেয়েদের দিয়ে জোতদারেরা বেগারও খাটাত। আড়কাঠিরাও এদের ফুসলে নিয়ে চালান দিত বেশ্যাবৃত্তির জন্য।

সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত এই সব মেয়েদের জন্য খাদ্যের দাবী, রেশন ব্যবস্থা ও লঙ্গরখানা খোলার দাবীর জরুরী ও আশু প্রয়োজন দেখা দিল।

এইভাবে সব জেলাতেই দুর্ভিক্ষ ত্রাণের কাজে উঠে পড়ে লাগে মঃ আঃ রঃ সঃ। সব কিছুর আগে প্রাণ বাঁচানর কাজ। ১৯৪৩-এর জুন মাস থেকে খুলনা শহরে আমাদের তিনটি ইউনিট ৭টি এলাকা থেকে প্রতি সপ্তাহে ৫ সের করে চাল তোলে। বাড়ী বাড়ী থেকে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করে। এই চাল তারা

দুর্গতদের মধ্যে বিলি করে। তাছাড়াও তারা রেশনের মারফৎ খাদ্য ও বস্ত্র বন্টনের দাবী নিয়ে সাপ্লাই অফিসারের কাছে একটা ডেপুটেশন নিয়ে যায়। এই সময়ে বস্ত্র সরবরাহে দারুণ ঘাটতি এবং তা বন্টনের ব্যাপারে ভয়াবহ দুর্নীতি দেখা দেয়। এই সব কাজের মধ্য দিয়ে সমিতির কাজ তুতপাড়া, মৌভাগ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর নাগাদ বরিশাল জেলায় মঃ আঃ রঃ সঃ-এর ২০টি প্রাইমারী কমিটি গঠিত হয়। তারা সবাই আর্ত-ত্রাণ কাজে লেগে যায়। প্রতিদিন এরা ৫০টি দুর্গ'ত পরিবারকে খিচুড়ী রান্না করে খাওয়ায়। সরকার মাত্র ১০০ টাকা দেয়। সমিতি দৈনিক ৩০০ জন শিশু ও মহিলাকে খাওয়াবার কাজ হাতে নেয়। ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবিকা লঙ্গরখানায় কাজ করে। যারা খেতে আসে তাদের মধ্যে অনেকে সমিতির কর্মী হয়ে লঙ্গরখানায় কাজ করে।

শহরের গণ্য মান্য ব্যক্তিরা সমিতির কাজ দেখে মুগ্ধ হন। তাঁরা আমাদের আর একটি লঙ্গরখানা খোলার অনুরোধ জানান। স্বেচ্ছাসেবিকারা ছোট ছোট দল করে চাঁদা তুলতে বেরিয়ে যান। এক দিনে তাঁরা ৩৫ টাকা তোলেন এবং আরো ১০০ টাকার অঙ্গীকার পান। ৫ মণ জ্বালানী কাঠও পাওয়া যায় রান্নার জন্য। যে যা দিত দুর্গ'তদের সাহায্যের জন্য, সামান্য হলেও তা সাদরে গৃহীত হত। তারচের গ্রামের মুলাদিতে একদিন করে উপোস করার ডাক দেওয়া হয়। এবং ঐ ভাবে যে চাল সংগ্রহ হয় তা দিয়ে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশু, বালক, বালিকাকে খাওয়াবার জন্য ছোট একটি লঙ্গরখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নানা রকম বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েই দুর্ভিক্ষের কাজ চলতে থাকে। ধুকপুকে জীবনগুলোকে কোনমতে টিকিয়ে রাখাও একটা বিরাট সংগ্রাম বিশেষ। সরকারের কাছ থেকে সাহায্য আদায়ের লড়াই চলতে লাগল, তার সঙ্গে চলতে লাগল প্রতিটি সমিতির নিজেদেয় চেষ্টা।

শুধু কি ক্ষুধা? তার সঙ্গে আছে নানা রোগ বিশেষ করে ম্যালেরিয়া। তার তাণ্ডবে উজাড় হয়ে যায় টিকটিকিয়ে থাকা প্রাণগুলি। এ সবের সঙ্গে কত না করুণ কাহিনী। এক মা, সন্তানদের ক্ষিদের কান্না সইতে না পেরে দেয় তাদের নদীতে ফেলে। স্বামী চলে যায় স্ত্রী পুত্র ফেলে; মা সন্তানের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়। মেয়েরা দেহ বেচে—নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা আকাশ-বিধ্বস্ত বাংলার।

অধিকাংশ মেয়েদের পুরুষ অভিভাবক না থাকায় তারা গিয়ে পড়ত জোতদারের দালালদের খপ্পরে। দলিতপুরে একজন জোতদার ছ বছরের একটি কুলি মেয়েকে দশ টাকায় কেনে। বাবারগঞ্জে এক মা তার ছ বছরের মেয়েকে এক দালালের কাছে বেচে দেয়। এই হল ক্ষুধার সর্বগ্রাসী চেহারা।

লালমণির হাটে সরকারী লঙ্গরখানায় প্রায় ৮০০ মহিলা রোজ খেতে যেত। কিন্তু পেট ভরা খাবার পেতনা তারা। কাজেই আশপাশের ছাউনীতে গিয়ে তাদের দেহ বেচতে হত পেট ভরাবার জন্য।

কুড়িগ্রামের অবস্থাও ছিল তাই। মঃ আঃ রঃ সঃ রিক্ত-হস্ত। তবু তাঁরা চালিয়ে যান ত্রাণের কাজ। রংপুরে ওই একটিই মহিলা সংগঠন ছিল। গাইবাঁধাতে কংগ্রেস মহিলা সমিতি একটা ছিল, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই চলছিল মঃ আঃ রঃ সঃ-র কাজ।

২৪ পরগণার চম্পাহাটি লঙ্গরখানায় ওই একই অবস্থা।

১৯৪৩-এর নভেম্বরে জলপাইগুড়িতে মঃআঃরঃসঃ গঠিত হয়। শহরে তার চারটি কেন্দ্র ছিল। আরও একটা মহিলা সমিতিও ছিল। তারা মঃআঃরঃসঃ-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে। চারটে দুধের কেন্দ্র খোলা হয়, তাতে রোজ দুধ পায় ২০০ শিশু। আর্য নাট্য সমিতি অভিনয় করে টাকা তুলে আমাদের দুগ্ধ কেন্দ্রগুলিকে ৭০০ টাকা দেয়। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চলতে থাকে এইভাবে।

আমাদের কাজের প্রথম ধাপ ছিল লড়াই—রেশন আর কন্‌ট্রোল দোকানের জন্য লড়াই। কিন্তু এ আর কতটুকু বিপুল ক্ষুধার সমুদ্রে। কন্‌ট্রোলের দোকানগুলি ছিল অসাধুতার এক একটি পচা মলকুণ্ড। সেখান থেকে গ্রাহকরা যাতে ঠিকমত তাদের প্রাপ্য পায় তার জন্য সমিতির কর্মীদের বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে চলে সমিতির নিজস্ব কাজ লঙ্গরখানা খোলা, ধান-চাল সংগ্রহ করা, দুগ্ধ কেন্দ্র চালানর কাজ ইত্যাদি। এবং এইসব কাজ করতে হত অতি দ্রুত গতিতে—কারণ বুভুক্ষার মরণ-খেলার সাথে মোকাবিলার লড়াইয়ে বড় কথা হল সময়।

গণ বুভুক্ষা—তার ফসল পাইকারী হারে ব্যাধি ও মৃত্যু। কলেরা, ম্যালেরিয়া, শোথ প্রভৃতি মহামারীতে উজাড় হতে লাগল গ্রামের পর গ্রাম।

১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে পরিসংখ্যান হিসাবে ১১০০ গ্রামের মধ্যে ৭০০

গ্রামই ম্যালেরিয়া মহামারীতে আক্রান্ত ছিল। শোনা যায় হুগলি জেলায় প্রায় ১০,০০০ লোক মরে ওই রোগে। বর্ধমান জেলায় আক্রান্ত হয় লাখ খানেক মানুষ, তার মধ্যে মরে ৩৬,০০০। মেদিনীপুরে কলেরা, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য ব্যাধিতে মরে তিন লাখ মানুষ। ২৪ পরগণায় আক্রান্ত হয় ২০,০০০০০ লোক, মরে তিন লাখ। যশোরে ১২ লাখ ম্যালেরিয়ার শিকার হয়, মরে ৬০ হাজার। বরিশালে ম্যালেরিয়া, কলেরা, শোথ মহামারী হয়ে দাঁড়ায়। এক ভোলা মহকুমায়ই ৫০ হাজার মানুষ মরে অনাহারে আর মহামারীতে।

ঢাকা জেলাকে জেলা উজাড় হয়ে যায় ম্যালেরিয়া, বসন্ত আর কলেরায়। শতকরা ৫০ জন মানুষকেই ম্যালেরিয়ায় ধরে। ব্যাধি এবং অনাহার তিন লাখ মানুষকে গ্রাস করে।

ময়মনসিংহে ৪৫ লক্ষ মানুষ ম্যালেরিয়ার শিকার হয়, অনাহার ও অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় আরো তিন লাখ। ১৯৪৩-এর অগাস্ট ও ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ২ লাখ লোক মরে শেষ হয়ে যায়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে দৈনিক মৃত্যুর হার ছিল ২৫০০।

চট্টগ্রাম জেলায় শতকরা ৭০ জন ব্যাধি কবলিত হয়। এ ছাড়াও ছিল ভয়াবহরূপে কলেরা, বসন্ত, চর্মরোগ, শোথ এবং আরো কত কি রোগ। দৈনিক হাজার জন প্রায় মরণের কোলে ঢলে পড়ে।

এই সব বিবরণ থেকেই বোঝা যায় প্রধানতঃ অপুষ্টি-জনিত নানা ব্যাধি কি 'ভয়াবহ চণ্ডমূর্তিতে বাংলাকে তছ্‌নছ্‌ করে দেয়। পরিসংখ্যানগুলি একেবারে কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক না হলেও অবস্থার ভয়াবহতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।

কিন্তু বৃটিশ সরকার চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করলেন তা বাস্তবিকই সমুদ্রে জলবিন্দু। তাই এগিয়ে এলেন ফ্রেণ্ডস্‌ অ্যামবুল্যান্স ইউনিট, পিপলস রিলিফ কমিটির মত স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থাগুলি তাঁদের সীমিত সাধ্য নিয়ে। এ সময়ে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল, সমস্ত চিকিৎসা-প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করার। বরেণ্য ডাঃ বি সি রায় এই কাজের জন্য আহ্বান জানালেন জনসাধারণের কাছে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্থাপিত হল দ্য বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অরডিনেশন কমিটি—যার সভাপতি হলেন ডাঃ বি, সি, রায় এবং সম্পাদক হলেন অধ্যাপক কে পি চট্টোপাধ্যায়।

১৯৪৩ এর মধ্যে শুধু কলকাতায়ই তিনটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হল।

১৯৪৫ সাল নাগাদ চট্টগ্রাম নারী সমিতি নিজেদের চেষ্টায় দুঃস্থ শিশুদের জন্য একটা হাসপাতাল স্থাপন করে। সমস্ত পূর্ব ভারতে এটি ছিল দুঃস্থ শিশুদের সেবায় নিয়োজিত একমাত্র হাসপাতাল। এই সমিতির সভ্যগণ আগে থেকেই শহরের জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে কাজের সাহায্য করছিলেন। কিন্তু পাইকারী হারে অনাহার-জীর্ণ শিশুদের মরতে দেখে স্বল্প আর্থিক সাধ্য সত্ত্বেও তাঁরা এই হতভাগ্য শিশুদের জন্য আলাদা হাসপাতাল স্থাপন করাই স্থির করেন। ওদের হাত পা কাঠির মত, পেট-জোড়া পিলে, অপুষ্টির জন্য মুখ ফোলা। অনেকেই চোখের সামনে মরতে দেখেছে মা বাপকে। আবার কারো কারো মা খাবার খুঁজতে গিয়ে আর ফেরেনি।

চট্টগ্রাম জেলা ফুড কমিটি ১০০টি বাচ্চাকে চিত্তরঞ্জন অনাথাশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করলেন। মাত্র ১০০টি বাচ্চা; আর ওদিকে চারদিকে অসংখ্য বাচ্চা ধুকছে ক্ষিদেয়, রোগে, কলেরা, আমাশয়ে…। গোটা অনাথালয় নানা ছোঁয়াচে রোগে দূষিত।

টাকার অভাবে নারী সমিতির হাসপাতালের অবস্থা প্রায় অচল। কাজের লোক জোটানও কঠিন এই অবস্থায়। নারী সমিতির দুইজন কর্মী হাত বাড়িয়ে দিলেন; তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কমিউনিস্ট মেয়ে সবিতা শ্যাম; আরেক জন কিষাণ মেয়ে কিরণ বালা দে। কিরণ এল শ্রীরামপুর থেকে। ও এক দুর্গত পরিবারের মেয়ে। ওর পরিবারের সবাই খেত লঙ্গরখানায়। স্কুলে পড়ত কিরণ। ভালো ছাত্রী ছিল। ওর বাবা আর পড়াতে পারেননি ওকে। এই সব সোনার মেয়েদের আমরা পেয়েছি কর্মী হিসেবে। নিজেরাই এসেছে এগিয়ে মিয়োন ফুলকুঁড়িগুলোকে বুকের ওম দিয়ে জীইয়ে তুলতে।

টাকা নেই, তবু চলে হাসপাতাল, চলে হাসপাতালের কর্মীদের ভালোবাসায়। এক বছরের ওপরেই চলল এইভাবে। হাসপাতালে রোগী এসেগেছে ২৭৭ জন—তার মধ্যে মারা গেছে ৪০ জন। প্রায় ২১৫ জনের ঘোর দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হল। বাঁচল তারা।

১৯৪৪—৪৫-এ কলকাতার বস্তী এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যালেরিয়া। ওষুধ নেই, ওষুধের অভাবে মরতে লাগল মানুষ। ১৯৪৪-এর ১লা ডিসেম্বর উত্তর কলকাতার মানিকতলা এলাকায় ছোট্ট একটা ডিসপেনসারী খোলা হল।

খুললেন শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা মিত্র, তাঁর ঐকান্তিকী চেষ্টায়। আজীবন কংগ্রেসের কর্মী, নিরলস জনসেবাই করে এসেছেন। এখনও করে চলেছেন। এই কেন্দ্রটি তিনি মঃ আঃ রঃ সঃ-র নামেই খুললেন। দৈনিক ১০০ থেকে ১৫০ রোগীর ভিড় লেগে থাকত এখানে।

কমিউনিস্ট কর্মীরা দেখলেন বিরাট কাজ—নতুন বাংলা গড়ার কাজ—কারো একার কাজ নয়, হাত লাগাতে হবে সবাইকে—ডাক দিয়ে জাগাতে হবে দেশব্রতী সব প্রতিষ্ঠানকে—গড়তে হবে নতুন বাংলা, যত বাধাই আসুক।

শুধু কি মহামারীর আর ক্ষুধার মার মেয়েদের ওপর? সে মরণ তো আছেই। আশ্রয়হীন, অভিভাবকহীন অভাগিনীর পায়ে পায়ে ওঁৎ পেতে আছে আছে আর এক মরণ—নৈতিক অধঃপতন পতিতা বৃত্তি। এই দুই মরণ হতে হাজার হাজার মেয়েকে বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হল মহিলা সমিতিকে।

এর জন্য প্রথম ধাপ হল আন্দোলন, আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জন-সমাজকে সচেতন করার আন্দোলন, দর কমাবার এবং রেশন ব্যবস্থা চালু করবার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়ার আন্দোলন—ভুখ্ মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি চলতে লাগল। দলে দলে যোগ দিল হাজার হাজার মেয়ে।

দ্বিতীয় ধাপ হল মানুষকে মরতে দেখে নির্বিকার চোখে না চেয়ে থেকে যে করে হোক লঙ্গরখানা নিজেরা খোলা এবং সরকারকে দিয়ে আরো অনেক লঙ্গরখানা খোলান, গোপন মজুদ আর কালোবাজারীকে খুঁজে বের করানো।

তৃতীয় ধাপ হল নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব, দুর্গত মেয়েগুলোকে আশ্রয় দেওয়া, অবলম্বন দেওয়া—অর্থাৎ তাদের পুনর্বাসন। পতিতা-বৃত্তির জন্য মেয়ে শিকারী দালালদের হাতে পড়া থেকে মেয়েদের আগলে রাখার সংগ্রামও ছিল এই পুনর্বাসন-প্রচেষ্টার শামিল। দারুণ বস্ত্র-সঙ্কট নিয়ে এল আর এক বিপদ, এক গাছা সুতো নেই কোন মেয়ের লজ্জা নিবারণ করার। এরও জন্য করতে হয় সংগ্রাম।

ইতিমধ্যে মঃ আঃ রঃ সঃ ডালপালা ছড়িয়েছে প্রায় সব জেলায়। এ যাবৎ করা কাজের একটা হিসেব নিকেশ দরকার এবার; দরকার প্রথম পর্যায়ের কাজগুলোর একটা সমন্বয়। এ দরকার যে সবাই বুঝেছেন তা প্রত্যক্ষ হল, জেলায় জেলায় সম্মেলনের প্রস্তুতিতে। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের

মহিলাদেরও এই সব ত্রাণ-কার্যের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা হতে লাগল। নাটক, অভিনয় প্রভৃতি চিত্তহর পদ্ধতির সাহায্যে, মেয়েদের সামনে যে সমস্যা রয়েছে তার মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে তা শেখান চলতে লাগল। সোভিয়েত বীর রমণীদের ফ্যাসি-বিরোধী নির্ভীক সংগ্রাম সম্বন্ধে পোস্টারের প্রদর্শনীও করা হয় কোন কোন সম্মেলনে। কৃষক-রমণীরা, শহরের মেয়েরা মিছিল করে আওয়াজ দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলার দৃশ্য, সেকালে ছিল সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার। মানুষ ভাবত রাজনৈতিক দলগুলোরই ওসব কাজ। তখনও বুঝতে শেখেনি এরা যে এটা রাজনৈতিক দলবাজী নয়, এ লড়াই শুধু মেয়েদের বোঝবার জন্য নয়, জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য। এই সব নানাভাবে মানুষকে জাগান বোঝানোর কাজ মঃ আঃ রঃ সঃ-ই প্রথম করে তাদের সম্মেলনের প্রস্তুতির সময়ে।

১৯৪৪-এর ১১শে মার্চ মেদিনীপুর জেলার তমলুকে সম্মেলনের প্রতিনিধি-দের পায়ের ধ্বনি শোনা যায়। ৪০০ ডেলিগেট আসেন এবং ৭০ বৎসর বয়স্কা প্রবীণা কংগ্রেস কর্মী লক্ষ্মীরাণী চৌধুরীর উদ্দীপ্ত ভাষণ শোনেন মন দিয়ে। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুচরিতা দাস তমলুকের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বর্ণনা করে তমলুকে জেলা মহিলা সমিতির সদর দপ্তর করার দাবী রাখেন। রাজ্য মঃ আঃ রঃ সঃ-র নেত্রী মণিকুন্তলা সেন বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের ভবিষ্যতের কাজ বুঝিয়ে বলেন। সভার শেষে গ্রামের মেয়েরা একটা অভিনয় করে। এই অভিনয়ে দেখান হয় বর্তমানের দুঃখ বেদনার বাস্তব জীবনের ছবি আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। সকলেই অত্যন্ত অভিভূত হয়।

১৯৪৪-এর ১৫ই মার্চ হয় বাঁকুড়ার তৃতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন ৪০০ শ্রমিকশ্রেণীর এবং ১০০ মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা।

১৯৪৪-এর ২৬শে মার্চ মণিকুন্তলা সেনের নেতৃত্বে ঢাকার নর্থব্রুক হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার চল্লিশটি কেন্দ্র থেকে ৭০০ জন প্রতিনিধি আসেন এই সভায়।

এই সভায় কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ওপর জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার নিষেধবিধি তুলে নেওয়া এবং জাতীয় ঐক্যের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবী করা হয়।

দিনাজপুরে সম্মেলন হয় ১৯৪৪-এর ২৬শে মার্চ। বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনার

সঞ্চার হয় শহরে। দশটি থানা থেকে কিষাণ মেয়েরা আসেন সভায়; শহরের মেয়েরাও আসেন। সভানেত্রী ছিলেন জুঁইফুল রায়। সভাটি হয় স্থানীয় নাট্টালয়ে। হলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। বোরখা খুলে মুসলিম মেয়েরাও আসেন। দিনাজপুরের মেয়েদের জীবনে এ এক নতুন দিনের প্রভাত। মুসলিম লিগের সম্পাদক সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম মেয়েদের নেত্রী শাহাজাদী বেগম ও শবেদা খাতুনও উপস্থিত ছিলেন। নামকরা কংগ্রেস কর্মী শ্রীমতী স্নেহলতা গাঙ্গুলীও এসেছিলেন। এইটিই প্রথম সম্মেলন যেখানে দলমতনির্বিশেষে সর্বস্তরের মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

গ্রাম থেকে আসা মহিলা প্রতিনিধিদের ক্যাম্পগুলি উৎসাহে, আনন্দে মুখরিত। এক সঙ্গে খাওয়া, ওঠা, বসা, আলোচনা করা, জাতীয় গান গাওয়া—এ যেন নারী আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়।

বাণী মিত্র (পরে দাশগুপ্ত), বীণা সেন (পরে গুহ), সাবিত্রী সেন, আশা সেন, বেলা চক্রবর্তী প্রভৃতি তরুণী কর্মীরা এক এক করে শ্রীযুক্তা কস্তুরবার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ, এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি পেশ করেন। গ্রামে সংগঠনের সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়। সাধারণ কৃষক মেয়ে কণ্ঠমণির বক্তৃতা হয়েছিল সব চেয়ে প্রাণস্পর্শী। নারী আন্দোলনই ওর মুখে ভাষা ফোটায়।

সোভিয়েট নর-নারী-শিশুর ওপর নাৎসি বর্বরতা ও তার বিরুদ্ধে সোভিয়েটের মানুষের অসম-সাহসিক সংগ্রামের ছবিওয়ালা কতগুলি পোষ্টার ছিল।

কংগ্রেস নেত্রী স্নেহলতা গাঙ্গুলি জেলা কার্যকরী সমিতির সভানেত্রী হন, মুসলিম নেত্রী শাহজাদী বেগম হন সহ-সভানেত্রী এবং সম্পাদিকা হন কম্যুনিস্ট বাণী মিত্র।

সভার শেষে বিভূতি গুহের—"বাংলার ওপর কালো ছায়া" অবলম্বনে একটি মূক অভিনয় মঞ্চস্থ করা হয়। ২৫০ জন শ্রমিকশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত মহিলা প্রতিনিধি প্রথম থেকে শেষ অবধি বসে সভার কাজ কর্ম অনুধাবন করেন।

রাজশাহীতে মঃ আঃ রঃ সঃ-র জেলা সম্মেলন হয় ১৯৪৪-এর ৮ ও ৯ই মে। বহু নিন্দা, গঞ্জনা সইতে হয়; মঃ আঃ রঃ সঃ-র কর্মীদের চরিত্র হনন করে বহু কাগজ ছাপিয়ে বিলি করা হয়। এসব সয়েও হল সম্মেলন। ও পক্ষের সব

বিরোধিতা, বাধা নস্যাৎ হয়ে গেল। ৬০০ মহিলা সম্মেলনে যোগ দিলেন। হল গমগম করতে থাকে।

এই সম্মেলনের ফলে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। মুসলিম মহিলাদের উদ্যোগে ১১ই এপ্রিল প্রায় ৩৫০ জন মুসলিম মহিলা স্থানীয় মাদ্রাসায় সম্মিলিত হন। মঃ আঃ রঃ সঃ-র নেত্রী কনক মুখার্জি এই সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করেন। মঃ আঃ রঃ সঃ এবং মুসলিম লীগ-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শ্রীমতী উষা গুপ্তের সভানেত্রীত্বে জলপাইগুড়ি মঃ আঃ রঃ সঃ-র সম্মেলন হয় ১৯৪৪-এর ৬ই ও ৭ই এপ্রিল। প্রকাশ্য অধিবেশন হয় আর্য নাট্য সমাজ হলে। শ' ছয়েক মহিলার উপস্থিতিতে হলটি কাণায় কাণায় ভরে ওঠে।

চট্টগ্রামে সম্মেলন হয় সেইবার প্রথম। প্রায় ২৫০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নেত্রীদের মধ্যে ছিলেন কল্পনা দত্ত, জ্যোতি দেবী প্রভৃতি। চট্টগ্রাম যুদ্ধ এলাকা হওয়ার দরুণ ওখানকার সমস্যা সম্পর্কে সবাই ছিলেন সচেতন। প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল শুধু সংঘবদ্ধ হবার।

নৈহাটিতে সম্মেলন হয় ১৯৪৪-এর ৮ই এপ্রিল—প্রতিনিধি ছিলেন ৭০০ জন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর নেতৃত্বে শোভা যাত্রা করে আসেন মহিলারা। রক্ষণশীলতার পীঠস্থান ভাটপাড়া। চিরাচরিত প্রথাকে পায়ে দলে, বেরিয়ে এলেন সেখানকার মহিলারা প্রকাশ্য সভায় আসার জন্য।

যশোর, পাবনা, হাওড়া, বীরভূম, নোয়াখালি, বর্ধমান এবং আরো অনেক জায়গায় মঃ আঃ রঃ সঃ-র সম্মেলন হয়।

এরপর দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ সম্মেলন হয় বরিশালে ১৯৪৪-এর মে মাসে। এর সাফল্য হয় অভাবিত—কারণ হল গোড়ার সংগঠনগুলির বিস্তার এবং বহু মহিলার তাতে যোগদান। এই ভাবে, সর্বস্তরের মহিলাদের বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক, ও শহরের নিম্ন-বিত্ত ঘরের এবং মধ্যবিত্ত মহিলাদেরও বৃহত্তম গণসংগঠন হয়ে দাঁড়াল মঃ আঃ রঃ সঃ।

দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ ও মহামারীর সময় সেবা প্রভৃতি কাজের ফলে এই সময়ের মধ্যে সভ্যাসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩,৫০০-তে এবং প্রতি জেলায় তার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

হলের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন ৭৩ বৎসর বয়স্কা কংগ্রেস নেত্রী নৃত্যময়ী দেবী। বৃটিশ-বিরোধী বহু সংগ্রাম পরিচালনা করেন এই

প্রবীণা মহিলা। আর ছিলেন জলপাইগুড়ির কংগ্রেস-নেত্রী অমিয়া দেবী—সেই ১৯০৫-এ বঙ্গ বিভাগের সময় থেকে যিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কালনা কংগ্রেসের নির্মল বালা সান্ন্যাল এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাসান মহাশয়ের স্ত্রী, এই সব নেত্রী স্থানীয় মহিলাদের উপস্থিতি সম্মেলনে প্রেরণা যোগায়। এবং এতে প্রমাণ হয়ে গেল যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কোনও কালে নিজেকে শুধু কম্যুনিস্ট সংগঠন করে রাখতে চায়নি, চেয়েছে সমস্ত রকম মত ও পথের মেয়েদের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে।

৪ঠা মে জাহাজ থেকে নামলেন রাজ্যের সবখান হতে ১০০ মহিলা প্রতিনিধি এবং পর্যবেক্ষক। মিছিল করে গেলেন তাঁরা শহরের বুকের ওপর দিয়ে—উৎসাহে গুঞ্জিত হয়ে উঠল গোটা শহর।

৬ই মে হয় প্রকাশ্য অধিবেশন। ৬০০ মহিলা মিছিল করে যান ঐদিন। আজকের দিনে এ কিছুই নয়। কিন্তু ৩৭ বছর আগে মেয়েদের রাস্তায় বেরুবারই রেওয়াজ ছিল না। মিছিল করে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথাই উঠত না। কাজেই সেদিনের পক্ষে ও একটা মস্ত বড় ব্যাপারই ছিল। সম্মেলনের জন্য অভিনন্দন বাণী এল, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সম্পাদিকা কুলসুম সয়ানী, মুসলিম লীগের হামিদা মোসিন, প্রসিদ্ধ লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এবং কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার কাছ থেকে।

সম্মেলনের শুরুতেই শোনা গেল মহাত্মা গান্ধী ছাড়া পেয়েছেন। সভানেত্রী হাজরা বেগম সেই সংবাদ ঘোষণা করতেই হাততালিতে হল ফেটে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাদের মুক্তি দাবী করে সংগ্রাম করেছে মঃ আঃ রঃ সঃ এতদিন। সংঘবদ্ধ আন্দোলন যে শেষপর্যন্ত জয়ী হবেই এই তো তার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ, মুসলিম লিগের সভাপতি, কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান।

রাও কমিটি হিন্দু দেওয়ানী আইনের (Civil Law) সংশোধনের জন্য পুনরালোচনা শুরু করায়, সম্মেলন সন্তোষ প্রকাশ করে। আসন্ন বিধানসভায় এক-বিবাহ বাধ্যতামূলক করে একটি খসড়া আইন পেশ করা হবে ; এ ছাড়াও বেশ্যাবৃত্তি নিরোধের জন্য বঙ্গীয় বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পেশ করবেন

নুর মহম্মদ। সম্মেলন এগুলিকে স্বাগত জানায়। ভারত সরকার কয়লা খনির ভেতরে মেয়েদের নিয়োগ অনুমোদন করেছেন—সম্মেলন তারও প্রতিবাদ করে।

নারী-মাংসের কারবারীদের শাস্তির জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন এবং ঐসব ব্যবসায়ীদের শিকার মেয়েদের পুনর্বাসনেরও দাবী জানান হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন অবস্থায় মহিলাদের পক্ষে এ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। দুর্গত মেয়েদের সমাজ-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে প্রতিটি গ্রামে, জেলায় কর্ম-কেন্দ্র স্থাপন করে মেয়েদের হস্ত-শিল্প ও কুটির শিল্প শিক্ষা দেবার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন মণিকুন্তলা সেন; তিনি জোরাল ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন।

খাদ্য-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে রেশন ব্যবস্থার দাবী জানান হয়। এ দাবী অনবরত এক বছর ধরে জানান হচ্ছে। অবশেষে ২৪ পরগণায়, হুগলিতে এবং পৌর এলাকায় রেশন ব্যবস্থা হয় কিন্তু বহু ত্রুটি ছিল তার মধ্যে। এই সমস্ত ত্রুটি যাতে দূর হয়, তার চেষ্টা করার জন্য মহিলাদের আহ্বান জানান হয়। মহিলা কর্মীদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ করেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতের বুকে জাপানী বোমার আক্রমণ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল। অতএব ফ্যাসিবাদ, বিশেষ করে অগ্রসরমান জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধ ব্যবস্থার দাবী জানান হয় এই সম্মেলনে। জাতীয় সংহতির জন্য জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যও দাবী জানান হয়, কারণ জাতীয় সরকার ছাড়া জাপানী-ফ্যাসিবাহিনীর প্রতিরোধের জন্য সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

আলোচনা যে স্তরে হল, তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল, যে-সব মহিলারা একটু অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা আমাদের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা—যা এখন জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার সমাধানের আলোচনায়ও অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম।

হলের বাইরে লাউড্ স্পীকার লাগান ছিল। প্রায় ৫০০ মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে শুনছিল প্রতিনিধিদের বক্তৃতা। তাঁরা সবল কণ্ঠে বলছিলেন বৃটিশ সরকার ও তার আমলাতন্ত্রের অপশাসনের কথা, বিদেশী শক্তির দ্বারা আমাদের দেশ আক্রান্ত হওয়ার কথা, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের ঘৃণিত, বর্বর আচরণের কথা, সমাজের মধ্যেকার দুর্নীতি ও দুরাচারের কথা। তাঁরা নিখিল

ভারত মহিলা সম্মেলন ও মহিলা আত্মরক্ষা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানান এই সব অবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তভাবে লড়াই করার জন্য।

শ্রীযুক্তা নেলি সেনগুপ্তা নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হন, সম্পাদিকা হন এলা রীড, এবং জুঁইফুল রায় ও কনক মুখার্জী হন যুগ্ম-সম্পাদিকা।

নিখিল ভারত মঃ আঃ রঃ সঃ-র প্রতিবেদন পেশ করেন কমলা মুখার্জি। ঐ প্রতিবেদনে শ্রীমতী মুখার্জি বলেন কি ভাবে প্রতিষ্ঠান সরকারী আমলা-তন্ত্রের ক্রোধের মোকাবিলা করেছে, কি ভাবে গুণ্ডাদের জঘন্য অপবাদ নিন্দা সহ্য করেছে আর বিরোধিতার আক্রমণ সহ্য করেছে। কিন্তু সমস্ত বাধা বিপদ ভাসিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের পথে কদম ফেলে চলেছে। তিনি আরো বলেন যে দুরাশার অন্ধকার কেটে গিয়ে আমাদের সভ্য-জীবন ফিরে আসবে এবং মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পথে আমরা এগিয়ে যাব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ-জীবনের পুনর্গঠন

বরিশাল সম্মেলনের পর মঃআঃরঃসঃ-র শাখাগুলি পূর্ণ উদ্যমে লেগে গেল সম্পূর্ণ নিঃস্ব দুর্গত মেয়েদের পুনর্বাসনের কাজে। শুধু দুর্গত মেয়েদেরই পুনর্বাসন নয়—যে-সব মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তিতে যেতে বাধ্য হয়েছিল তাদেরও। এই সব মেয়েদের আশ্রয় চাই, জীবিকা চাই। বহু জায়গায় ত্রাণের কাজ তখনও চলছিল। প্রয়োজন হল ত্রাণ-কাজের সঙ্গে পুনর্বাসনের কাজও চালিয়ে যাওয়া।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি "সমাজে পুনর্বাসন সপ্তাহ" পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা আওয়াজ তুলল: "সমাজ-জীবন ফিরিয়ে আন. সমাজ জীবন গড়ে তোল।" আরও সিদ্ধান্ত হল, এই সব দুর্গত মেয়েদের আশ্রয় ও জীবিকার জন্য কর্ম-কেন্দ্র খুলতে সরকারের ওপর চাপ দিতে হবে। চাপ দিতে হবে মহামারীর কবল হতে এদের রক্ষার জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে জোরদার আর ত্বরান্বিত করার জন্য। আরো দুগ্ধ ও শিশু-পালন কেন্দ্রও চাই।

জেলায় জেলায় মহিলা সমিতিগুলি নিজেরাই উদ্যোগী হল টাকা তুলে দুর্গত মেয়েদের জন্য আশ্রয় ও শিশু-পালন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরম্ভ করে দিতে। কিন্তু দুর্গতির এই মহাসমুদ্রে বে-সরকারী চেষ্টা আর কতটুকু করবে? প্রয়োজন জনসাধারণের সাহায্যে এই কাজ সরকারের নিজের হাতে তুলে নেওয়া। কিন্তু বৃটিশ সরকারেরই বিশেষ উদ্যম বা ইচ্ছা দেখা গেল না। যে-টুকু করলেন তা না করার মত।

চট্টগ্রামে পাঁচটি আশ্রয় শিবির চলছিল। তাতে আশ্রয় পেয়েছিল মাত্র ১৫০ জন।

ঢাকায় ছিল তিনটি কেন্দ্র—কুকুটিয়া ও হাসারায় দুইটি কেন্দ্র চলছিল সরকারী অর্থে, কিন্তু তার ব্যবস্থাপনা ছিল মঃআঃরঃসঃ-র হাতে। প্রত্যেকটিতে ২০ থেকে ২৫ জন করে মহিলা ছিল। মাণিকগঞ্জেও একটি কেন্দ্র ছিল।

এই কেন্দ্রটি মঃআঃরঃসঃ নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করে চালাত। এখানে তাঁরা মাত্র ১২ জনের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু টাকা না এলে যে এ-সব কেন্দ্র বেশী দিন চালান যাবে না এ সত্য ক্রমশঃই স্পষ্ট হতে লাগল। ঢাকায় ২০।২৫টি চরকা-কেন্দ্র ছিল। কিন্তু তুলোর অভাব এত তীব্র হয় যে ঐ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দিতে হয়। নরসিংদিতে মাছ-ধরা জাল বুনবার একটি কেন্দ্র ছিল—১২টি মেয়ে কাজ করত সেখানে। নারায়ণগঞ্জে একটি গামছা-বোনার কেন্দ্র ছিল। মধ্যবিত্ত মেয়েরা কাজ করত এখানে। ঢাকা শহরের তাঁতিবাজারে জনা কুড়ি দুর্গত মেয়েকে নানা রকম হাতের কাজ শেখান হত। মঃআঃরঃসঃ মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করে, সেই চাল বেচে মেয়েদের মজুরী দিত।

নোয়াখালির পশ্চিমকূল, অশ্বদিয়া, খহায়ভিখারীতে কয়েকটি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র এবং একটি শিশু-পালন কেন্দ্র খোলা হয়। এই কেন্দ্রে ৫০টি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ হয়।

কুমিল্লাতে মঃআঃরঃসঃ নিজেদের চেষ্টায় একটি কর্ম-কেন্দ্র খোলে। এর জন্য এক হাজার টাকা সাহায্য, চরকা-কাটার সুতো, আর কেন্দ্রের জন্য একটি ঘর পাওয়া যায়। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন একটি শিশু-কেন্দ্র খোলে; কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা চন্দও অনুরূপ একটি কেন্দ্র খোলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ১০০০ জনের জন্য একটি চরখা-টেস্ট রিলিফ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সরকার একটি ধান-ঝাড়াই কেন্দ্রও স্থাপন করেন। ১০০টি মেয়ে এখানে কাজ করে।

ফরিদপুরে পুনর্বাসন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। ১০৪টি সরকারী কর্ম-কেন্দ্র ছিল। এখানে মেয়েদের ডাল-ছাঁটা, শটীর পালো তৈরী করা, হোগলা বোনা ইত্যাদি শেখান হত। প্রত্যেকের খাতায় এক আনা করে মজুরী হিসেবে জমা করে রাখা হত। এই সব কেন্দ্রে প্রায় ১০,০০০ মেয়ে থেকে কাজ করত। আর হাজার বিশেক রাতে বাড়ী চলে যেত।

সরকার কোরকদি, কলারগাঁও, তুলাসার, ও ইদিলপুর গ্রামে মঃআঃরঃস-র সাহায্যে কতগুলি কেন্দ্র চালাত। মাদারীপুরে সরকার ৪০টি মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি থেকে উদ্ধার করে।

ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় একটি আশ্রয়-শিবির খোলা হয়। এখানে পুরুষ, মহিলা আর শিশু মিলে প্রায় ৬০০ জনের ব্যবস্থা হয়। নেত্রকোণায়

১৩টি মেয়েকে বেচে দেওয়া হয়েছে বলে শোনা যায়। এর মধ্যে দশটিই মুসলমান। সেরপুরেও একটি কেন্দ্র খোলা হয়।

দিনাজপুরে একটি কেন্দ্রে ৬০।৭০ টি মেয়েকে ডাল ছাঁটাই-এর কাজ শেখান হয়। আর একটি গ্রামে একটি হস্ত-শিল্প কেন্দ্রে রেড়ীর তেল, শটীর পালো তৈরী করা, চটের থলে বানানো ইত্যাদি শেখান হত।

রাজশাহীতে ১৭টি ছেলে মেয়ে নিয়ে একটি কেন্দ্র খোলা হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে এটি বন্ধ হয়ে যায়, কারণ সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় না।

পাবনার আতাইকুল্লা গ্রামে রিলিফ কমিটি একটি আশ্রয় শিবির ও একটি কর্ম-কেন্দ্র চালায়। কর্মকেন্দ্রে ৯০টি ধান কল ছিল, এতে ২৮০ জন মেয়ে কাজ করত। তিনটি তাঁতে কাপড় বোনা হত। পুরুষেরা বাঁশের কাজ করত। ৫০০টি হাতের তাঁত বসানর পরিকল্পনাও করা হয়। ১১টি পরিবার ধান-কোটার কাজ করত। প্রতি পরিবার সপ্তাহে দুই মণ ধান কুটত। তার বদলে মজুরী হিসেবে তারা আড়াই সের চাল পেত। সরকারী আর্থিক সাহায্যে মঃআঃরঃসঃ এই সব কাজ চালাত।

চট্টগ্রামে নারী সমিতি গোটা জেলায় রেশন ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত শুধু শহরে রেশন ব্যবস্থা করাতে সক্ষম হয়েছিল তারা। নারী সমিতি সাতকানিয়ায় তিনটি কেন্দ্র চালাচ্ছিল। সেখানে মেয়েদের সুতো কাটা, মাছ-ধরা, জাল বোনা আর কাপড় বোনা শেখান হত। কেন্দ্রে তৈরী জিনিস বিক্রী করে যে লাভ হত তা সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হত। বারাসা গ্রামেও একটি আশ্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়।

রংপুর জেলায় মঃআঃরঃসঃ-র সভ্য সংখ্যা ছিল ৩০০০। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত বেঙ্গল রিলিফ কমিটি মঃআঃরঃসঃ-কে অর্থ-সাহায্য দিত না। কিন্তু এত সহজে দমানো গেল না মঃআঃরঃসঃ-কে। ১৯৪৪-এর প্রথম থেকেই মঃআঃরঃসঃ দুগ্ধ-কেন্দ্রের মাধ্যমে মা ও শিশুদের সাহায্য দিতে এবং রোগীর সেবা করতে আরম্ভ করে। প্রচুর আন্দোলনের ফলে তারা বন্টনের জন্য কিছু স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় পায়। তারা কতগুলি কর্ম-কেন্দ্র খোলে, যেখানে মেয়েদের শটীর পালো তৈরী শেখান হয়। এছাড়াও একটি কুটিরশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র খোলে—যেখানে মেয়েরা বিভিন্ন হস্ত-শিল্পে প্রশিক্ষণ পায়। গোটা জেলায় ৬টি দুধের কেন্দ্র ছিল। শ'দেড়েক শিশু এখান থেকে দুধ পেত। সমিতি একটা অনাথাশ্রমও

চালাত।' নীলফামারিতে তারা ২০০০টি স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিলি করে। এইসব মেয়েদের লজ্জা ঢাকবার মত এক গাছি সুতোও ছিল না। "ম্যালেরিয়া রোখ" কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে তারা কুইনিনও বিলি করে।

বগুড়াতে একটা নতুন শাখা গঠিত হয় ৬০০ সভ্য নিয়ে। তাঁরা দুইটি দুগ্ধ-কেন্দ্র চালান এবং ওষুধ ও স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিলি করেন। রেবেলা বেগম প্রমুখ মুসলিম লিগের নেত্রীস্থানীয় মহিলারা, শ্রীমতী চাকীর মত কংগ্রেস মহিলারা, রেণু গাঙ্গুলী এবং অমিতাভ চ্যাটার্জির মত কম্যুনিস্ট মেয়েদের সঙ্গে মঃআঃরঃসঃ-র হয়ে হাত মিলিয়ে কাজ করেন।

সরকার মঃআঃরঃসঃ-র সহযোগিতায় রংপুর শহর, নীলফামারি, এবং ডোমারায় তিনটি আশ্রয়-কেন্দ্র খুলতে সম্মত হন। গাইবান্ধাতে একটি শিশু-পালন কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। এ সব কিছুর জন্য মঃ আঃ রঃ সঃ ধন্যবাদার্হ।

বাঁকুড়ায় কতকগুলি টেস্ট রিলিফ কেন্দ্র আর একটি আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। এই কেন্দ্রে ধান-কোটা ও বাঁশের কাজ শেখান হত। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন একটি শিশু কেন্দ্র খোলে। এখানে ৭০টি শিশু থাকত। প্রখ্যাতা গান্ধীবাদী মহিলা নেত্রী লাবণ্যপ্রভা চন্দ একটি হস্ত-শিল্পের কেন্দ্র খোলেন।

সম্মিলিত রিলিফ কমিটি যশোরে একটি রিলিফ কেন্দ্র খোলেন। এখানে মহিলাদের ঠোঙ্গা বানান, গামছা বোনা, পাটি মাদুর বোনা ইত্যাদি শেখান হয়। মঃআঃরঃসঃ ৯টি হস্তশিল্প-কেন্দ্র খোলে। মঃআঃরঃসঃ-র সহযোগিতায় বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী ডাঃ জীবন রতন ধর একটি শিশু হাসপাতাল স্থাপন করেন।

খুলনাতে একটি সরকারী হাসপাতাল খোলা হয়। মঃআঃরঃসঃ-র কর্মীরা এই হাসপাতালে সেবিকার কাজ করেন। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনও একটি শিশু-কেন্দ্র খোলে।

স্থানীয় মহিলা সংগঠনগুলি, জনরক্ষা সমিতি, ফ্রেণ্ডস্ অ্যামবুলেন্স ইউনিট এবং অন্যদের সহযোগিতায় এবং সংযুক্ত ফুড্ কমিটির উদ্যোগে ২৪ পরগণার জয়নগরে একটি আশ্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়। এই কেন্দ্রে ২০ জন মহিলার স্থান হয়। বারাসতে আর একটি কেন্দ্র খোলা হয়। এখানে আশ্রয় পান ৭০জন মহিলা। দুটি কেন্দ্র খোলে ফ্রেণ্ডস অ্যামবুলেন্স্ ইউনিট—একটি ফলতায়, আর একটি বসিরহাটে। ফলতার কেন্দ্রে কাজ করেন ২৪ জন মহিলা এবং বসিরহাটে কাজ করেন ৩০ জন মহিলা।

কিন্তু ওসবই ক্ষুদ্র সাধ্যের ক্ষুদ্র কাজ। সব জোড়া দিয়েও মুনাফাখোর, কালোবাজারী আর হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের মারণ-খেলায় বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত অসংখ্য জীবনের সমুদ্রে সে আর কতটুকু? এই মানুষগুলোকে বাঁচাবার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৪-এর ১০ই জুন থেকে ১৭ই জুন একটি স্মারক সপ্তাহ পালন করে মঃআঃরঃসঃ। সমস্ত জেলায় পালিত হয় এই সপ্তাহ। এই সময়ে ১০০টি বৈঠক-সভা, ৫০টি আর একটু বড় সভা হয়। সমিতি ১৫,০০০ প্রচারপত্র বিলি করে মহিলাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা ও তার জন্য সর্বজনের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে।

দুর্গত মানুষের দুর্গতি যখন চরম সীমায়, সরকার ঘোষণা করে বসলেন ১৯৪৪-এর ৭ই জুলাই—৫০০ কর্মকেন্দ্রের মধ্যে ৬০টি মাত্র রেখে বাকীগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই হৃদয়হীন আদেশের বিরুদ্ধে লড়তে হয় মঃআঃরঃসঃকে আর কম্যুনিস্ট মেয়েদের।

১৯৪৪-এর মে'র শেষ নাগাদ বরিশালে দুর্গতদের জন্য একটি আশ্রয়-শিবির খোলা হয়। ৮ই জুলাই খোলা হয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মকেন্দ্র এবং একটি আশ্রয়শিবির। এ দুটিই বরিশাল নারী কল্যাণ ভবনের নামে খোলা হয়। সমিতির বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে তৈরী জিনিস বিক্রীর জন্য আত্মরক্ষা বিপণি নামে একটি দোকানও খোলা হয়। ভবনের শিল্পকেন্দ্রে ৩০টি মেয়ে কাজ করতেন—তাঁত বোনা, বাঁশ-বেতের কাজ, সুতো কাটা, ঝাঁটা তৈরী, পাটি-মাদুর বোনা ইত্যাদি নানা কাজ করতেন তাঁরা। শিশুদের লেখাপড়া শেখান হত। মঃআঃরঃসঃ তাদের দুটি লঙ্গরখানায় নারী, শিশু সহ প্রায় ২০০০ মানুষকে অন্ন যোগাত। কিন্তু সরকারী আদেশে রিলিফ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই লঙ্গরখানা দুটি বন্ধ করে দিতে হয়। অভাব হল অর্থের। হাজার চেষ্টায়ও এদুটি খোলা রাখা গেল না। কিন্তু কয়েকজন মেয়ে এমন শোচনীয় অবস্থায় আমাদের কাছে আসে যে, তখন তাদের আশ্রয় না দিলে তারা দেহ বিক্রী করতে বাধ্য হত। মঃআঃরঃসঃ-র সম্পাদিকা ছিলেন মনোরমা বসু। ১৯২১ সন থেকে তিনি কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। কংগ্রেসে থাকাকালীন তিনি পরিত্যক্তা মেয়েদের জন্য 'মাতৃ-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর

কম্যুনিস্ট হয়ে আবার তিনি দুর্ভিক্ষে আশ্রয়চ্যুত, দুর্গত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলাদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্য আবার মাতৃমন্দিরের দরজা খুলে দেন। সমিতির কর্মীরা অর্থ সংগ্রহ করেন। শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। বরিশালের 'জনকল্যাণ ভবনের' জন্মের ইতিহাস হল এই।

আমাদের অল্প সাধ্যের ছোটখাট কাজকর্মের ফলে অন্তত: জন পঞ্চাশ মহিলা এবং শিশু তাদের জীবনের সূত্রটিকে আবার খুঁজে পায়। হৃদয়হীন, নির্বিকার বৃটিশ সরকার এদের মুখের ওপর যেখানে আশ্রয় শিবিরগুলি বন্ধ করে দিচ্ছেন সেখানে আমাদের এই কাজ, সামান্য হলেও কি দেশপ্রেমের পরিচয় দেয় না?

বাংলার মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সংগ্রাম করেছে তার একটি ভাস্বর দৃষ্টান্ত এই নারীকল্যাণ ভবন। কংগ্রেস জীবন থেকে আরম্ভ করে কম্যুনিস্ট জীবন জুড়ে মনোরমা বসু নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত প্রেরণার উৎস। প্রতিকূল সরকারের সমস্ত বাধা বিপত্তি স্ব-শক্তিতে দূরে ঠেলে এগিয়ে যান তিনি। তাঁর দৃপ্ত সাহস, তাঁর গভীর দেশপ্রেম, আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা, এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বরিশালে তাঁর কর্মোদ্যম—প্রতি হৃদয়ে তার স্বীকৃতি প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বহু বিঘ্ন-বিপদ, আলোড়নের মধ্য দিয়ে গেছে বরিশাল; কিন্তু সবকিছুর মধ্যে মাতৃ-মন্দিরের দীপশিখা রয়েছে অনির্বাণ।

মঃআঃরঃসঃ-র উদ্যোগে কয়েকটি কর্মকেন্দ্র খোলা হয় তেরচর, ইচলি, গাভুরিয়া, পটুয়াখালি, বীরপাশা, ঝালকুটিয়া, গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রামে। এখানকার মেয়েরা চাল ভাজত, তাঁত ও বাঁশবেতের কাজ করত। প্রত্যেক কেন্দ্রে ১৫/২০ জন করে কাজ করত।

প্রায় এই সময়েই কলকাতা আত্মরক্ষা সমিতি একটি ভারী সুন্দর প্রদর্শনী করে। প্রদর্শনীটি হয় কর্পোরেশনের একটা স্কুলে। বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে এবং শিল্পকেন্দ্রে যেসব জিনিস তৈরী হচ্ছিল সেসব এখানে দেখান এবং বিক্রী হয়। নানারকম সূঁচের কাজ, হাতের তাঁতের সাড়ী, পাটি, মাদুর, বাস্কেট, পাপোষ, পুতুল, চামড়ার ব্যাগ, চাটনী, জ্যাম-জেলী ইত্যাদি নানারকম জিনিস প্রদর্শনীতে রাখা হয়। হাতের তৈরী কাগজের দোকানও একটা ছিল; এখানে হাতে-কলমে কাগজ তৈরী দেখান হয়। বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল

এটা। ঐ সময় চলছিল কাগজের দুর্ভিক্ষ। কতকটা এই অভাব আংশিক মেটান ও মেয়েদের দুটো পয়সা উপার্জনের জন্যও বেশ কয়েকটি জায়গায় সমিতি, কাগজের কেন্দ্র খোলে। আরেকদিকে ছিল চায়ের স্টল। মহিলারা নিজেরাই খাবার তৈরী, চা বানানো, পরিবেশন সব করছিলেন, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম। খুব ভিড় হয় এখানে। প্রদর্শনীতেও দারুণ ভিড় হয়। সর্বস্তরের মহিলারা আসেন দেখতে। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের শ্রীমতী শামসুন্‌ নাহার প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় দিন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। শেষের দিন একটি মহিলা সম্মেলন হয়। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। মেয়েদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "বাংলাকে বাঁচাতে হলে ৪০,০০০ মেয়ে চাই যারা এমনি করে কাজ করবে।" এমনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে মঃ আঃ রঃ সঃ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একটা সরকারী অনাথালয় ছিল। ১৭টি অনাহারক্লিষ্ট শিশু নিয়ে এটি খোলা হয়। তারপর বেড়ে বেড়ে সেই ১৭ দাঁড়ায় ৫৬-তে।

সরকারী প্রতিষ্ঠান চালান আমলা-কেরানীরা। অসাধুতা ও দুর্নীতির নরক হয়ে দাঁড়ায় ওটা। বরাদ্দ টাকা কোথায় উবে যায়। নানারকম নৈতিক কদাচারের কথাও শহরে শোনা যায়।

কম্যুনিস্ট মিলন রায় আসেন অনাথালয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় সব। নারী সেবা সংঘে শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীমতী রায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া যান। দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাল ধরেন তিনি শক্ত হাতে। যা হয়ে থাকে—শ্রীমতী রায়ের নামে কুৎসা রটনা হতে লাগল। পরোয়া করলেন না তিনি। দাঁড়ালেন শক্ত পায়ে। তাঁর নিষ্ঠা এবং চরিত্র বলে শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রভূত উন্নতি হয়।

কিন্তু পরিস্থিতির তুলনায় এ অতি সামান্য। মেয়েদের দুর্গতিরও সীমা পরিসীমা নেই। দুটি দানা পেটে দিয়ে জানের ধুকপুকানিটুকু বজায় রাখতে দলে দলে মেয়েদের বাধ্য হয়ে দেহ বিক্রয় করতে হয়। তাকিয়ে দেখছেন ক্ষমতায় আসীন নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার সরকার। এইসব অভাগিনীদের বাঁচাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দরকার—সংগ্রাম আর সংগ্রাম।

এই সব নিরাশ্রয় নিরবলম্ব মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তির পথ থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁদের বাঁচার পথ ও সমাজে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৪ সনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি অন্যান্য মহিলা ও রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি সংযুক্ত কমিটি করে। কমিটির নাম হয়, নারী-সেবা সঙ্ঘ। এর সভাপতি হন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদকত্ব করেন শ্রীমতী সীতা চৌধুরী ও শ্রী ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই সংঘের পৃষ্ঠপোষকতা করে ইয়ং উইমেনস ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন্, বেঙ্গল উইমেন্স্ ফুড্ কমিটি, কলকাতা রিলিফ কমিটি, সার্ভেন্ট্স অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি, পিপ্‌লস্ রিলিফ কমিটি, হিন্দু মিশন, কলকাতা ভিজিল্যান্স অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল অফ্ উইমেন, মহারাষ্ট্র ভগিনী সমাজ, ফ্রেন্ডস অ্যামবুল্যান্স ইউনিট্, অল বেঙ্গল ফুড্ অ্যান্ড্ ফ্যামিন রিলিফ কমিটি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, রামকৃষ্ণ সমিতি প্রভৃতি। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, শ্রী ইউ, কে, পাতিল, শ্রীমতী বি এম সেন, শ্রীমতী এম্ কে সেন, ডাঃ সৌরেন ঘোষ এবং আরো অনেক ব্যক্তি এই কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয়-কেন্দ্র ও হস্ত-শিল্পকেন্দ্র খোলা।

মঃ আঃ রঃ সঃ-র সম্পাদিকা এলা রীড প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ব্যাপকভাবে মহিলাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার আহ্বান জানান। কারণ, তিনি বলেন, এই দুর্ভিক্ষে মেয়েরাই ভুগছে বেশী। জাতীয় নেতারা জেলে থাকায় নারীর মুক্তিকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অঙ্গীভূত করার পক্ষে প্রচুর বাধা ঘটছিল। তিনি দলমতনির্বিশেষে সব মহিলা সংগঠনকে আহ্বান জানিয়ে বলেন—আজ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন খাদ্য এবং ত্রাণ-ব্যবস্থার জন্য, জাতীয় নেতাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে ; এবং নেতাদের মুক্তির জন্য চাই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা দেশহিতৈষী আছেন তাঁদের মিলন। তার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস করতে হবে। সব মেয়েদেরই এগিয়ে এসে এই সব সংগ্রাম আর প্রয়াসে যোগ দিতে হবে এক সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে।

তিনি বেশ ভালো করে বুঝিয়ে বলেন কেন ত্রাণ-কার্যের সঙ্গে জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মত রাজনৈতিক কাজও যুক্ত হওয়া দরকার ; কেননা তা নইলে দেশের সামনে যে বিরাট সমস্যা রয়েছে, বৃটিশ সরকার ক্ষমতায় থাকাতে তার কোন সুরাহা হবে না।

সুতরাং নারী সেবা সঙ্ঘের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। মঃআঃরঃসঃ-ও পূর্ণ উদ্যমে ঐ কাজে লেগে গেল।

কলকাতার মঃআঃরঃসঃ নারী সেবা সঙ্ঘের জন্য ১৯৪৪-এর ২৬শে জুন একটি পতাকা দিবসের আয়োজন করে। কর্মীরা কলকাতার ট্রামে, বাসে, রাস্তায়, বস্তিতে ঘুরে ঘুরে ২০০০্ সংগ্রহ করে। মঃআঃরঃসঃ-ও একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে পুনর্বাসন কাজের জন্য ১৫০০্ সংগ্রহ করে। ইতিমধ্যে জেলাগুলোতে প্রায় ২০টি আশ্রম খোলা হয়েছে।

কাজ চলতে লাগল খুব ছোট আয়তনেই—এর বেশী সাধ্য নেই। নোয়াখালি জেলার গাবুয়া গ্রামে ১০টি মেয়েকে নিয়ে একটি ছোট্ট আশ্রম স্থাপিত হয় ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালে। বরিশালের ভোলায় ও মেদিনীপুরের তমলুকেও অনুরূপ আশ্রম স্থাপিত হয়। হাওড়ার সরকার পরিচালিত লিলুয়া আশ্রমের অবস্থা তখন খুব খারাপ। নারী সেবা সংঘ এটিরও উন্নতি করতে চেষ্টা করে।

১৯৪৪ সনের শেষের দিকে নারী-সেবা সংঘ তাদের কমিটির ১৯টি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আরেকটি আশ্রম খোলে লেক রোডে। এই আশ্রমের সম্পাদিকা হন কলকাতা মঃআঃরঃসঃ-র সম্পাদিকা। ২৪ পরগণার বনহরিশপুর ও বিশালাক্ষীপুর গ্রামে দুটি আশ্রম খোলা হয়। এর সঙ্গে কর্মকেন্দ্রও যুক্ত ছিল। এ ছাড়াও ২৪ পরগণার ফলতা, জয়নগর ও বসিরহাটে আশ্রম পরিচালনা করছিলেন উইমেন্স ফুড কমিটি, মঃআঃরঃসঃ-ও ফ্রেণ্ডস অ্যামবুলেন্স ইউনিট।

কিন্তু আশ্রম চালানই যথেষ্ট নয়। আকাল ও দুর্গতির সুযোগ নিয়ে নারীমাংস ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত তৎপর ছিল। তাদের হিংস্র থাবা থেকে মেয়েদের রক্ষা করা ছিল এক বড় কাজ।

দুর্ভিক্ষের অবস্থায় মেয়েদের ফুসলিয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে ঠেলে দেওয়ার বিরুদ্ধে উপায় স্থির করার জন্য ১৯৪৫ সনের ৬ই জানুয়ারী মঃআঃরঃসঃ, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, নারী সেবা সংঘ, ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশন এবং আরো দশটি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত একটি সভা হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তরুণদের আহ্বান করে বলেন: "সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাড়ীর মেয়েদের পবিত্রতার প্রতিমা বলে দেখি।

কিন্তু অন্য কোন মেয়ের সেই পবিত্রতা যদি ধূলোয় লুটোয় আমাদের কখনও মনে হয় না যে সে মেয়ে এবং আমার বাড়ীর মেয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যতক্ষণ একটি মেয়েরও পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে, যতক্ষণ একটি মেয়েও পুরুষের লালসার কুক্ষিগত হচ্ছে, যতক্ষণ অধিকতর শক্তিমান পুরুষের লালসার পঞ্জর কবলিত হচ্ছে শয়ে শয়ে অসহায় নারী, ততক্ষণ কোন মেয়ের ইজ্জত নিরাপদ নয়।

এই সব পাপাচারকে নির্মূল করার দায়িত্ব তোমাদের। জাতীয় গৌরবের ছিঁটে ফোঁটা বোধও যদি তোমাদের মধ্যে থেকে থাকে তবে নারীর সম্মান রক্ষায় উঠে পড়ে লাগ। হয়ত এ মেয়েদের তোমরা চেননা, কিন্তু নাই বা চিনলে; তবু সে তোমারই বোন। এই বাংলায়ই জন্মেছে সে, বাংলার জলে মাটিতে বেড়েছে সে তোমার বোন বই কি। তার ইজ্জত রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাক। এই পবিত্র দায়িত্বই আজ তোমাদের আমি সঁপে দিলাম।" শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু অতি উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্না; কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে তাকে উদার প্রশস্ত জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে; এবং সেই অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রশ্ন নিয়ে তিনি জনগণের ঐক্যের ওপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন এবং বাংলা কংগ্রেসের শ্রী কিরণ শংকর রায়কে তাঁর বিভেদমূলক কাজের জন্য যথোচিত ভৎর্সনা করেন। আমাদের সভার অল্প আগেই শ্রীরায় হাওড়ায় একটি সভা করেন: তাতে কম্যুনিস্ট ও মুসলীম লীগের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করাকে নিষিদ্ধ করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

করালতম দুর্ভিক্ষে বাংলা যখন বিধ্বস্ত, এবং বিদেশী সরকার জাতীয় নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরল, শ্রীযুক্তা নাইডু তখন তাঁর গভীর রাজনৈতিক বোধ দিয়ে ত্রাণকার্য চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব ভালো করে বুঝেছিলেন। তাই তিনি সবাইকে আহ্বান করে বলতে পেরেছেন: জনগণের সঙ্গে থাক। যারা প্রাণ দিয়ে জনগণের সেবা করে তারাই তাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং আস্থা অর্জন করে, যাও কাজে লাগো। সরকারী সাহায্য নাও, কিন্তু দাসখৎ লিখে নয়; জন-যোদ্ধাদের প্রতিনিধি হয়ে। ত্রাণ-কার্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য তিনি সকলকে বুঝিয়ে দেন। তাঁর এই রাজনৈতিক বোধের সঠিক মূল্যায়ন করতে অতি-বামেরা আজও সমর্থ হয় নি।

এইবার তিনি আসেন ১৯৪৪-এর শেষের দিকে। এই সময়ে তিনি

মঃ আঃ রঃ সঃ পরিচালিত বউবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত কাগজ তৈরীর কেন্দ্রটিতে যান। সমবেত নর-নারীরা তাঁকে স্বাগত জানায়। তাঁর শরীর তেমন ভালো না থাকলেও তিনি চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখেন। ক্লান্ত হয়ে পড়লেন একটু পরেই। কিন্তু যখন শুনলেন, তৈরী জিনিস রয়েছে ওপরে, কিছু মাত্র না দমে গট গট করে ভারী পায়ে উঠে গেলেন ওপরে। তাঁর অভিমত তিনি লিখলেন: "মেয়েরা এত নিপুণভাবে কাজ করছে দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আরো মেয়েদের কাজের সুযোগ দেবার জন্য কেন্দ্রটিকে বাড়াতে পারলে খুব ভালো হয়। মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হতে শিখে যাবে আত্ম মর্যাদাশীল হতে পারে, সেজন্য তাদের হাতে কলমে কাজ শেখানর এই যে চেষ্টা করা হচ্ছে, আমি তাতে মুগ্ধ।"

নারী সেবা সঙ্ঘের শিল্পকলার একটি প্রদর্শনী হচ্ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ। উক্ত সঙ্ঘের সবকটি আশ্রমে কুটির-শিল্প উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এইসব কেন্দ্রের তৈরী জিনিসই প্রদর্শিত হয়েছিল প্রদর্শনীতে। এক ২৪ পরগণা থেকেই আসে ২০০০০টি কাজ। ২৪ পরগণার অন্তর্গত ছিল নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, বেঙ্গল ফুড্ কমিটি, কলকাতা রিলিফ কমিটি, ফ্রেণ্ডস অ্যামবুল্যান্স ইউনিট, এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। ময়মনসিংহ আত্মরক্ষা সমিতি থেকে হাজং উপজাতি মহিলাদের তাঁতের জিনিস, মেদিনীপুর থেকে আসে নানারকম চামড়ার ব্যাগ, পশমের জিনিস, ইত্যাদি সারা বাংলা থেকেই আসে জিনিস। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ১৯৪৪-এর ২৮শে ডিসেম্বর প্রদর্শনীটির উদ্ঘাটন করেন। শ্রীযুক্ত নেলি সেনগুপ্ত, মোহিনী দেবী, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ সহ প্রায় ৫০০০ দর্শক আসেন। সভানেত্রী তাঁর ভাষণে বলেন: "নারী সেবা সঙ্ঘের এই কাজ মানুষকে এমন প্রেরণা জুগিয়েছে যে, আমার মনে হচ্ছে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে।...বাংলার যন্ত্রণা সাড়া জাগছে বিশ্বজনের বুকে। আমরা শুনেছি মেয়েরা এক মুঠো অন্নের জন্য দেহ বেচেছে, বুভুক্ষার অসহায়তায় সন্তানকে পথে ফেলে রেখে চলে গেছে বাপ মা, মধ্যরাত্রির কালোর মধ্যে মেয়েরা কোথায় উধাও হয়ে গেছে বিচিত্র যাদুতে; কালোবাজারে বিক্রী হয়েছে শিশু। আমরা শুনেছি—ভারে ভারে খাদ্য এসেছে রেল গাড়ীতে কিন্তু ক্ষুধার্ত মুখ পর্যন্ত তা পৌঁছায়নি।

কিন্তু এই কালো মেঘেও রজত আলোর যে সূক্ষ্ম রেখা দেখা যাচ্ছে তা

বাংলার নারীত্বের গোপন উৎস হতে উচ্ছৃত ঐশী আলোর রেখা। এরা কাল বিলম্ব না করে বিপদ পাতের সঙ্গে সঙ্গে এক সেবাব্রতী ভগিনী সম্প্রদায় গড়ে তুললেন—দুর্ভাগ্যের মার-খাওয়া এবং দুর্ভিক্ষ ও দুর্বিপাকের বিশ্বাসঘাতকতায় বিধ্বস্ত মানুষের সেবার জন্য। এদের বুকে যে বিপুল মমতার আলোড়ন জেগেছিল—তারই ছোট প্রথম ফলটুকু আজ আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বাস্তব যন্ত্রণার সামনে মানুষে মানুষে লড়াই, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়াই বড়ই অবাস্তব। সম্প্রদায়ের চেয়ে মানবতা বড়। বৃহৎ জনতার এই দুঃখ-ভোগে বিশাল বাংলার বিভিন্নতাগুলি মানবিক আর মরমী সহযোগিতার সূত্রে এক হয়ে গাঁথা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতেও যখন দেশের আরও বড় আরো গভীর আরো তীব্র সমস্যা দেখা দেবে বাংলার সব জাতির সব মতের মেয়েরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য এক জোট হয়ে এসে দাঁড়াবে যেমন করে আজ তারা দাঁড়িয়েছে আর্ত-মানুষের পাশে তাদের কল্যাণ-হস্ত বাড়িয়ে দিয়ে।

বঙ্গ দেশ প্রমাণ করে দিল দলীয়তার চেয়ে মানবতা বড়। আর একবার সে নেতৃত্ব দিক জাতিকে—শুধু ক্ষুধা মুক্তির জন্য নয় নৈতিক বিপদ হতে, রাজ নৈতিক দুষ্ট-ব্যাধি হতে মুক্তির জন্য যাতে জাতি ঐক্যবদ্ধ এক মানবতার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

অতি প্রজ্ঞার বাণী। এবং এ বাণী যদি গ্রহণ করা হত তবে দেশের ইতিহাস বদলে যেত। শ্রীমতী নাইডু এক বিরাট সত্তা—চোখে সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন, বুকে গভীর মানবিকতা যার কাছে বাক্-মন আর কর্মের সমস্ত ক্ষুদ্রতা আর সংকীর্ণতা হার মেনে মাথা নত করে।

অনেকেই অবাক হয়েছেন, হবারই কথা—কোথায় এমন শক্তি পেল কর্মী মেয়েরা, যার বলে এরা পরিবার পরিত্যক্ত হয়ে, বিরোধীদের নিন্দা-গঞ্জনা সয়ে, আর্থিক দুর্গতি ভোগ করেও মঃ আঃ রঃ সঃ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে—যা জন্ম লাভ করেছে এদেরই প্রেরণায়—গড়ে তোলার জন্য এমন করে নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারল। আমাদের দেশের মেয়েরাই সব চেয়ে বেশী পিছিয়ে আছে, তাদের দম প্রায় বন্ধ সামন্ততান্ত্রিক বিধি-নিষেধে। এহেন মেয়েদের কত বোঝাতে হয়েছে—বোঝাতে হয়েছে আন্দোলনের কি, কেন সব। এই সব মেয়েদের মধ্য থেকেই জনগণের সেবার জন্য কর্মী তৈরী করার উদ্দেশ্যে

প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ও চালিয়েছে কমিউনিস্ট মেয়েরা। ম:আ:র:স:' সংগঠনের প্রথম ধাপের পরে পরেই ১৯৪৩-এর ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় একটি রাজ্য শিক্ষণ কেন্দ্র চালান হয় কমিউনিস্ট কর্মীদের জন্য। কলকাতা, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, পাবনা, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, হুগলি, নদীয়া, এইসব জায়গা হতে ২৮জন মেয়ে আসেন শিক্ষণ গ্রহণ করতে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল, এই প্রশিক্ষণ কেন তার ব্যাখ্যা, যুদ্ধ ফ্রন্টের অবস্থা, ফ্যাসি-যুদ্ধের প্রতি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি ; ভারতের জাতীয় সঙ্কট এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, নারী আন্দোলনের দৃষ্টি-কোণ, মহিলা ফ্রন্টের সঙ্গে ছাত্র ফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্ট ইত্যাদির সম্পর্ক, ছাত্র এবং ছাত্রী আন্দোলন।

শিক্ষা-শিবিরের আবহাওয়াটি ছিল চমৎকার। বাঙলার কমিউনিস্ট কর্মী মেয়েদের জন্য এইটিই ছিল প্রথম রাজ্য স্তরে শিক্ষণ শিবির। সারা বাঙলায় ম:আ:র:স:-র সভ্য সংখ্যা ছিল ৫০০০—তার মধ্যে কমিউনিস্ট ১৪০-এর বেশী নয়। অত বড় আন্দোলন অত দায়িত্ব তার পক্ষে এ সংখ্যা কিছুই নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের কর্মী মেয়েরা সচেতন ছিল। তাই তারা শপথ নিল যে দু' মাসের মধ্যে কমিউনিস্ট মেয়ে কর্মীর সংখ্যা পাঁচগুণ বাড়াবে তারা।

এত উৎসাহের সৃষ্টি হল এই শিক্ষণ-কেন্দ্রটিতে যে শারীরিক আরাম শূন্যের কোঠায় হলেও পোড়োদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। প্রথম দলের এই মেয়েরা এই উৎসাহেই মত্ত হয়ে রইল, যে তারা ফিরে যাবে নিজের নিজের জেলায়, সেখানকার কর্মী মেয়েদের শেখাবে—প্রতিষ্ঠানকে কি করে বাড়াতে হয়, কি করে তাকে আরো ক্রিয়াশীল করতে হয়।

১৯৪৩-এর ৭ই জুলাই সুদূর সিলেটে আর একটি শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা হয়। ওটা আসাম রাজ্য হলেও এলাকাটা ছিল বাংলা-ভাষী, তাই বাংলার ম:আ:র:স: সাহায্য করে সেখানকার মহিলা সমিতিটি গড়ে তুলতে। এখানে শিখতে আসে ১১টি মেয়ে। এই মেয়েদের মধ্যে জনকয় ছিল জেলার নেত্রী, এরা ঘুরে বেড়াত জেলাময়। একজন ছিল কৃষক মহিলা নেত্রী ; একজন ছিল স্থানীয় কনিউনিস্ট পার্টির কমিটির সভ্য। ছিল বাল-বিধবা শশীদিদি, গ্রামের মেয়ে গায়ত্রী ; ছিল তিনটি ছাত্রী মণি, মায়া আর অপর্ণা, এরা স্কুল বা কলেজ শেষ করেই মহিলা আন্দোলনে যোগ দেয়। অপর্ণা ছিল কলেজের

মেয়ে, পাথরকান্দির কৃষক মেয়েদের নেত্রী। ১০ দিনের শিবির। শেখানর বিষয় অনেক—সেচ্ছা-সেবিকা শিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, রাজনৈতিক বিষয়—এর মধ্যে ছিল, নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য; হাতের কাজ শেখান, স্কোয়াড, সংগঠন, সাংস্কৃতিক আলোচনা ইত্যাদি। তারপর ছিল নাচ, গান, দিনপঞ্জী রাখা, চিঠি-পত্র লেখা, কাজ সম্বন্ধে আত্ম-সমীক্ষা ও আত্ম-সমালোচনা—এই সব। যে সব নাচ গান দেশ-রক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে মহিলাদের প্রেরণা জোগাবে, সেই রকম লোক-নৃত্য ও লোক সঙ্গীত গ্রামের মেয়েরা তাদের শেখাত। এসব গ্রামের সুরেই বাঁধা। তারপর আছে হাতের কাজ শেখা, সূতো কাটা, সাবান তৈরী, কাপড়ের পাড় দিয়ে গামছা বোনা, লেফাফা তৈরী ইত্যাদি। এতেই কি কম উৎসাহ? স্কোয়াড গড়া আর প্রচারের কাজ শেখান হত হাতে কলমে।

১৯৪৩-এর ১৬ই—১৯শে জুলাই হুগলি জেলায়ও অমনি একটি স্কুল হয়। এই প্রথম এ ধরণের স্কুল। হুগলি, চন্দননগর, সিঙ্গুর প্রভৃতি জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা আসেন। ক্লাস হত দশ ঘণ্টা। রাতে হত দিনের কাজের আলোচনা, সমালোচনা, ভুল সংশোধন ইত্যাদি। একি কম বড় কথা—যারা এ পর্যন্ত স্বামী সন্তান, আর পরিবার পরিজনের সেবায়-চর্যায় জীবন কাটিয়ে এল, তারা নিচ্ছে এখন দেশের সেবার দেশের রক্ষার রাজনৈতিক পাঠ!

যতগুলি শিক্ষণ-শিবির খোলা হয় তার মধ্যে সব চেয়ে ভালো হল, নারী সেবা সঙ্ঘ যেটা খুললেন এবং চালালেন। এদের কাজ-কর্ম ছিল অত্যন্ত উঁচু স্তরের। এই শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মেয়েদের পুনর্বাসন কি করে করতে হবে তা শেখান। নানা জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ত্রিশ জন মহিলা আসেন এই শিবিরে। রাজশাহী থেকে আসেন অনুপমা বাগচী। তিনি তাঁর এই শিক্ষণ শিবিরের অভিজ্ঞতার কথা বলেন:

"প্রায় সব জেলা থেকেই প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে মহিলারা এসেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন পাবনার কর্ম-কেন্দ্রের শিশির সেন; জয়নগর আশ্রমের সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, চট্টগ্রাম নারী সমিতির মণিকুন্তলা চৌধুরী, হুগলি কর্ম-কেন্দ্রের কল্যাণী গুহ, মালদহ কর্ম-কেন্দ্রের ভবানী গুহ এবং আরো অনেক কর্মী। নারী সেবা সংঘের প্রশিক্ষণ শিবিরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুন্সীগঞ্জ মঃআঃরঃসঃ-র সহ-সভানেত্রী অশ্রুকণা দাস।

"আমাদের শিক্ষাক্রম ছিল চার মাসের। শুধু যে বক্তৃতা শুনে বা বই পড়েই আমরা শিখতাম তা নয়। হাতের কাজ, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় হাতে কলমে শিখতাম। এ ছাড়াও কলকাতা ও আশে পাশের কেন্দ্রগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতাম। এক মাসের একটি নিবিড় শিক্ষণও দেওয়া হয় গ্রামীণ তথ্য কি ভাবে নিতে হয় সে বিষয়ে।

"তাত্ত্বিক ভাবে আমাদের শিখতে হয় (১) কি করে আশ্রম এবং কর্ম-কেন্দ্র চালাতে হয়, (২) গ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তার সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সহযোগিতা-মূলক সংগঠন, (৩) গ্রামীণ জীবনের পুনর্গঠন, এবং নিরাশ্রয়ের ত্রাণ, তাদের মনোবৃত্তি বোঝা (৪) ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য, (৫) বয়স্ক শিক্ষণ।

"আমাদের ক্লাস নিয়েছেন অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, অধ্যাপক কে, পি, চট্টোপাধ্যায়, শ্রী গোপাল হালদার, শ্রী অমূল্য উকিল, শ্রীমতী কনক দাস, শ্রীঅনাথ নাথ বসু, শ্রীহীরেন সান্যাল, শ্রীবিলাস মুখার্জি, শ্রীতারক দাস ইত্যাদির মত বড় বড় বিদ্বানদের সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্যও হয়েছে আমাদের। কত যে শিখেছি এঁদের কাছ থেকে।

"চরকায় সুতো কাটা, দরজির কাজ, নানা রকম সূচের কাজ, বেতের কাজ, হাতে তৈরী কাগজ—এ সব শিখি হাতে কলমে। লেডি ডাফরিন হাসপাতাল ও আলিপুর ক্লিনিকও দেখতে যাই, এসব দেখেও অনেক শিখি।

"তেমনি আবার ৫৩ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের সরকারী শিশু-কেন্দ্রটি দেখে বড় দুঃখ হল। তিন চারটি বাচ্চাকে দেখলাম পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম এরা বুঝি অপরাধ প্রবণ; কিন্তু দেখি যেই শিক্ষয়িত্রী চলে গেলেন, ওরা হি হি করে হাসতে লাগল।"

অপুষ্টিতে শিশুরাই ভোগে সবচেয়ে বেশী। শয়ে শয়ে মরেছে তারা। সুতরাং মঃআঃরঃসঃ ফুড্ ক্যান্টিনের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের দুধের জন্যও লড়াই করতে লাগল। সর্বত্র মঃআঃরঃসঃ বা ফুড কমিটির উদ্যোগে মহিলাদের সভা হয়—মহিলারা শিশুদের দুধের জন্য দাবী করেন।

১৯৪৫-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী, দিনাজপুর মঃআঃরঃসঃ মহিলাদের একটি শোভাযাত্রা সংগঠন করে। শহরের রাস্তা দিয়ে শিশু কোলে নিয়ে মিছিল করে হেঁটে যায়। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, দলমতনির্বিশেষে মহিলারা এসে শোভাযাত্রায় যোগদান করে। নেত্রীদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণা স্নেহলতা

গাঙ্গুলী,' এবং হেমন্তবালা সেন। তাঁরা মিছিল করে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে একটি দুধের ক্যান্টিন এবং একটি দুধের সমবায় বিক্রয় কেন্দ্র খোলার দাবী জানান, যেখান থেকে নিয়মিত ভাবে দুধের সরবরাহ পাওয়া যাবে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিনিধিদের একটি সভা করে, এই ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

এই সময়ে সংকট অত্যন্ত তীব্র হয়। অত্যাবশ্যকীয় জিনিস সব উধাও হয় বাজার থেকে। বস্ত্র সংকটও চরমে ওঠে। খাদ্য-বস্ত্র বণ্টনে সীমাহীন দুর্নীতি। সব কিছু কালোবাজারীদের হাতে চলে যায়।

সংকট এত ভয়াবহ রকম তীব্র হয় যে ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে মআরসর বরিশাল জেলা সম্মেলনের সময় ৫৫টি প্রাইমারী কমিটির মধ্যে কেবল ১২টি কমিটির প্রতিনিধি আসেন। অন্যেরা জানান যে কাপড় নেই বলে তাঁদের পক্ষে আসা সম্ভব নয়, যদিও সম্মেলনে কি হয় না হয় জানতে তাঁরা উদগ্রীব।

১৯৪৫-এর ২১শে অগাষ্ট মঃআঃরঃসঃ কাপড়ের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। দাবী করা হয় দুর্গতদের বিনামূল্যে বস্ত্র দান এবং অন্যদের সস্তা দরে কাপড় পাওয়ার ব্যবস্থা; ঈদ্ ও পূজার আগে মাথা পিছু ১৫ গজ কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা। এই দাবীর ওপর আন্দোলন। বহু মেয়েরাই পরে সভায় আসবার জন্য একখানা কাপড়ও জোটাতে পারে না। তবু ৩.৩০ টার সময় দেখা গেল ৫/৬ মাইল হেঁটে "পরবার কাপড় দিতে হবে—লজ্জা মোদের ঢাকতে হবে" আওয়াজ তুলে বরিশাল অশ্বিনী কুমার হলের দিকে আসছে গ্রামের মেয়েরা।

অ্যাডিশনাল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এঁদের সামনে এসে আশ্বাস দেন: "দুই খেপে ২৫০ গাঁট কাপড় এসেছে। এগুলি সবই যাতে যত শিগ্‌গির সম্ভব বণ্টন করা হয় তা আমি দেখব। কিন্তু বিনামূল্যে দানের ব্যবস্থা তো করা যাবে না।"

এই সামান্য আশ্বাসটুকুই মেয়েদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেই উদ্দীপনা নিয়ে তারা ফিরে আসে টাউনহলের সভায়। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস। মহিলারা শপথ নেন সংগঠনকে আরো জোরদার করবেন।

১৯৪৫ সনে ফ্যাসিস্টরা হেরে যায়। স্তালিনগ্রাদে লাল সেনা তাদের ওপর

মারাত্মক আঘাত হানে। মধ্যপ্রাচ্যে এবং এশিয়া মহাদেশে তাদের অগ্রগতি থেমে যায়। ভারতও বেঁচে যায়। অবশেষে জয় হয় লাখো মানুষের, যারা জবাই হয় যুদ্ধে আর কন্‌সেন্‌ট্রেশান ক্যাম্পে—জয় হয় লাল সেনা আর গেরিলাদের অমিতবীর্য ও সাহসের; জয় হল সোভিয়েট পার্টিজান ও তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের—যারা জীবনকে মরণের হাতে তুলে দিয়ে পেছনের সারিতে লড়েছে—জয় হয় সমগ্র জনগণের। সোভিয়েট জনগণের কাছে এই যুদ্ধ দেশাত্মবোধক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শুধু রাশিয়াই যে নাৎসী বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তা নয়, জঘন্যতম সাম্রাজ্যবাদী এই ফ্যাসিবাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে আফ্রিকা আর এশিয়াও। এই সময়েই অর্থাৎ দ্বিতীয় সম্মেলনের প্রায় দেড় বৎসর পরে, ১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে, কলকাতায় মঃআঃরঃসঃ-র তৃতীয় সম্মেলন হয়। এই দেড়টি বছর গেছে প্রচণ্ড কাজে। এবং এই কাজের মধ্য দিয়েই সমিতি সর্ব স্তরের মেয়েদের কাছ থেকে পেয়েছে প্রীতি, স্বীকৃতি এবং শ্রদ্ধা।

মঃ আঃরঃসঃ-র এই তৃতীয় সম্মেলনে সভানেত্রী হিসাবে পেলাম, সুপরিচিত কংগ্রেস নেত্রী, নির্ভীক, তেজস্বিনী শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলিকে। বাংলার ১৪টি জেলার প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক মিলিয়ে ৫ জন আসেন। আসেন দার্জিলিং পাহাড় থেকেও। বছর খানেক আগে, ১৯৪৪ সনের ২৩শে অক্টোবর দার্জিলিং-এ জেলা সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে দার্জিলিং-এর চা-শ্রমিক মেয়েদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়, এবং দাবী করা হয় এদের জন্য মাতৃত্বের ছ মাসের ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা; শ্রমিকরা যে সব পাহাড়ী বস্তিতে থাকে তার প্রত্যেকটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবং রেশনের ব্যবস্থার। শুধু দার্জিলিং পাহাড় থেকেই নয়, সুদূর গারোপাহাড় থেকে, সুশং থেকে হাজং মেয়েরাও এসেছে। এসেছে বজবজের শ্রমিক নেত্রী আতর বালা, রাজশাহী থেকে এক ৬৪ বছরের মা, আন্দুল থেকে অচ্ছুৎ মেথর মেয়ে অলংনা, ডোমজুড়ের সর্বজনীন মা, মেদিনীপুরের কৃষক নেত্রী বিমলা মণ্ডল, এই সেদিনও যারা কংগ্রেসের কর্মী ছিল সেই সুশীলা মিত্র আর জ্যোতি দেবী, বর্ধমানের এক জমিদার পরিবারের সুনীতা মুখার্জিও এসেছেন। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী সভানেত্রীর চেয়ারখানা শুধু অলংকৃত করেনি—প্রতিদিনের প্রতি অধিবেশনে এসেছেন, আলোচনা, বক্তৃতা, কাজ কর্মের রিপোর্ট, সব মন দিয়ে শুনেছেন।

জেলার প্রতিনিধিরা তাদের কাজের বিবরণ—তাদের সাফল্য—প্রতিবন্ধকদের বিবরণ দেয়।

১৯৪৫-এর ১৮ই নভেম্বর সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন। সময়টায় যেন সংকটের সঙ্কেত। কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের অনেকেই চালাচ্ছিলেন কমিউনিস্ট বিরোধী জেহাদ। কলকাতার রাজনৈতিক আকাশ পারস্পরিক সন্দেহ আর ঘৃণার মেঘে মেদুর। সর্বত্র বিভেদ আর বাধা সৃষ্টির কথা। সমিতির বহুকর্মী কলকাতায় সম্মেলন হওয়ায় মুষড়ে পড়েছেন—কলকাতাকে তাদের ভয়। ভয়, ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিট্যুটের হল বুঝি খালিই থাকে। কিন্তু না—৪টে বাজার আগেই এসে গেলেন ৮০০ মহিলা। হল একেবারে ভরে গেল।

প্রস্তাব পেশ হতে লাগল একে একে। প্রথমে—প্রখ্যাতা মুক্তি সংগ্রামী সরলা দেবী চৌধুরাণী ও দিল্লীর সত্যবতী দেবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। তারপর ইন্দোনেশিয়াকে তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন দেওয়া। তারপর আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বন্দীদের মুক্তির দাবী। এ ছাড়াও ছিল—মেয়েদের যা প্রত্যক্ষ সমস্যা—সমাজ জীবনে তাদের পুনর্বাসন, খাদ্য· বস্ত্র, মধ্যবিত্ত মেয়েদের বেকারী, পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার, ইত্যাদি সম্বন্ধেও প্রস্তাব পাশ হয় এবং গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী অধিবেশনে বলেন: "অনেকেই এই সমিতিকে কমিউনিস্ট পার্টির শাখা বলে মনে করেন। কিন্তু কেউই সমিতিকে নিজেদের পকেটে পুরে রাখতে চায় না। এখানে অনেক নাম-করা কমিউনিস্ট মহিলা আছেন। তাঁরা চান সর্ব দলের সর্ব মতের মেয়েরা এসে যোগ দিয়ে একে জোরদার করুন।" তিনি মঃআঃরঃসঃ-র নেত্রী কমলা মুখার্জীকে লেখেন, "তুমি আমাকে এই সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করতে লিখেছ। এতেই স্পষ্ট প্রমাণ যে তোমরা সমিতিটিকে একটি দলেরই সংগঠন করে রাখতে চাও না।" মঃআঃরঃসঃ-র সঙ্গে শ্রীযুক্তা গাঙ্গুলির সংযোগ অতি স্বল্পকালীন। এই স্বল্পকালের মধ্যেই আমরা অনেক শিক্ষা পাই তাঁর চারিত্রিক আদর্শ থেকে—তাঁর সংকল্পের প্রচণ্ড দৃঢ়তা থেকে, সুশৃঙ্খল কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া আর তাঁর দায়িত্ব-বোধ থেকে। চিরকাল বুকের মধ্যে ধরে রাখার জিনিস এসব। প্রতিদিন একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে আসতেন। প্রতিনিধিদের দেরী হলে বলতেন "সময়ের মূল্য বোঝ—বড় বড় লড়াই করবে কি করে।" তাঁর ভাষণে তিনি গ্রাম এলাকায় সমিতি গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়ে বলেন, "যাও গ্রামে যাও, গিয়ে ওদের দুঃখ দূর কর।" প্রতিনিধিরা ওঁর কথা মনে রাখেন এবং সেই মত কাজ করার সংকল্প নেন।

নূতন কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়। শ্রীমতী গাঙ্গুলী তার পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন। কিন্তু এর কদিন পরেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয়। সভানেত্রী হন রাণী মহলানবিশ, সহ-সভানেত্রী নলিনী বসু এবং অমিয়া দেবী; সম্পাদিকা এলা রীড, কোষাধ্যক্ষা গীতা মল্লিক এবং সহ-সম্পাদিকা হন জুঁইফুল রায়। এঁদের ছাড়া আরো ১১ জন সভ্যা এই সমিতিতে নির্বাচিত হন।

সম্মেলনের ফলে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কে জানত তখন দুদিন পরেই শ্রীযুক্তা গাঙ্গুলি চলে যাবেন অমন প্রচণ্ড একটি আঘাত দিয়ে।

কম্যুনিস্ট মেয়েরা কাজ আরম্ভ করতেই বিশেষ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। সোস্যালিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং হিন্দু মহাসভার সভ্যেরা তাদের বিরুদ্ধে কুৎসিত রটনা করে জোর এবং তীব্র প্রচার চালায়। নোংরা কাহিনী রটায় কম্যুনিস্ট মেয়েদের নামে।

১৯৪৪-এর এপ্রিলের কাছাকাছি সময়ে মঃআঃরঃসঃ-র সংগঠন আরো বেড়ে যায়। কম্যুনিস্ট-বিরোধীরা কম্যুনিস্ট মেয়েদের কুৎসা রটিয়ে এই অগ্রগতিতে বাধা দিতে প্রাণপাত করে। উত্তরবঙ্গের রাজশাহীতে জঘন্য নোংরা ভাষায় কম্যুনিস্ট মেয়েদের নামে কাদা ছিটিয়ে পুস্তিকা প্রচার করে। কম্যুনিস্ট মেয়েদের কারো কারো ওপর ব্যক্তিগতভাবেও জঘন্য আক্রমণ করা হয়। মঃআঃরঃসঃ-র জেলা সম্মেলন হয় ১৯৪৪-এর এপ্রিল মাসে। ৮ এবং ৯ই এপ্রিল প্রকাশ্য অধিবেশন। এই সব কম্যুনিস্ট-বিরোধীরা এতদূর যায় যে তারা ২০০ মহিলাকে ঘিরে রাখে। আসতে দেয় না সম্মেলনে। এই প্রতিবন্ধক এবং উস্কানীর মধ্যেও আসে ৬০০ মেয়ে—হল ভরে, পূর্ণ সম্মেলন হয়।

১৯৪৪-এর ৬ই এবং ৭ই এপ্রিল জলপাইগুড়ির মেয়েদের সম্মেলনের আয়োজন হয় আর্য নাট্য মন্দিরে। বিরোধীরা আগে থেকেই বহু নিন্দা অপবাদের জোর রটনা করে। মেয়েদের 'সভায় আসার ঘোর বাধা হয়। বাড়ীতে রাগ সইতে হয়, অনেক সময় বাপ মায়ের অবাধ্য হতে হয়—কিন্তু সমিতির ডাক এই সব বাধা বিপত্তির চাইতে অনেক বড়। তাই সম্মেলনে আসে মেয়েরা।

চট্টগ্রাম নারী সমিতির সম্মেলনে ৫০—৬০ মাইল হেঁটে আসেন মহিলা প্রতিনিধিরা। প্রায় ২৫০০ মহিলার সমাবেশ হয় এই সম্মেলনে। তৎকালে

এতবড় মহিলা সম্মেলন কোথাও হয়নি। কিন্তু বিনা বাধা হয়নি সম্মেলন। সম্মেলন চলা-কালীন কম্যুনিস্ট শিকারীরা সভায় ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির স্বেচ্ছাসেবিকারা কড়া পাহারায় এ গুণ্ডাবাজী থামিয়ে রাখে।

এ উগ্র কম্যুনিস্ট-বিরোধিতার কারণটি কি? আমরা ৪২-এর আন্দোলনে যোগ দিইনি। বিশ্ব-ব্যাপী ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধ যখন চলছে তখন ও আন্দোলনে যোগ দিতে আমরা চাইনি। তাই অনেকের বিশ্বাস হল আমরা দেশের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এই দলই ভুল বুঝে কম্যুনিস্ট বিরোধিতার নামে ও জঘন্য কুৎসার বাঁধ-ভাঙা বেনো জল বইয়েদিল আমাদের ওপর। কিন্তু স্থির অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কম্যুনিস্টরা। বিশ্ব-যুদ্ধের সময়কার দারুণ যন্ত্রণার দিনে হতভাগা মানুষগুলোকে যে-টুকু সেবা ওরা দিতে পেরেছিল তাই ওদের চেতনা জুড়ে রইল। এই কম্যুনিস্ট-বিরোধী তাণ্ডবের শিকার হতে হয়েছে কম্যুনিস্ট মেয়েদেরও। আক্রমণ থেকে তারাও বাদ পড়েনি।

এই আক্রমণ এমন জঘন্যতায় পেঁছায় যে মঃআঃরঃসঃ-র তৎকালীন সভানেত্রী শ্রীমতী রাণী মহলানবিশ মঃআঃরঃসঃ-কে কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান বলে মিথ্যে আখ্যা দিয়ে তার কর্মীদের ওপর ওই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। তিনি ১৯৪৬-এর ৬ই জানুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। রাণী মহলানবিশ তৎকালীন বাংলার একটি শ্রদ্ধেয় নাম। তিনি বিখ্যাত পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী শ্রীপ্রশান্ত মহলানাবিশের পত্নী। বিবৃতিতে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে মঃআঃরঃসঃ-র সভ্যসংখ্যা ৫০,০০০। তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এক সাধারণ সেবাকর্মের ভিত্তিতে সর্বস্তরের মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করা। সুতরাং এই মহিলাদের মধ্যে কংগ্রেসী, কম্যুনিস্ট এবং ওঁর নিজের মত নির্দলীয় মানুষও থাকবেই। কিন্তু কাপুরুষ-সুলভ আক্রমণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী মেয়েদের ওপর। বৌবাজারে গরীব শিশুদের জন্য সমিতির একটা স্কুল ছিল। এক দল যুবক গান্ধী টুপী পরে কংগ্রেসী পতাকা উড়িয়ে সেই স্কুলের কর্মীদের ওপর হামলা করে। তারা চেঁচাতে থাকে "এই এলাকায় কোন কম্যুনিস্টকে থাকতে বা কাজ করতে দেবনা।" এত উৎপাত তারা করে যে সে দিন স্কুলটা বন্ধ করে দিতে হয়। পরের দিনও ঠিক তাই হয়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তখন শহরে ছিলেন। তিনি মৌলানা আবুল

কালাম আজাদকে ফোন করেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মেয়েদের একটা সভার আয়োজন করেন।

মৌলানা আজাদ সহানুভূতির সঙ্গে সব শোনেন। তিনি বলেন, এই মহিলারা যা কাজকর্ম করছেন, বাংলার মানুষ যদি স্বাধীনভাবে এসব কাজকর্ম চলাফেরা করতে না পারেন তবে এখানকার জীবন অসম্ভব হবে। তিনি রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, শ্রী কালিপদ মুখার্জিকে ঘটনাটার অনুসন্ধান করতে বলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়নি। এর কয়েক দিন পরে আরো জঘন্য একটা ঘটনা ঘটে। শ্রীকালিপদ মুখার্জি আসবেন। সমিতির কয়েকজন কর্মী স্কুলে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তাঁর আসার আগে একদল দুষ্কৃতকারী এসে হামলা চেঁচামেচি করে, মেয়েদের ভয় দেখায়, গাল দেয়। একজন নির্লজ্জের মত একটি মেয়েকে মেরেই বসল।

কিন্তু এই সব অমর্যাদাকর আক্রমণের পরিস্থিতিতেও ভয় পেয়ে থেমে যায়নি কম্যুনিস্ট মেয়েরা।

বম্বেতে বম্বে কংগ্রেসের নেতা শ্রী এস কে পাতিল স্বয়ং কম্যুনিস্ট বিরোধী কুৎসা প্রচারে লাগেন। যার ফলে নেত্রীস্থানীয় কম্যুনিস্ট কর্মী মালতী আগারকার রাস্তায় ছুরিকাহত হন এবং অল্পের জন্য বেঁচে যান।

কিন্তু এই সব প্রতিকূলতায় আরো শক্ত হয় কম্যুনিস্ট মেয়েরা। জনগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা, তাদের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো দেখা, খেটে খাওয়া মেয়েদের সংগ্রামের শরিক হওয়ার সংকল্প আরো দৃঢ় হয় তাদের। ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেওয়া তাদের যায়নি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাগ্রত কিষান

দুর্ভিক্ষের সে কি বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ রাত! তা পার হয়ে এল বাংলার কিষান—নিঃস্ব, নির্বিত্ত হয়ে। ধীরে ধীরে তার সম্বিৎ ফিরে আসতে লাগল।

সেই সময়ে ছিল ৭৫ লাখ কিষান পরিবার, তার মধ্যে অর্ধেকই ভূমিহীন অথবা দুই একরের কম জমি আছে। বিশ লাখ পরিবারের ছিল দুই থেকে পাঁচ একর জমি। বিশ লাখেরও কমের ছিল পাঁচ একর বা সামান্য কিছু বেশী। পাঁচ একরের কম জমি দিয়ে কোন পরিবারে 'ভরণ পোষণ হয় না, এটাই ছিল স্বীকৃত মান। অর্থাৎ ৭৫ লাখের মধ্যে ৫৭ লাখ পরিবারকেই কোন মতে একাহারে, অর্ধাহারে কাটাতে হয়। এ হিসেব ল্যাণ্ড রেভিন্যু কমিশনের প্রামাণ্য তথ্যাবলি থেকে নেওয়া।

জমিদার এবং জোতদাররা দেখছিল যে জমির খাজনা এক থাকা সত্ত্বেও ধানের দাম বেড়ে গেছে। অতএব তারা খুব ভালো করে বুঝল ফসল যার, তারই লাভ। কিষানও বুঝেছিল একথা। চাষের সব খরচ চাষীকে বহন করতে হত, এবং জমিদারকে দিতে হত ফসলের অর্ধেক। তার ওপরেও নানা ভাবে শোষণ চলত। নিয়ম ছিল—ফসল কাটার পর সব ফসল জমিদারের গোলায় উঠবে। সেখানে ভাগ হবে। জমিদারের প্রাপ্য অর্ধেক ছাড়াও—"হাতীর বরাদ্দ", "মাছের বরাদ্দ", "পাল-পার্বণের খাজনা", "বরকন্দাজ খরচ", "ঠাকুর বাড়ীর সেলামী" ইত্যাদি বহু বেআইনী অজুহাতে চাষীর ভাগ থেকে কাটা পড়ত। এ সব কাটান ছাটান এর পর আধিয়ার সামান্য যা পেত তাই থাকত পরিবারের ভরণপোষণের জন্য। মন্দার সময়ে

ঋণ নিয়ে থাকলে এক বস্তা ধানের ঋণ তিন বস্তা দিয়ে শোধ দিতে হত, ফসল কাটার সময়ই ধানের দাম সব চেয়ে কম থাকে ; সেই দামেই জমিদারের পাওনার হিসেব হত। ভাগচাষীকে এসব বরদাস্ত করতেই হত, ভয়ের কারণ জমিতে তার কায়েমী স্বত্ব নেই।

এই জন্যই দুর্ভিক্ষের সময় যখন জিনিসের দর অত্যধিক চড়ল, ভাগচাষী, গরীব চাষী আর তাদের পরিবাররা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ভাগচাষীর সংখ্যা অত্যন্ত বেড়েও গেল। উত্তরবঙ্গের কতগুলি গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষকে জমি বেচে দিতে হয়। তারা ভাগচাষী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আবার জোতদাররা হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক হয়। কষ্টে পড়ে জমি বিক্রীর ঘটনা অত্যন্ত ব্যাপক হল। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম জেলায়, এই রকম জমি বিক্রীর কবালা রেজেষ্ট্রী হয় ৩২,০০০। এই সংখ্যা ১৯৪২-এর সংখ্যার তিন গুণ। ফরিদপুর জেলায় ১৯৪২-এর জুন থেকে নভেম্বরে বিক্রীর কবালা হয় ৩৪,১১৬টি, ১৯৪৩-এর ঐ সময়ে ঐ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৫৮৩৩৪। যশোরে ১৯৪২-এর জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যে কবালার সংখ্যা ছিল ১৭০৮৭, ১৯৪৩-এর ঐ সময় তা গিয়ে দাঁড়ায় ৩২৩০৭-এ। মেদিনীপুরের তমলুকে ১৯৪২-এ কবালা হয় ৫০০০, আর ১৯৪৩-এ তা উঠে যায় ২৩৬০০তে। ওই জেলারই কাঁথিতে ১৯৪৩-এ আধ মণ ধানের বদলে জমি বেচে দেওয়ার ঘটনা আছে।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ দরিদ্র চাষীকুলকে বিপুলভাবে বিপর্যস্ত করল। এতে তাদের টনক নড়ে। একদিকে তারা দেখল পাইকারী হারে অনাহার ; আর তাদের জাতটাই ভিক্ষুক হয়ে পড়ছে আর একদিকে জোতদাররা ফুলে ঢোল। অসন্তোষ ঘনিয়ে ওঠে এই দেউলে কৃষকদের মধ্যে। ১৯৪৩-এ আবার দুর্ভিক্ষ মুখ-ব্যাদান করে ওদের গ্রাস করতে এল তখন ওদের চেতনা হল জোতদারদের গোপন মজুত টেনে বার করতে হবে।

১৯৪৬-এ উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে আবার দুর্ভিক্ষের অবস্থা হল। তখন এইসব জেলার গরীব কিষানরা শয়ে শয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল সংগঠন করে কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে জোতদারদের গোপন মজুত ভাণ্ডার টেনে বের করে এবং গরীবদের কাছে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বেচতে বাধ্য করে। খাদ্য আন্দোলনের সাফল্য এই আধিয়ারদের শক্তি যোগায়, আত্ম-বিশ্বাস জোগায়, এবং জনগণের কাছ থেকে তারা প্রীতি ও শ্রদ্ধা পায়।

১৯৩৮ সন থেকে কিষান সভা জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য এবং তে-ভাগার আন্দোলন করে আসছে। তে-ভাগা অর্থাৎ, ভাগচাষী, যাকে চাষের সমস্ত খরচ বইতে হয় সে পাবে অর্ধেকের বদলে দুই তৃতীয়াংশ।

কিন্তু একদিন যা ছিল হাওয়ার দোলায় জলের বুকে জাগা ছোট্ট একটু ঢেউ তাই এখন উদ্দীপনার এক উত্তাল তরঙ্গ হয়ে উঠল। দুর্ভিক্ষ এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড রাজনৈতিক ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং এ থেকেই উদ্ভূত তে-ভাগা আন্দোলনের এই প্রচণ্ডতা তিন বছর পরে এ দুই এর যোগাযোগ এখন স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল।

১৯৪৬-এর নভেম্বর মাসে ধান কাটার সময় হলে, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মেদিনীপুর, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং ২৪ পরগণায় তেভাগা আন্দোলন আরম্ভ হয়। তেভাগা, বিশেষ করে, দুর্ভিক্ষের মূলে যারা অর্থাৎ জোতদাররা, তাদেরই বিরুদ্ধে ছিল। দ্বিতীয়, আর একটা চমৎকার দৃষ্টান্তও তৈরী হল। তখন সাম্প্রদায়িক হানাহানি চলছিল। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান আধিয়ার ভাইরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল এক অটুট একতার বন্ধনে বাঁধা হয়ে।

দেখতে দেখতে তেভাগা আন্দোলন টেনে নিল সবাইকে—এমনকি সব থেকে পিছিয়ে থাকা, গাঁয়ের মেয়েদের অবধি। একেবারে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াল এই মেয়েরা। রামমোহন রায়ের নারী মুক্তির সংগ্রাম শুধু শহরের মেয়েদের জন্যই ছিল—এবং তা রইল রেনাসাঁ হয়ে। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন নিয়ে এল গাঁয়ের মেয়েদের নবজন্ম এই প্রথমবার। সাহসী কিষান মেয়েরা প্রচারের কাজ করতে লাগল। অনেক সময় মেয়েরাই নেতৃত্ব দিয়ে পুরুষদের লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে গেছে, জোতদারের ভাড়াটে গুণ্ডাদের রুখেছে ও দেহের রক্ত দিয়ে জেতা ফসল রক্ষা করেছে।

১৯৩৮ সনে বৃটিশ সরকার নিযুক্ত ফ্লাউড্ কমিশন তাঁদের প্রতিবেদনে ভাগচাষীদের জমিতে স্থায়ী স্বত্বের সুপারিশ করেন এবং ভাগচাষীরা যে মোট কাটা ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ নিজের জন্য রাখার অধিকারী, তাও সাব্যস্ত করেন।

সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে তিনটি আওয়াজ উঠল: (১) ফসল কেটে নিজের মরাইয়ে তোল (২) মোদের হিস্সা আধা নয়, তিনের দুই, (৩) হাওলাতী ধানের সুদ নাই। এই তিনটিকে মন্ত্র করে চাষীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল লড়াইয়ে।

তে-ভাগা আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল দিনাজপুর জেলা। ঠাকুরগাঁ ছিল এ জেলার পশ্চিম অংশে অতি দুর্ভিক্ষ-প্রবণ জায়গা এবং কিষান সভার একটি পাকা ঘাঁটি। ঠাকুরগাঁও এগিয়ে এল সামনের সারিতে।

ধান কাটা শুরু হল। এক দল স্বেচ্ছাসেবক লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ধান কাটতে আরম্ভ করল। আরেক দল রইল এদের পাহারায়। শস্য কাটা হলে নিজেদের মড়াইয়ে তুলল সে ধান। পুলিশ কোন আপত্তি করে নি। পুলিশ এল পরের দিন। কিষান সভার সম্পাদকসহ ৩২ জন কিষানকে গ্রেপ্তার করল। কিন্তু ধান কাটা থামে নি। এইবার পুলিশ এগিয়ে এল ধান-কাটা বাধা দিতে। এক কিষান মহিলা কমরেড দীপেশ্বরী লাঠি হাতে নিয়ে মাঠে এসে দাঁড়াল। তারপর ডাণ্ডা উঁচিয়ে সে ধাওয়া করল পুলিশদের। স্বেচ্ছাসেবকরাও ছুটল পেছনে। পুলিশ পিছু হটে মাঠ ছেড়ে চলে গেল।

দিনাজপুরের ছাত্র-নেত্রী রাণী মিত্র (পরে দাসগুপ্ত) নারী আন্দোলন করেছেন, তে-ভাগার সঙ্গেও যুক্ত। তিনি আমাদের শোনান—দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ে কিভাবে কিষান ভাইদের চোখ খুলে যায়, কিভাবে তারা সচেতন হয়, শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়েই নয়, সামাজিক সমস্যা নিয়েও কম্যুনিস্ট মেয়েরা গ্রামে গ্রামে যায়, দুর্ভিক্ষের সাথে লড়বার জন্য কিষান মেয়েদের মহিলা আত্ম-রক্ষা সমিতিতে আনতে। এইভাবে কিষান মেয়েরা সর্বস্তরের মেয়েদের সংস্পর্শে আসে। কিষান সমিতি ছিল শ্রেণী যুদ্ধের হাতিয়ার। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল তাদের ওপর শোষণ, অন্যায়, অবিচার, দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধে হাইকোর্ট।

রাণী বলেন, একবার পশ্চিম ঠাকুরগাঁওয়ের আতোয়ারী গাঁয়ে সমিতির স্থানীয় অফিসে সাধারণ সভা হচ্ছিল। সম্ভবতঃ সেটা ১৯৪৪ সন। ভাষণ দিচ্ছিলেন সম্পাদক। তাঁর বক্তৃতার মাঝখানেই হঠাৎ যেন একটা বোমা ফাটল; স্থানীয় একজন কমরেড-এর স্ত্রী তাঁর স্থানীয় কথ্য ভাষায় বলে ওঠেন, "কোন আইনে বৌগরে মারন যায়, কও দেখি কমরেড। আমার মরদ আমারে মারব ক্যান্? আমি বিচার চাই।" স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলা নিষেধ বলে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। বহু এলাকায় এই ধরনের অভিযোগ আসত কমিটির অফিসে এবং তার ওপরে সিদ্ধান্ত দিতে হত। আরেকটা গল্প বলেন রাণী। বীরগঞ্জ থানার ৫নং ইউনিয়নে

মহিলা নেত্রী ফুলেশ্বরীর বাড়ীতে একটা মিটিং হচ্ছিল। এক কৃষক মহিলা কিষান সভার একজন সভ্যকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে?" মহিলাটি বললেন, "এর নিষ্পত্তি করে দিতে হবে তোমাদের।" ওরা জিজ্ঞাসা করল, "কিসের নিষ্পত্তি করব?" সেই লোকটি তার বৌকে মারে। ক্ষমা চেয়ে, জরিমানা দিয়ে তবে সে ছাড়া পায়। আর একটা গল্প আছে স্থানীয় কমিটির সদস্য কমরেড কণ্ঠমণি সম্পর্কে। কণ্ঠমণির নালিশ হল: "বাড়ীর পিছ দুয়ারে যা তরিতরকারী হয় আমরা বেচি; ছাগল গরুর দুধ বেচি; খালে বিলে মাছ ধরে বেচি, ছাগলও বেচি। এখন এ পয়সা কার? স্বামীর না বৌ এর? এই পয়সা সংসারের পেছনেই যায়। কিন্তু মরদরা আছে খালি এই পয়সা হাতাবার তালে।" বহু জায়গায়ই এ প্রশ্ন ওঠে। কম্যুনিস্ট পার্টিকে ঐ টাকা স্ত্রীধন বলে তাদের রায় দিতে হল।

আর্থিক সমস্যা নিয়ে লড়তে লড়তে মেয়েরা এইটে শিখেছিল যে তাদের সম্মানের জীবন চাই, পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার চাই। কিন্তু লড়তে হবে তার জন্য। দিনাজপুরেও মেয়েরা যথেষ্ট সচেতন হয়। প্রবীণা কণ্ঠমণি বারমণি পার্টির একজন নেত্রী, মহিলা সমিতি ও কিষান সমিতিরও নেত্রী। তারপর আছে আতোয়ারীর দীপেশ্বরী, বালিয়াডাঙ্গির জয়মণি ও রোহিনী, রাণী শাংকাইলের ভাণ্ডারী, বীরগঞ্জের ফুলেশ্বরী সেতাবগঞ্জের ভুতেশ্বরী, ফুলবাড়ীর মানো, এবং আরো অনেকে। কমরেড রূপনারায়ণের (যিনি প্রবল ক্ষমতাশালী একজন জমিদারকে হারিয়ে এম. এল. এ হন) তরুণী মেয়েটিও ছিল, কিষান সভা এবং স্থানীয় পার্টির নেতা কালি সরকারের স্ত্রী স্বরাজ নন্দিনী ছিল, পাতিবাসের নেতা কুঞ্জদাস মহান্তের স্ত্রী বরদাসুন্দরী, এরা সবাই ধীরে ধীরে বড় হতে হতে নেত্রীস্থানীয় কিষান সভার কর্মী হন।

পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে তে-ভাগা আন্দোলনে লড়ে এরা। এবং লড়তে লড়তে এদের মধ্যে মুক্তির জন্য এক অদম্য প্রেরণা জেগে ওঠে। এই মেয়েরা চোখের সামনে দেখে ভারা ভারা সোনার ধানে ভরে উঠেছে ওদের আঙ্গিনা। এরাই একদিন সয়েছিল তীব্র ক্ষুধার জ্বালা; চোখের সামনে দেখেছিল সন্তানদের দুর্ভিক্ষে না খেয়ে শুকিয়ে শেষ হয়ে যেতে—তাই আজ এই মেয়েরাই তে-ভাগার সব চেয়ে জবরদস্ত শরিক। কিসের তাগিদ, কোন শক্তি এই গাঁয়ের মেয়েদের ঠেলে নিয়ে এল বাইরে? এর জবাব পাওয়া

যাবে পুরুষোত্তমপুরের সেই বিধবা কিষান বৌএর কাহিনীতে। ৩৫ বছর বয়স, পাঁচটি সন্তান। স্বামী মারা গেল মহামারীতে। দিনের পর দিন অন্ন নাই ছয়টি প্রাণীর। দিনের পর দিন ভেতরে কুরে কুরে খেয়েছে ক্ষিধের ধারাল দাঁতগুলি। ওর স্বামী ছিল নগেন জোতদারের ভাগচাষী। জোতদারের কাছে গিয়ে ও ধান-ভানার কাজ চাইল। জোতদার ওকে ঠকাল। দু'সেরের বদলে দিত একসের ধান। পাঁচটি সন্তান—নালিশ করত না ভয়ে। থাকত এক ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে, চাল নেই বললেই হয়—তালপাতা দিয়ে কোন মতে ঠেকান সেই কুঁড়েই জলে ঝড়ে রোদে ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁই। এই যন্ত্রণার কি শেষ নেই? এর পরেই এল তেভাগার জোয়ারের ঢেউ। পুরুষোত্তমপুরের মেয়েরা যেদিন মরদদের সাথে ছুটে এল মাঠে ধান আগলাতে—ঝাঁটা হাতে এল ওই মেয়েও। কিষানদের প্রতিটি লড়াইয়ে ও থাকত আগের সারিতে। গাঁয়ে পুলিশ ঢুকলেই শাঁখ আর ঘণ্টা বেজে উঠত—দূর দূরান্তর থেকে শোনা যেত তার আওয়াজ। এ উপায়টি বের করেছিল কিষান মেয়েরাই। শাঁখের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওরা আওয়াজ দিত "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ"। শোনা মাত্র ছুটে আসত মেয়ের দল ঝাঁটা, লাঠি, দা, গাবেন, হাতের কাছে যা পেত তাই নিয়ে এবং রাস্তায় এসে দাঁড়াত কাতার দিয়ে পুলিশের পথ বন্ধ করে। টুমনিয়ার পার্টি অফিসে একদিন মাঝরাতে খবর এল, এক পুলিশ নাকি স্বেচ্ছাসেবিকাদের সম্বন্ধে অশালীন মন্তব্য করে। কমরেড ভাণ্ডারী বলে এক মহিলার নেতৃত্বে একদল মেয়ে গিয়ে ধরল সেই পুলিশকে, রেখে দিল আটকে। যতক্ষণ না টুমনিয়ার পার্টি অফিস থেকে খবর এল, পুলিশেরই বন্দুক হাতে কমরেড ভাণ্ডারী স্বেচ্ছাসেবিকাদের নিয়ে রইল পাহারায়।

১৯৪৪-এর ৪ঠা জানুয়ারী চিরির বন্দরে গুলি চালায় সশস্ত্র পুলিশ—মারা পড়ে শিবরাম আর সমীরুদ্দিন। সেই দিন, সেই ৪ঠা জানুয়ারী হিন্দু-মুসলমান ভাগচাষীদের ঐক্যের ভিত আরো শক্ত করে গাঁথা হল রক্ত দিয়ে। সমীরুদ্দিন ছিল কৃষি-মজুর; আর শিবরাম ছিল অতি গরীব একজন সাঁওতাল ভাগচাষী। এরাই হল তে-ভাগার প্রথম শহীদ হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রতীক এবং বৃটিশ সরকারের চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক হত্যার বাঁধ-ভাঙ্গা পাগলা জলের যে উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশের বুকে এ যেন তার মধ্যে রক্তে রচিত একটি ঐক্যের দীপ।

মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা এককালে তে-ভাগা মঞ্জুর করে একটি বিলের খসড়া রচনা করে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান, দুই সম্প্রদায়েরই জমিদারদের চাপে তা বিধানসভায় পেশ করাই হয়নি।

খানপুরে জোতদাররা ছিল প্রবল পরাক্রান্ত। কিষানরা সবখানেই ধানের গাদা ভেঙ্গে তাদের ⅔ ভাগ নিয়ে নিচ্ছিল। খানপুরের কিষানরাও তাই করে। কিন্তু কিষানদের গরুতে ধান খাচ্ছে এই অজুহাত দিয়ে জোতদার তার লেঠেল লেলিয়ে দেয়, গরু ধরে থানায় দিয়ে আসত। কিষানরা গরু ছিনিয়ে নেয়। সেই রাগে জোতদার পুলিশ ডাকে। সতের জন আধিয়ারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। বিদ্যুৎ-বেগে খবর ছড়িয়ে পড়ে। স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট এক দল এসে জড় হয় গ্রেপ্তার ঠেকাতে। এই বিপুল প্রতিরোধে ঘাবড়ে গিয়ে পুলিশ ১৩১ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। ২২ জন কিষান মারা পড়ে—তার মধ্যে ছিল—কৌশল্যা, কামরাণী ও যশোদা বারমানী। যশোদার দেহটার ওপর দিয়ে একটা ট্রাক চালিয়ে দেওয়া হয়। তাতেও খুশি না হয়ে তার মাথায় ও পেটে গুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দেয় ওরা, এতদূর চরমে ওঠে পুলিসের হিংস্রতা।

এর পরের দিনই দিনাজপুর জেলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত ঠুমনিয়াতে গুলি চলে। কমরেড শুকুরচাঁদ, তার স্ত্রী সুরমা এবং আরো চারজন কিষান মারা পড়ে। এই গুলি চালনার প্রতিবাদে ঠাকুরগাঁওয়ে বিরাট এক কিষান সমাবেশ হয়। হঠাৎ সেই সমাবেশকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়, এবং নির্বিচারে গুলি চালান হয়। সেইখানেই পাঁচজন কিষান মারা পড়ে। নারী আন্দোলনের নেত্রীদ্বয় রাণী মিত্র এবং বীণা গুহকে ঠাকুরগাঁওয়ে পাঠান হয়। কিন্তু পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ডাক্তার, সাংবাদিক বা অন্য কেউ গেলে মেয়েরাই তাদের সব ঘুরে ঘুরে দেখায়। কিন্তু গোটা এলাকাটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘরে ঘরে ঢুকে সব ধান নিয়ে গিয়ে জোত-দারের ঘরে তোলে। তারা মেয়েদের ওপরও অত্যাচার করে।

ময়মনসিংহ জেলায় তে-ভাগা আন্দোলনের অগ্র-পর্বে ছিল সেখানকার উপজাতি হাজংদের ১৯৩৭-৩৮ সালের টঙ্ক আন্দোলন। টঙ্ক ছিল উপজাতি-দের ফলান ফসলের ওপরে একটা চড়া হারের কর। টঙ্ক আন্দোলনে প্রথম মেয়েরাই নামে। তারা যে শুধু দলে দলে আন্দোলনে যোগ দেয় তা নয়,

বিপুল সাহসেরও পরিচয় দেয়। টঙ্ক আন্দোলন ১৯৩৭ সনে আরম্ভ হয়, এবং ১৯৫০ সনে কৃষি-সংস্কার আইন প্রবর্তন হওয়ার পরে তার শেষ হয়। হাজং এবং ডালু উপজাতিদের স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়ে ৬০ জন প্রাণ দেয় এই আন্দোলনে।

তে-ভাগা আন্দোলনে হাজং মেয়েরাও এসে দলে দলে যোগ দেয়। অমিত সাহসের পরিচয় দিয়ে শহীদ হয় অনেকেই, যাদের অন্যতমা ছিল বাশমণি, শংখমণি, রেবতী এবং অন্যরা।

নেত্রকোণার সিংহেরবাংলায় দুই মুসলিম কিষান মহিলার এক চমকপ্রদ কাহিনী, এখানে তার উল্লেখ না করে পারছি না। "আধা ভাগে চলবে না, তে-ভাগ চালু কর, চালু কর", এই আওয়াজ তুলে মেতে ওঠে কিষানরা। ময়মনসিংহের মুসলমান জোতদাররা এক চক্রান্ত করে। কিশোরগঞ্জের চাতাল গ্রামে কিসানরা ততটা সংগঠিত ছিল না। এই এলাকায় এসে তারা প্রচার আরম্ভ করে যে পাকিস্তান আসছে। পাকিস্তান অর্থ মুসলিম-বাদশা-রাজ। তারা তে-ভাগ কেন—পুরো হিসসাই দিয়ে দেবে—চাইতেও হবে না। কৃষকরা ফাঁদে পা দিয়ে জোতদারের গোলায় ধান তুলে দেয়। আন্দোলন বানচাল হয়।

কিন্তু লড়ল সিংহেরবাংলার কিষানেরা। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক। নিত্যানন্দ গাঁয়ের এক জনপ্রিয় কিষান-কর্মীর ওপর বেদম মারধোর হয়। মেয়েদের ওপরও বহু অত্যাচার হয়। এই সব কাণ্ড-কারখানা করে দুইজন পুলিশ এক গাছ-তলায় বসে বিশ্রাম-সুখে যখন মশগুল, তখন ঘটল এক ঘটনা—যা কারো কল্পনায়ই আসে নি। এ গাঁয়ে পরদা ছিল কড়া। এ পর্যন্ত খোলাখুলি আন্দোলনে তেমন একটা যোগ দেয়নি সেখানকার মেয়েরা। কিন্তু এদিন পরদার কথা ভুলে গেল দুই তরুণী মুসলিম মহিলা। রাগে গর্ গর্ করতে করতে দা হাতে সে ছুটে এল গ্রাম্য ভাষায় চীৎকার করতে করতে, "গুয়ের ব্যাটা, আমাগ মরদগুলিরে মারবার লাগছস কেন্? আইজ তগ জান শ্যাষ্। এই দাও দেইখ্যা ল।" দা হাতে ওই চণ্ডী মূর্তি দেখে পুলিশ বন্দুক ফেলে রেখে হাওয়া। তে-ভাগার তাকত্ জেনানার পাঁচিলও ভেঙ্গে দিয়েছিল।

জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জ থানার ১৯৪৬-এর ১৯শে ডিসেম্বর জোতদার

একদল সশস্ত্র গোরখা এবং চৌকিদার সঙ্গে নিয়ে আসে। আধিয়ার কালিচরণ এবং ২০ জন স্বেচ্ছাসেবকের নেতৃত্বে ধান কাটা হচ্ছিল। ভয় দেখায় জোতদার। কিষান নেতা মাধব দত্ত প্রতিবাদ করায় জোতদারের লোকেরা তাকে জখম করে। তারপর তাকে এবং বিন্থা বর্মন প্রমুখ অনেক কিষান নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু আধিয়ারদের ধান কাটা বন্ধ হয় না। পরের দিন বিন্থা বর্মনের স্ত্রী কিষানদের ঝি-বৌ-মায়েদের নিয়ে ৫০ জনের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে বাকী ধানকাটা শেষ করে। জোতদারের বন্দুকের ভয়ে তারা পিছ পা হয় নি।

১৯৪৭-এর ২৩ শে ডিসেম্বর সাতটি মেয়ে ধান কেটে নিয়ে আসছিল। নৈমুদ্দিন জোতদার ৪০ জন গুণ্ডা নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে। কিন্তু মেয়েরা ভয় পায়নি। বাঘিনীর মত লড়ল, তারা জখমও হল, কিন্তু পালাতে হল নৈমুদ্দিনকে।

আলুকোলা গাঁয়ে চড়াও হয় পুলিশ। গোপন ধান খুঁজে না পেয়ে তারা পাগলা কুকুরের মত হয়ে গিয়ে, ২০ জন মুসলমান মেয়ে পুরুষকে ঘায়েল করে। তারপর মেয়েদের অপমান করতে গেলে, এমন মার খায়—যে জন্মে বোধহয় ওরকম মার খায় নি সে। এবং মার খেয়ে বন্দুক টন্দুক ফেলে পালায়।

কম্যুনিস্ট পার্টি এবং কিষান সমিতিকে বহু নির্যাতন সইতে হয়। আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নেতাদের গা ঢাকা দিতে হয়। মেয়েরাই তাদের আশ্রয় দেয়, বাঁচিয়ে রাখে এবং তাদের খোঁজ যেন পুলিশে না পায় সে-দিকে নজর রাখে। বিক্রীর জন্য যে সব জিনিস হাটে নিয়ে যায় তার মধ্যে লুকিয়ে বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, চিঠিপত্র ইত্যাদি সব তারা পাচার করত। এই মেয়েরাই ছিল যোগ-সূত্র, যাদের মাধ্যমে কম্যুনিস্ট পার্টি বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারত। কিষান সভা এবং কম্যুনিস্ট পার্টির মিটিং যখনই এই সব গোপন আশ্রয়ে হত, সারারাত পাহারা থাকত মেয়েরা।

তে-ভাগা আন্দোলনের জন্য ওরা সব কিছু উজাড় করে দেয়, এমনকি জান অবধি। মেদিনীপুরের কেন্দেমারী গ্রামে একটা পুলিশ ক্যাম্পের চারদিকের ক্ষেত থেকে কৃষকরা ধান তুলে আনতে গেলে বেদম মার খায় এবং তাদের পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। কিষানেরা জমায়েত হতে থাকলে তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়, কাজেই তাদের চলে যেতে হয়। জোত-

দারদের উৎসাহ বেড়ে যায়। তারা এবং পুলিশ স্থির করে যে তারা ধান তুলে নিজেদের গোলায় নিয়ে যাবে। কিন্তু স্বপ্নেও তারা ভাবেনি যে বিমলা মণ্ডল নামে মেয়েটা বঁটি, দা, কুড়ুল, ঝাঁটা হাতে এক দল জঙ্গী মেয়েকে নিয়ে এসে চড়াও হবে ওদের ওপর। ওদের আঁচলে বাঁধা আবার ধুলো-মেশান লঙ্কার গুঁড়ো। পুলিশের কাছে এসে তাদের চোখে লংকার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল। পুলিশ প্রাণ নিয়ে পালাল। ঠিক এই সময়ে তিন চার দল স্বেচ্ছাসেবক লাঠি হাতে ছুটে এল। পুলিশ পালাতে বাধ্য হল। নির্বিঘ্নে ধান কেটে পঞ্চায়েতের মরাইতে তোলা হল। এই লড়াইয়ের প্রথম সারির সত্যবালা বেরা, শিবরানী মিত্র (দীক্ষিত), বিমলা মাঝি, সিন্ধুবালা ভুঁইয়া, ব্রজবালা দলুই—নামগুলি মনে আঁকা থাকবে চিরকাল।

যুগযুগান্তের ঘুম ভেঙ্গে কিষান মেয়েরা চোখ মেলেছে নতুন যুগের ভোরে। বুক ভরে নেবে এই ভোরের বাতাসে। ভোর এনেছে ১৯৪৬-৪৭-এর মহান গৌরব-দীপ্ত তে-ভাগা আন্দোলন।

এই প্রচণ্ড তেভাগা আন্দোলন দেখিয়ে দিল শ্রেণী সংগ্রাম হিন্দু-মুসলমান আধিয়ারদের ঐক্যের ভিত কি ভাবে পাকা করে দিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—নেতৃত্বই রইল বিভক্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সারা পৃথিবী থেকে ফ্যাসিবাদকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন ভারতে চলছে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং শ্রেণীসংগ্রামের অধ্যায়। জাতীয় নেতারা জেল থেকে বেরিয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে এক অভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় সারা দেশ ভেসে গেল। নেতাদের হিসেব ও কল্পনা ছাড়িয়ে গেল এই বিপুল আন্দোলনের প্রসার বিস্তার-বেধ।

১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারীর নৌ-বিদ্রোহ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজকীয় বিমান বাহিনীর রাজনৈতিক ধর্মঘটে বোঝা গেল যে বৃটিশ শাসনের ভিতে ফাটল ধরেছে। নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে যে ব্যাপক গণ-সংহতি দেখা গেল, মর্যাদাসম্পন্ন জাতীয় নেতৃত্বও তা ঠেকাতে পারল না। বৃটিশরাজ ভীত হল। কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বম্বে শহরে সাধারণ হরতাল হল। নৌ-বিদ্রোহীদের পাশে এসে দাঁড়াল কম্যুনিস্ট পার্টিও। তারা শুধু নৌ বিদ্রোহীদেরই সমর্থন করল না, ঐতিহাসিক ডাক-তার ধর্মঘটের সংগঠনেও বড় ভূমিকা নিল। শ্রমিকদের নানা রকম প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরিচালনার কাজেও তারা পুরোভাগে রইল।

আজাদহিন্দ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ও সরকারী ও পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ব্যাপক ছাত্র-ধর্মঘট হল ১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বর। অভাবনীয় এক ছাত্র সমাবেশ হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। এবং যে শোভাযাত্রা বের হল, তার আয়তন সর্ব কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেল। পুলিশ বাধা দিল ধর্মতলার শেষে, এসপ্ল্যানেডের মুখে। ছাত্ররা বসে পড়ল সেইখানে, এবং স্থির করল, সেইখানেই বসে থাকবে সারা রাত। এক অগ্নিগর্ভ অবস্থা। পুলিশের

সঙ্গে বাধল সংঘর্ষ—তা ছড়িয়ে গেল—পুলিশের গুলিতে মরল ছাত্র রামেশ্বর। তার দেহ নিয়ে চলল এক মহা শোভাযাত্রা। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে রইলেন ভয়হীনা ন্যায় ও স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি। কিন্তু ১৯৪৫-এর ২৫শে নভেম্বর এক মহা-দুর্দৈব আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। ফিরছিলেন সকাল ৮টায়—মোটর দুর্ঘটনায় শেষ হল তাঁর মহা-প্রাণ। যতদিন বেঁচেছিলেন, নির্ভয়ে দেশের সেবা করে গেছেন; শেষের ক্ষণেও নিভয়েই মরণকে নিলেন অঞ্জলি পেতে।

১৯৪৬-এর শুরু থেকেই চলল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য লাগাতার আন্দোলন। ১৯৪৬-এর ১২ই নভেম্বর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এবং মুসলিম ছাত্রলীগের প্রায় ১০,000 ছাত্রের এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়। লাঠি চালায় পুলিশ; শতাধিক ছাত্র জখম হয়।

জাতীয় নেতারা এক প্রতিবাদ সভা করেন—সভাপতিত্ব করেন সার-ওয়ার্দি। প্রায় ২০,000 মানুষের সমাবেশ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ওদিকে বিবেকানন্দ রোড্ আর সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর সংযোগস্থলে পুলিশ গুলি চালায়। মনোরঞ্জন দত্ত, রাছু মিয়া এবং ছাত্র নিজামুদ্দিন মারা পড়ে। ১৮ বছরের মেয়ে আরতি বসু জখম হয়। মৃত মুসলমান শহীদদের নাখোদা মসজিদে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যায় ২০,000 মানুষ—নজিরহীন এই শোভাযাত্রা।

অসামরিক শাসকদের হাত থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষ শাসনভার গ্রহণ করে ১৯৪৬-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী। সৈন্যদের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধের মত লড়াই চলে সাধারণ মানুষের।

বম্বেতে নৌ-বিভাগের প্রশিক্ষণ যুদ্ধজাহাজ 'তলোয়ারে' বিদ্রোহ শুরু হয় ১৯৪৬-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী। ধর্মঘট করে ৮000 নাবিক। কাস্‌ল ব্যারাকে বিদ্রোহী নাবিকদের ঘিরে রাখার জন্য ১000 সৈন্য পাঠান হয়। কিন্তু এরা বিদ্রোহীদের ওপর গুলি চালাতে রাজী হয় না।

নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে ২000 বিমান সৈনিক একটি শোভাযাত্রা বের করে। পুলিশ গুলি চালায় কিন্তু শোভাযাত্রীরা জখম ভাইদের তুলে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

ধর্মঘট করে ১০,০০০ ডক-শ্রমিক। করাচীতে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুস্থান জাহাজের নাবিকদের মধ্যেও।

মুক্তি যুদ্ধ নতুন রূপ পায়, নতুন বিস্তার পায়। রাজ্যে সরকারী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

বিদ্রোহী নাবিকদের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য ১৯৪৬ এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী বোম্বের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এক লক্ষ শ্রমিক। শহরটিকে তুলে দেওয়া হয় সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে।

নাবিকগণ আবেদন জানায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই আন্দোলন সমর্থন করে না। বিদ্রোহী নাবিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কম্যুনিস্ট পার্টি। সামরিক শাসন অগ্রাহ্য করে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট করে বোম্বের তিন লাখ শ্রমিক। প্রাণ হারায় ১৩০ জন শ্রমিক—একজন শ্রমিকের একটি মেয়েও ছিল হতদের মধ্যে।

অনবদ্য এক বিপুল ভ্রাতৃত্বের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত সারা বম্বে। ১৯৪৬-এর ২২শে ফেব্রুয়ারী বিকেল চারটের সময় একটা মিলিটারী গাড়ী দাদার রোড্ দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে ছুটতে এসে মোড় ঘুরেই এলোমেলো গুলি ছুঁড়তে লাগল। পারেল মহিলা-সঙ্ঘের সম্পাদিকা কুসুম রণদিভে, কোষাধ্যক্ষা কমল ধোঁদে, এবং অহল্যা রঙ্গনেকার—ঐ দিক দিয়ে রেল ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। এঁরা সকলেই কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী। হঠাৎ একটা গুলি কমলের দেহ ভেদ করে চলে যায়। সে মারা যায়। কুসুমের পায়ে গুলি লাগে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। শ্রমিক বসতির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কে, ই, এম, হাসপাতালে তিন দিনে ২৫০ শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

সারা বোম্বের বুকে মিলিটারীর এক লাগামহীন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলে।

কলকাতায় যেমন মহিলারা নৌবিদ্রোহের সমর্থন জানায় শোভাযাত্রা করে, বোম্বের মহিলারাও তেমনি বেরিয়ে পড়েন বোম্বের রাস্তায় নাবিকদের সঙ্গে তাঁদের দৃঢ় একাত্মতা প্রকাশের জন্য। একটি কম্যুনিস্ট মেয়ে প্রাণ দেয়। এমনি করেই বেরিয়ে আসে মেয়েরা ঐতিহাসিক ডাক-তার ধর্মঘটের ডাকে ১৯৪৬-এর ২৯শে জুলাই। এর আগে এঁরা এমনি আন্দোলনে তেমন একটা বৃহৎ সংখ্যায় যোগ দেন নি। কিন্তু এবারে বেরিয়ে এলেন একেবারে সবাই।

বেশ অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে টেলিফোনে তখন কাজ করতেন। এঁরাও যোগ দেন ধর্মঘটে। ২২শে জুলাই মাঝরাতে বড়বাজার, কলকাতা ও পার্কষ্ট্রীট এক্স্‌চেঞ্জ-এর সব অপারেটর কাজ বন্ধ করে। ২৩শে জুলাই বাঙ্গালী ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে অপারেটাররা সম্মিলিতভাবে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-গুলিতে পিকেটিং করে।

২৯ শে জুলাই—জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বৃহত্তম সাধারণ হরতালের দিন। কলকাতার জীবন একেবারে থেমে যায়।

সেদিন আকাশবাণী ভবনে পিকেটিং করতে যায় ছাত্রীরা। সহ-ষ্টেশন ডিরেক্টর প্রভাত মুখার্জি নির্লজ্জভাবে বলেন, "দেশ টেশ জানি না, আমার কাছে সরকারের হুকুম বড়"। তিনি এবং তাঁর সাকরেদ্‌রা মেয়ে পিকেটারদের লক্ষ্য করে কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল বিদ্রূপ করেন। ষ্টেশন ডিরেক্টর চীব্‌ আসেন। একটি মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে চলে যান তিনি। পুলিশ ডাকা হয়। তারা পিকেটারদের মধ্য দিয়েই জীপ চালাতে যায়। মেয়েরা মাটিতে শুয়ে পড়ে। এ দেখে পুলিশ একটু ইতস্ততঃ করে। পার্বতী নামে একটি পিকেটারের হাত মাড়িয়ে চলে যায় এক সার্জেন্ট। সঙ্গে সঙ্গেই সার্জেন্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অলকা মজুমদার, গীতা মিত্র, সুপর্ণা রায় এবং গীতা মুখার্জি, এরা সবাই ছাত্রীদের নেত্রী। গীতা মিত্র কলার ছিঁড়ে নেয় সার্জেন্ট সাহেবের। ধন্য সাহস।

সারাক্ষণ চুপ করে ছিল ভারতীয় কনষ্টেবলরা। তারা কিছুই বলে নি। সার্জেন্টের সঙ্গে মেয়েদের লড়াইয়ের হট্টগোলের ফাঁকে আকাশবাণীর একটা জীপ ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকে যায়। আঘাত লাগে দীপ্তি রায়ের।

ইতিমধ্যে বিরাট এক জনতা এসে জমায়েত হল ওখানে। চীব আর মুখার্জীকে তারা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত, যদি না ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময় কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক-বন্দী-মুক্তি আন্দোলনের শোভাযাত্রা সেখানে এসে পৌঁছাত এবং নেতা নিরঞ্জন সেন বিক্ষুব্ধ জনতাকে না শান্ত করতেন। সে দিন তিনটি ঘণ্টা আকাশবাণীকে শুধু হারমোনিয়ম বাজিয়ে গ্রাহকদের শোনাতে হয়।

২৯শে জুলাই—সে দিন বন্ধ থাকে হাইকোর্ট আর সিনেমা ; একটি রিকশও চলেনি রাস্তা দিয়ে। বেরোয়নি খবরের কাগজও। বিকেলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে ময়দানে জন-সমাবেশ। নারী-পুরুষ, শ্রমিক,

মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে তিন লাখের বেশী মানুষের সীমাহীন এক উত্তাল সমুদ্র।

মঃআঃরঃসঃ-র পক্ষ থেকে ১৯৪৬-এর ৩রা অগাস্ট, আকাশবাণী ভবনের সামনে ছাত্রী পিকেটরদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানান এলা রীড. গীতা মিত্র এবং সুষমা সেন।

১৯৪৬-এ আবার খাদ্য পরিস্থিতি খারাপ হয়। কিন্তু ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময়কার সেই নীরবে অনাহারে ধুকতে ধুকতে মরার দিন আর নেই। মেয়েরা অনেক সচেতন, অনেক সংগ্রামশীল হয়েছেন এই তিন বছরের নানা অভ্যুত্থান, সংগঠিত আন্দোলনের আর সংগ্রামের ফলে। দাবী আদায়ের পথ তাঁরা জেনেছেন, বিদেশী রাজ-শক্তির আসল চেহারাটাও তাঁদের কাছে খুলে গেছে।

জেলায় জেলায় চলে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করার জন্য জিন্নাকে অনুরোধ জানিয়ে লেখেন পণ্ডিত নেহেরু ১৪ই অগাস্ট।

কিন্তু জিন্না প্রত্যাখ্যান করেন সেই অনুরোধ।

১৬ই অগাষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয় মুসলিম লীগ। এ যেন একটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অশনি সংকেত হল। ১৯৪৪ আর ১৯৪৬-এর সেই ঐক্যবদ্ধ বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম, রাজনৈতিক-বন্দী-মুক্তির মিলিত সেই আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ আর ডাক-তার-ধর্মঘটের সমর্থনে সেই বিপুল অভ্যুত্থান আর সাধারণ হরতাল—যাতে প্রভেদ ছিল না হিন্দুর আর মুসলমানের—সব নস্যাং হয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদের একটি কুট নীতির মোক্ষম প্যাঁচে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিংসাত্মক কাজ প্রচণ্ডভাবে বোমার মত ফেটে পড়ল কলকাতার বুকে।

বাংলার গদিতে তখন মুস্‌লিম লীগ। তারা ১৬ই আগষ্টকে ছুটির দিন ঘোষণা করল কংগ্রেসের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও। বিধানসভায় এ বিষয়ে আলোচনার অনুমতি দেওয়া হল না।

১৬ই অগাষ্টের ভোর হতে হতেই কলকাতা এক নরক হয়ে উঠল—খুন, জখম, রক্ত, লুটপাট আর ধ্বংসে। মানুষ মরেছে তিন থেকে পাঁচ হাজার। আর লুঠতরাজ, আগুনে কত সম্পত্তি যে গেছে তার পরিমাণের হিসেব নেই।

সব থেকে বেশী সর্বনাশ হয়েছে—ছোটখাট দোকানদার, বাজারের খুচরো বিক্রেতা, আর শহরের গরীবের দলের।

কলকাতার পরেই দাঙ্গা আরম্ভ হল বোম্বেতে—ঝড়ের কেন্দ্র হয়ে উঠল কলকাতা আর বোম্বে। প্রথমে কলকাতার আশ-পাশ বা গ্রামে দাঙ্গা ছড়ায়নি; কিন্তু ত্রাসে কলকাতার মানুষ পালাতে লাগল—তাদের মুখে মুখে ছড়াতে লাগল কলকাতার রক্তাক্ত কাহিনীর বীভৎসতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখার আগুন ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামান্তে ছোট বড় শহরে আর শহরতলিতে। পূর্ববাংলার নোয়াখালি, সেই আগুনে পুড়ল সব চেয়ে বেশী।

নারীর সম্মান, মানুষের জীবন, গরীবের কুঁড়ে—কিছুই নিরাপদ ছিল না দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায়—পুলিশ আর মিলিটারীর শাসন হল সর্বত্র।

এ শুধুই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-ঘটিত দাঙ্গা নয়। রাজনৈতিক দাঙ্গা—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পারস্পরিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফসল।

নোয়াখালির পালা এল। কিন্তু প্রশ্ন হল—এ নারকীয় বীভৎসতা নোয়াখালিতে কেন?

গত কয়েক বৎসর নিদারুণ বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে নোয়াখালিকে। ১৯৪২-এ এল যুদ্ধ। মিত্রশক্তি বাহিনীর বিরাট ছাউনী পড়ল এখানে। যুদ্ধের প্রয়োজনে—বলবৎ হল "পোড়া মাটির নীতি"—যার ফলে উপকূলের গ্রামগুলো সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে গেল এবং সর্বোপরি সৈন্যদের অকথ্য অত্যাচার।

১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষের প্রথম পদক্ষেপ পড়ল নোয়াখালিতে। হাজার হাজার উদ্বাস্তুতে ভরে গেল গোটা জেলা। যুদ্ধের ঠিকাদার আর কালোবাজারীদের লীলা-ভূমি হল নোয়াখালি। আবার দুর্ভিক্ষ হল ১৯৪৬-এ। চাল হল ৩০ টাকা মণ। ভেঙ্গে পড়ল রেশনিং ব্যবস্থা। যুদ্ধের নানা ব্যাপারে যারা কাজ পেয়েছিল, তাদের কাজ গেল। কিছুই রইল না জীবন ধারণের উপায়—অনেকেই চোর ডাকাত হল। অতএব কলকাতার পর যখন নোয়াখালিতে এসে পৌঁছল "মুসলিম লীগের" প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক—নরক গুলজার হতে আর দেরী হল না।

কলকাতার খেলাই এখানেও খেলল পুলিশ। তাদের চোখের সামনে দাঙ্গার মারাত্মক প্রস্তুতি চলল। তারা অঙ্গুলি হেলনও করল না।

১০ অকটোবর নাগাদ শুরু হল জোর করে ধর্মান্তরকরণ, জবরদস্তি অপহরণ, লুটতরাজ, জবরদস্তি বিয়ে ইত্যাদি। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে হতে লাগল এ সব। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন যে তাঁকেও জোর করে মুসলমান করা হয়, কিন্তু একজন প্রবীণ মুসলমান তাকে বাঁচিয়ে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেন। পালানও সহজ ছিল না। কারণ রাস্তায় রাস্তায় গুণ্ডারা পাহারা দিত, রাস্তা বন্ধ করত, পুল ভেঙ্গে দিত—এই সব নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করত।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ শুরু হল। শয়ে শয়ে মানুষ খুন, বেশীর ভাগই পরিবারের উপার্জন-কারী পুরুষদের; চলল গণ-ধর্মান্তরীকরণ। বৃটিশ লিবারেল দলের মুরিয়েল লেষ্টার নোয়াখালি পরিদর্শন করে লেখেন: "শয়ে শয়ে হত্যা, জবরদস্তি ধর্মান্তরীকরণ ইত্যাদি অবাধে চলে। জোর করে বিবাহ, হাজারে হাজারে মানুষকে জোর করে গো-মাংস খাওয়ান ও কলমা পড়ান হয়।"

গান্ধীজীর কানে গেল নোয়াখালির বিবরণ। ১৫ই অকটোবর দিল্লীতে এক প্রার্থনা সভায় তিনি এই সব অসহায় মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে বলেন, "ভারতের অর্ধেক মানুষ যদি অসাড় শক্তিহীন হয়ে থাকে, তবে ভারত কোন দিন স্বাধীনতার মুখ দেখবে না। বরঞ্চ ভারতের মেয়েরা অস্ত্র ধারণ করতে শিখুক যাতে তারা এইভাবে অসহায় হয়ে না পড়ে আত্মরক্ষা করতে পারে।"

১৯৪৬-এর ১৯শে অক্টোবর গান্ধীজী নোয়াখালি যাওয়া স্থির করেন এবং ১০ই নভেম্বর নোয়াখালির চৌমুহানীতে আসেন।

আচার্য কৃপালনী ও সুচেতা কৃপালনীর ওপর, বিশেষ করে সুচেতার ওপর ত্রাণকাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের কমিশনারের স্ত্রী অশোকা গুপ্তা ছিলেন সমাজ কর্মী। তাঁর মাধ্যমে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন ত্রাণ কাজের জন্য সাহায্য ও স্বীকৃতি পায়।

এরই মধ্যে নোয়াখালি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাহায্যে একদল কম্যুনিস্ট মেয়ে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় যায়। আমার ছেলেটির মাত্র এক বছর বয়স তখন তাকে ফেলে যেতে মন সরছিল না। কিন্তু ওদিকে নোয়াখালির দুর্গত বোনেদের ডাক—আমি ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। মণিকুন্তলা সেন, কমলা চ্যাটার্জি, বেলা লাহিড়ী, মায়া লাহিড়ী, ইরা সান্যাল, মনোরমা বসু, বিভা সেন এবং আমি ত্রাণ কাজের জন্য নোয়াখালি চলে যাই। আমাদের

সম্বল ছিল আমাদের বুকের বল আর সেবার আকুলতা। জিনিষপত্র আমাদের বিশেষ কিছু ছিল না। আমাদের একদল গেল চৌমুহানি আর নোয়া-খালিতে; আর একদল গেল নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের দক্ষিণ কলকাতা শাখার সঙ্গে তাদের চাঁদপুর শাখায়। আমি ছিলাম এই দলে। চাঁদপুর শাখার সম্পাদিকা ছিলেন পঙ্কজিনী চক্রবর্তী। পঙ্কজিনীদি আমাকে তাঁর নিজের বাড়ীতে রাখলেন। কিন্তু দু চার দিনের মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আমাদের কাজ বা ওখানে থাকা এঁদের ঠিক পছন্দ হচ্ছেনা। কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হল আমাদের। তারপর আমি এবং আর একজন ঠিক করলাম, কিছু দুধের বাক্স নিয়ে যাব একেবারে ভেতর দিকের গ্রামগুলোতে। এইসব জায়গার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু কোন যান বাহন পেলাম না আমরা। হেঁটে যাওয়াই স্থির করলাম হাইমচরে। হাইমচর একটা বড় ব্যবসার কেন্দ্র। দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই জায়গাটা। সরোজিনীদি আমাদের একজন গোরা সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেন, যাতে পথে বিপদ না ঘটে।

যা দেখলাম তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। গ্রামের পর গ্রাম যেন শ্মশান। কদাচিৎ কোন জায়গায় আমাদের হিন্দু দেখে এক আধজন বৃদ্ধা বেরিয়ে আসত এবং নোয়াখালির ভাষায় বলত, গুণ্ডারা বলে দিয়েছে, "কিছু কইবা তো কাইট্টা ফালামু।" কোন কোন মহিলার কাছে শুনতাম, তাঁর মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরকরণ করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে মুসলমানের সঙ্গে, নিজেদের ওপর অত্যাচার সম্বন্ধে তারা বিশেষ কিছু বলতে চাইত না। নিরাপত্তাই তখন ওদের কাছে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল।

রাস্তায় ইব্রাহিমপুর পড়ল। নদীর ধারে সুন্দর একটা স্কুলবাড়ী কোন হিন্দু জমিদার তৈরী করেছিলেন বাড়ীটা, বোধ হয় অল্প দিন আগে। আশে পাশের গ্রাম থেকে কয়েক শ মহিলা এবং শিশু এখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের সঙ্গে সামান্য যা জিনিস ছিল, তা থেকেই কিছুটা রেখে গেলাম এদের জন্য।

রাতের দিকে পৌঁছলাম একটা গ্রামে। মোটামুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নামটা এখন আমি ভুলে গেছি। রেডক্রস-এর একটা দুধের কেন্দ্র আছে এখানে। গোটা গ্রামটা যেন শ্মশান। অধিকাংশ হিন্দু পালিয়ে গেছে। জ্যোৎস্না থৈ থৈ করছে, জ্যোৎস্না-স্নাত নারকেল পাতা হাওয়ায় দুলছে। স্বাভাবিক সময় হলে মুগ্ধ হতাম এই দৃশ্যে। সন্ধ্যার আকাশে ধ্বনিত হল নমাজের

আজান ও আল্লা হো আকবর। ছড়িয়ে গেল অর্ধ শূন্য গ্রামের বুকে। আমাদের যেন রক্ত হিম হয়ে গেল।

ভোর বেলা আবার চলা শুরু, এলাম হাইমচরে। বেশ বড় গঞ্জ ছিল হাইমচর। গোটা গঞ্জটা এখন শুধু পোড়া ছাই আর অঙ্গার। এক জায়গায় পড়েছিল ভাঙ্গা একটা লোহার সিন্দুক। এক দিন হয়ত এতে থাকত কত সম্পদ। কাছেই পড়ে ছিল একটা নরমুণ্ড। এখানে সেখানে পড়ে ছিল আরো অনেক। আশে পাশে মানুষ ছিল না কোন।

আমরা ফিরলাম। বুঝলাম, কাজ সামান্য নয়—এর মোকাবিলা করা কঠিন। শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে ত্রাণকার্য চলছিল তার সঙ্গে কাজ করতে পারলে বরং কিছু করা যায়। সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থার কাজও চলছিল সুচেতা কৃপালনীর মারফৎ। মুসলিম লীগ সরকার সরাসরি বিশেষ কোন সাহায্য বন্টন করেননি।

আমরা চাঁদপুরে ফিরে এলাম। মনোভাব অনুকূল নয়। এই পরি-প্রেক্ষিতে আমাদের পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে হয়।

চাঁদপুরে একটা বড় আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল। বহু মহিলা আশ্রয় নিয়েছিলেন এই শিবিরে। পুরুষরা ছিল আলাদা শিবিরে। মণিকুন্তলা এবং মায়া এই ক্যাম্পে কাজ আরম্ভ করেন।

দাঙ্গায় নোয়াখালি প্রথমও নয় শেষও নয়।

নোয়াখালির মত বীভৎস দাঙ্গা হল বিহারেও। সেখানে সংখ্যাগুরু ছিল হিন্দুরা। তারা নোয়াখালির রক্তাক্ত প্রতিশোধ নিল বিহারে। দাঙ্গা বাঁধল বোম্বেতেও। এবং এখানে সেখানে থেকে থেকে চলতে থাকল ১৯৪৭ এর মাঝামাঝি অবধি। এই দাঙ্গার আওয়াজ ছিল "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।" সর্বত্র ভুগল সংখ্যালঘুরাই। বৃটিশ সরকার বেশ নিপুণভাবেই তাদের মতলব হাসিল করতে লাগলেন।

তারপর এল ১৯৪৭-এর ১৫ই অগাষ্ট আমাদের স্বাধীনতার দিন। কিন্তু এ দিনটি এল দেশ ভাগের দুঃখ-যন্ত্রণা আর কান্না ভেজা পথে। পাঞ্জাবেও প্রচণ্ড দাঙ্গা বাঁধল। শুধু লুঠতরাজ আর হত্যা নয়—গেল অসংখ্য নারীর ইজ্জৎ, নারী হরণ, জোর করে নিকা চলল নির্বাধা ও পাইকারী হারে। পাকিস্তানে অশেষ দুর্গতি হল হিন্দুদের। চলতে লাগল দেশত্যাগ। ভারতেও সমান দুর্গতি হল মুসলমানদের।

কিন্তু পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের অন্যান্য অংশে কোটি কোটি মুসলমান স্বেচ্ছায় থেকে গেলেন। পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুরা প্রায় সব চলে গেল ভারতে। পূর্ব পাকিস্তানেও খুন, জখম, বলাৎকার, বাড়ীতে আগুন দেওয়া, জোর করে ধর্মান্তর ইত্যাদি অবাধে চলতে থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ হিন্দু ওখানে রয়ে গেল এই আশায় বুক বেঁধে যে কোন মতে বাপ পিতামহর মাটিতে হয়ত তারা মুখ গুঁজে থাকতে পারবে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলা থেকে দলে দলে মুসলমান আসতে থাকল পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান এই দুই অংশের পাঞ্জাবে একজনও অহিন্দু বা অমুসলমান রইল না।

গান্ধীজী কলকাতায় এলেন। মুসলিম লীগ মুখ্যমন্ত্রী শাহীদ সুহরাওয়ার্দি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। শান্তি সেনা নামে একটি বৃহৎ শান্তি দল গঠন করা হল। অনেক মেয়েরাও ছিল এই দলে।

ভাই ভাই মন্ত্রে ভেসে গেল কলকাতা। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ল যে সমস্ত জেলাগুলির ভাগ অমীমাংসিত ছিল এবং র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার মীমাংসার প্রতীক্ষায় ছিল, সেগুলোর ওপর।

১৯৪৭-এর ১লা থেকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃহত্তম শান্তি সংগ্রাম হল দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে। কলকাতা কেঁপে উঠল সেই লড়াইয়ে। গান্ধীজী উপোস করলেন। সর্বসাধারণের দাঙ্গা-বিরোধী ক্রোধ এবং গান্ধীজীর উপবাসে মিলে যে শক্তির সৃষ্টি হল, তাতে দাঙ্গাবাজদের হাতিয়ার ভোঁতা হয়ে গেল। এই লড়াইয়ে কম্যুনিস্ট ছেলে ও মেয়েদের অবদানও কম ছিল না।

১০,০০০ শান্তি সেনা কলকাতায়। কেউ গড়েনি এই বাহিনী। মানুষ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে, কলকাতার সব মহল থেকে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হতে, শ্রমিক মহল আর মহিলা সংগঠনগুলি হতে। বিরাট শোভাযাত্রা বেরোল বেলেঘাটায় (যেখানে গান্ধীজী ছিলেন) ও অন্যান্য দাঙ্গা আক্রান্ত এলাকায় সন্ত্রস্ত মানুষদের সাহস দিতে, আশ্বাস দিতে ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সেতু বাঁধতে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ছেলে এবং মেয়ে স্বেচ্ছাসেবকরাও দলে দলে যোগ দিল সেই শোভাযাত্রায়।

আবহাওয়া কিছু শান্ত হলে মহাত্মাজী ফিরে গেলেন। যাবার সময় প্রশংসা করলেন শান্তি সেনার। হিন্দু মুসলিম সমঝোতার জন্য বীরের মত লড়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

১৯৪৭-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর কলকাতার ময়দানে শান্তি সেনার একটি কুচ্‌ কাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অভূতপূর্ব সেই কুচ-কাওয়াজ। ৫,000 হিন্দু মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক, মেয়ে-ছেলের অতি সুশৃংখল সমাবেশ। কিন্তু কলকাতায় যা সম্ভব হল, সম্ভব হল না তা পশ্চিমে। পশ্চিম সীমান্তের দুই দিকেই পাকিস্তান এবং ভারতে আবার বাঁধল দাঙ্গা—সেই বীভৎসতা আর বর্বরতা। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাঞ্জাব চলে গেল দাঙ্গাবাজদের হাতে। দিল্লীতেও বেঁধে উঠল গোলমাল, কিন্তু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু তা থামালেন সামরিক বাহিনীর সাহায্যে।

১৯৪৭-এর অক্টোবরের শেষ নাগাদ শান্তি সেনার মেয়েরা—যার মধ্যে বহু কম্যুনিস্ট মেয়েও ছিল—একটা ভারী সুন্দর কাজ করল। পূজোয় তারা মুসলমান মেয়েদের নিমন্ত্রণ করল এবং ঈদে হিন্দুদের। হিন্দু-মুসলমানের অন্তরের ভাঙ্গা সেতু এই অমৃত-স্পর্শে আবার জোড়া লাগতে লাগল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মোহভঙ্গ ও সংগ্রাম

স্বাধীনতা এল। মানুষের মনে, মেয়েদের মনেও আশা জাগল, এবার তাদের দুঃখের রাত ভোর হল। যে মর্মন্তুদ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে ওরা এতদিন এল, তার শেষ হবে, শিক্ষা মিলবে, রোগে ওষুধ মিলবে, অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়ের সংস্থান সহজতর হবে।

কিন্তু দিন যেতে লাগল—মোহ ভঙ্গ হতে লাগল। শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের সংগ্রামে জনগণের অসন্তোষ প্রকাশ হতে লাগল।

১৯৪৮ সালে কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনটি প্রাদেশিক হলেও তা প্রায় সর্বভারতীয় সম্মেলনের মতই হল। পাকিস্তান থেকে একজন মহিলা প্রতিনিধি এলেন। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্তা সুষমা সেনগুপ্তা সভানেত্রীত্ব করলেন।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নানা আন্দোলন ও কাজের একটি প্রতিবেদন পেশ করা হল। জনগণের নানা সংগ্রাম চলছিল চার দিকে; তা দাবাবার জন্য চলছিল দমন নীতি। সম্মেলন এই দমন-নীতির নিন্দা করে।

দেশ ভাগের ফলে দলে দলে মানুষ চলে আসছিল নতুন-গড়া পাকিস্তান থেকে। বঙ্গদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীর পক্ষে এই বাস্তুহারা সমস্যাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। যারা সব কিছু পেছনে ফেলে আসছে তাদের আশ্রয় দিয়ে খাদ্য দিয়ে বাঁচাতে হবে। কিন্তু আমলাতন্ত্র আশ্চর্য উদাসীন। প্রতিপদে লড়তে হচ্ছিল এই নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে, বাস্তুহারারা নিজেরাও করছিলেন সংগ্রাম। মহিলারা ছিলেন এই সংগ্রামের পুরোভাগে। সম্মেলনে এই বিষয়ের ওপরে একটি প্রস্তাব গৃহীত হলে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

আরো কতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হল—শিক্ষা, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা, শহরে গ্রামে বাসগৃহ, এবং মাতৃ ও শিশু কল্যাণ ব্যবস্থার প্রসার ইত্যাদি নিয়ে। এইগুলিই মেয়েদের পক্ষে বেশী প্রয়োজন এবং এরই জন্য স্বাধীন ভারতের কাছে তাদের বেশী প্রত্যাশা। কিন্তু এ প্রত্যাশা দুরাশা হল। কারণ দমন নীতির দাপটে আন্দোলনকারীদের বিনা ওয়ারেন্টে ধর-পাকড় ও বিনা বিচার আটক চলছিল দারুণ ভাবে।

১৯৪৮-এর ২৬ শে মে ৮০ জন মহিলা মিছিল করে রাইটার্স বিল্ডিংএ যায়। তাদের দাবী ছিল রাজনৈতিক ও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি। এই ৮০টি মহিলার মোকাবিলা করবার জন্য ছুটে এল পুলিশের গাড়ী, বেতারের গাড়ী, খোলা বন্দুক হাতে সার্জেন্ট আর এক দঙ্গল পুলিশ আর সওয়ারী পুলিশ। মেয়েরা বসে পড়ল রাস্তায়। রাইটার্স বিল্ডিং এর দপ্তরগুলি থেকে বেরিয়ে এল হাজারো মানুষ। সমস্ত এলাকাটা রাগে যেন অগ্নিবর্ণ হয়ে গেল। এদের পেছনে ধাওয়া করল পুলিশ। হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী কিরণ শঙ্কর রায়। তিনি ওই মেয়েদের এবং নেতৃস্থানীয় যারা ওখানে উপস্থিত আছে সবাইকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন। লাঠি চার্জ আরম্ভ হল, বন্দুকের কুঁদোর গুতো খেল এক কিসান মহিলা। একজন পুরুষ ওকে জল দিতে গেলে সে গ্রেপ্তার হল।

এরপর কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে লাগল পুলিশ। মেয়েদের চোখে লাগল। সমবেত জনতা থেকে মানুষ এসে জল দিল মহিলাদের। কাঁদুনে গ্যাস সহ্য করেও এক চুল নড়ল না মেয়েরা। সন্ধ্যে ৭.৩০ এলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রী কে, পি চট্টোপাধ্যায়। তিনি কথা দিলেন যে ব্যাপারটা নিয়ে তিনি কথা বলবেন সরকারের সঙ্গে। তখন মেয়েরা মিছিল করে ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল। এই বিক্ষোভের নেত্রীদের গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। এদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। সেই রাতেই আমি গা ঢাকা দিলাম।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। নেত্রীরা হয় জেলে গেল, নয় আত্মগোপন করল। সভানেত্রী মঞ্জুশ্রী দেবী (রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী) যিনি কোন রাজনৈতিক দলে ছিলেন না, তাঁকেও জেলে ঠেলে দেওয়া হল। সমিতির মুখপত্র 'ঘরে বাইরে' বাজেয়াপ্ত হল।

এবারে বেরিয়ে এলেন বিনা বিচারে বন্দীদের মায়েরা। নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গড়লেন "মাতৃসমিতি।" এরা সবাই বর্ষীয়সী, গৃহের বাইরে কোন

কর্মক্ষেত্র ছিল না এদের। দলে দলে ছেলেমেয়ে হয় জেলে যাচ্ছে নয় গা ঢাকা দিয়ে কোন দুঃখের বিবরে দিন কাটাচ্ছে কে জানে। মায়েদের বুক ফেটে যেতে লাগল। মর্মস্পর্শী ভাষায় চিঠি লিখলেন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে। এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকলেন।

১৯৪৯ এর ২৭ শে এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ডাক দিল—বিনা বিচারে আটকের প্রতিবাদে ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবীতে এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের। ভারত সমিতির হলে সভা হল। সভার পরে মেয়েরা বেরোলেন মিছিল করে। পূবদিকে চলল মিছিল। কলেজ ষ্ট্রীট বৌবাজারের মোড়ও তখনও পৌঁছায়নি মিছিল। হঠাৎ শোনা গেল গুলির শব্দ। ধোঁয়ায় সব কালো হয়ে গেল। তারই মধ্যে দেখা গেল কারা যেন পড়ে গেল বন্দুকের গুলিতে। ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে দেহগুলি থেকে। লতিকা সেনের দেহটা নিয়ে আসা হল একটা দোকানে। মহিলা-আত্মরক্ষা সমিতির অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী। একা লতিকা নন, গুলির ঘায়ে পড়েছে সমিতির অক্লান্ত কর্মী প্রতিভা, সেবিকা গীতা, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে অমিয়াও। কংগ্রেসী পুলিশের গুলিতে মরল চারটি কাঁচা প্রাণ। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মেয়েদের এমন ঠাণ্ডা রক্তে খুন এর আগে আর হয়নি কলকাতার বুকে। এদের অপরাধ এরা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চেয়েছিল।

অনেক বাধা নিষেধের মধ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলন হল কলকাতায় ১৯৪৯-এর ১৮-২২ তারিখে।

প্রস্তুতির পর্বে প্রচণ্ড বাধা দিয়েছে পুলিশ যাতে সম্মেলন হতে না পারে। দিনের মধ্যে তিন চারবার তারা আসত সমিতির অফিসে। মহিলা কর্মীদের ওপর নজর রাখত, বাড়ীঘর খানা তল্লাসী করত। অফিসের সামনে সর্বক্ষণ একটা বন্দী-গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত। শিশুটি সমেত গ্রেপ্তার হলেন সম্পাদিকা।

কিন্তু বন্ধ হয়নি সম্মেলন। অন্যবারের মত জাঁক-জমক-জুলুষ করা হয়নি অবশ্য। হয়েছে—লোকে বলে গেরিলা ধরনে। শহরের বুকের ওপরেই হল সম্মেলন। গোপনে আনা হল প্রতিনিধিদের। দু দিনই এলেন তাঁরা—এমন কি যাঁদের পেছনে হুলিয়া ছিল তাঁরাও আলোচনা করলেন আন্দোলনের ও সংগঠনের নানা সমস্যা নিয়ে। সম্মেলনে এসেছিলেন কৃষক ও শ্রমিক মহিলারাও। তাঁদের জ্ঞাতব্য ছিল—কি করে তাঁরা ফসলের ন্যায্য ভাগ পাবার

সংগ্রামে, পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সামাজিক অধিকারের আর গণতান্ত্রিক অধিকার পাওয়ার সংগ্রামে সামিল হবেন। শুধু তাই নয়, এঁরা লড়তে চান সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্তকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব শান্তিকে জোরদার করতেও।

সম্মেলনের প্রধান বক্তব্য ছিল সমস্ত রকম শোষণের এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মহিলাদের সংগ্রাম। এই সরকার ধনী এবং কায়েমী স্বার্থের পোষক। তাই লড়তে হবে এই সরকারের বিরুদ্ধে। পরিবর্তন করতে হবে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর যার মধ্যে কায়েমী স্বার্থ আর ধনীদের প্রাধান্য রয়েছে বলে নারী সমাজ শোষিত, নিপীড়িত; বিবাহে, শিক্ষায়, সমাজে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার স্থান গৌণ। এই অবস্থা থেকে মুক্তি চাই; চাই নারী জাতির সম্পূর্ণ মুক্তি—তার জন্য নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

মেয়েদের এই হীন অবস্থার উন্নতির জন্য চাই বিনা শুল্কে প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, বালিকাদের জন্য নিঃশুল্ক শিক্ষা; চাই বিবাহে, পরিবারে, সমাজে, কর্মে নারীর পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার। সমান কাজের জন্য সমান মজুরী, পর্দা প্রথার বিলোপ ইত্যাদি।

আরো চাই কাজ থেকে বিবাহিতা মেয়েদের ছাঁটাই করা চলবে না, চাই প্রসূতি কল্যাণ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, প্রসব-পূর্ব এবং প্রসবোত্তর চিকিৎসা ব্যবস্থা, তিন মাসের প্রসূতি ছুটি, ভাতা ইত্যাদি, চাই ক্রেশের ব্যবস্থা, শ্রমিক ও কর্মীদের এবং বেকারদের পরিবারের নিঃশুল্ক চিকিৎসা ব্যবস্থা; সর্দারদের ও মালিকের অত্যাচার থেকে মেয়ে শ্রমিকদের রক্ষা-ব্যবস্থা। এর সঙ্গে চাই মায়েদের জন্য এমন ব্যবস্থা যাতে তারা শিশু সন্তানদের কাজে লাগাতে বাধ্য না হয়। এই সব দাবী রাখা হয় সম্মেলনে।

এর কতগুলি পরে মেনে নেওয়া হয়েছে, কতগুলো বাকী আছে।

প্রতিবেদনে আমেরিকা প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়। এরা যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করছে দুনিয়ার মেহনতী মানুষের পথ দ্রষ্টা সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেও। দুনিয়ার মেয়েরা, তাদের দেহের রক্ত দিয়ে গড়া সন্তানদের আর যুদ্ধের শিকার হতে দেবেননা এ সংকল্প সম্মেলনে উপস্থিত মায়েদেরও।

শান্তি সম্মেলন করা হয় নানা এলাকায়—শ্রমিক বসতির ধারে কাছে,

বস্তিতে, পল্লীতে। এবং "শান্তির কাজে মায়েরা" বলে একটি পুস্তিকা বের করা হয়, এ সব শান্তির কাজে মহিলাদের প্রচেষ্টার পরিচয়।

এই সময়, কলে-কারখানায়, গ্রামে গ্রামে মেয়েদের দুর্দান্ত লড়াই করতে হয়। ১৯৪৮-এ ২৪ পরগণার ডোঙ্গাজোড়া গ্রামে কালোবাজারীরা রাতের আঁধারে ধান পাচার করার চেষ্টা করে; চাষীরা তা ধরে ফেলে এবং দাবী করে যে ঐ ধান গরীব আর অনাহারক্লিষ্টদের মধ্যে বিলি করে দিতে হবে। তা তো দেওয়া হয়ই না, উপরন্তু পুলিশ আসে এবং গুলি চালাতে আরম্ভ করে। সামনের সারিতে ছিল মেয়েরা। দুজন তক্ষুণি মারা যায়।

১৯৪৮-এর অক্টোবর মাসে, কাকদ্বীপ থানার চন্দনপুরী গ্রামে পুলিশ এসে বাড়ী বাড়ী গিয়ে মারধোর এবং ধরপাকড় চালায়। সহ্য হয়না মেয়েদের, তারা চারদিক থেকে ছুটে আসে। লড়াইয়ে জমিদারের কিছু লোক আঘাত পায়। তারা পুলিশের সাহায্য চায়। পুলিশ গুলি চালায়। একজন বৃদ্ধ কৃষক মারা যায়। সরোজিনী ছুটে এসে বন্দুকের মুখ চেপে ধরে। পেছন থেকে আর একটি গুলি লেগে তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। তারপর গুলির ঘায়ে একে একে মরে উত্তমা, বাতাসী, গর্ভবতী অহল্যা, সূর্যমণি আর নরেনের বৌ। জখম হয় জন বিশেক মহিলা। এর পর পুলিশ বাড়ী বাড়ী ঢুকে অকথ্য অত্যাচার চালায়। মহিলারা কেবল সাহসের পরিচয়ই দেয়নি, তারা সংগঠনের পরিচয়ও দিয়েছে। ছয়টি বোনের রক্ত এবং আরো ছয় জনের ওপর পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্য লোহার মত শক্ত করে দিল মেয়েদের সংকল্প।

১৯৪৮-এর ৩১শে অক্টোবর আর একটি সংঘর্ষ হয় কাকদ্বীপেরই বুধখালি গ্রামে। চাষীরা ধান কেটে নিজেদের মরাই-এ তোলে। জমিদারের লোকেরা পুলিশ ডাকে। সশস্ত্র পুলিশ এসে কৃষকনেতা কুমার সাহুকে গ্রেপ্তার করে। আশ পাশের গ্রাম থেকে মানুষ জন এসে জড় হয়। মেয়েরাই সংখ্যায় বেশী। তারা পুলিশকে ঘেরাও করে চোখে ধুলো দিতে আরম্ভ করে। পুলিশ গুলি চালায়। দু জন পুরুষ মারা যায় এবং বহু মেয়ে আহত হয়। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি বা মৃতদেহ বা আহতদের কাউকে নিয়ে যেতে পারেনি।

হুগলির দুবিরভেরী গাঁয়ে কৃষকরা জমি-বন্টন এবং তে-ভাগা নিয়ে আন্দোলন করছিল। জমিদারের ডাকে পুলিশ আসে। গ্রামে ঢুকতেই

মেয়েরা তাদের ঘেরাও করে জিজ্ঞাসা করে—কেন তারা তাদের পেছনে লাগতে আসছে। পুলিশ চালাকী করে ওদের কাছে জল খেতে চায়, প্রতিজ্ঞা করে যে গ্রামে ঢুকবে না, মেয়েরা ওদের বিশ্বাস করে যেই জল আনতে যাচ্ছে, ওরা গুলি চালায়। ছয় জন মহিলা মারা পড়ে।

১৯৪৮-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী হাওড়ার মাশিনা গ্রামে চলছিল তেভাগা আন্দোলন। যথারীতি পুলিশ আসে—চারজন কিষান মেয়েকে গুলি করে মারে—এদের মধ্যে ছিল নতুন বিয়ে-হওয়া চৌদ্দ বছরের মেয়ে মনোরমা। সাঁকরাইলের হাটাল গাঁয়ে ১০ জন মেয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যায়। গর্ভবতী মেয়ে সুধাবালাও বাদ পড়েনি। মাথায় বন্দুকের কুঁদোর আঘাত পেয়ে মারা যায় দশ বছরের মেয়ে যশোদাময়ীও।

চালের দাম আকাশ ছুঁই ছুঁই। ওদিকে জমিদার সাজছেন চাষীর হাত থেকে চাল কেড়ে নিতে। চাল নিয়ে গেলে বৌ-ছেলে মেয়ে খাবে কি? জীবন দিয়ে সবাই রুখবে এই ষড়যন্ত্র। মেয়েরা লড়ল অপরিসীম সাহসে। এই ত্রাসের আবহাওয়ার মধ্যেও হাটালে হল মহিলা সম্মেলন। এমনি সাহস এবং দৃঢ়তা ছিল সংগ্রামী মেয়েদের।

মেদিনীপুরেও অমনি সাহস আর শক্তি দিয়ে লড়ল মেয়ে আর পুরুষেরা। বেপরোয়া গ্রেপ্তার হল তারা, গুলি চলল, বেয়নেট চলল তাদের উপর। ধরতে এলে পুরুষদের না পেলে মেয়েদের টেনে নিয়ে যেত থানায়।

শ্রমিক সংগ্রামও তীব্র হল এই পর্বে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের অধিকার অর্জনের লড়াই। চা বাগানে মেয়ে শ্রমিক ছিল প্রায় ৪৫ শতাংশ। চায়ের পাতা তুলত এরা—মজুরী দৈনিক কাজের হারে। কোনখানে এই হার ছিল ১৪ পাউণ্ড পাতা তোলা, কোথাও ২৮, কোথাও আবার ছিল ৪০ পাউণ্ড। শোষণ এখানেই শেষ নয়—কাঁচা ভেজা পাতার ছাড় কাটা হত ১০।১২ পাউণ্ড। রোদে জলে কাজ করে অসুখও লেগে থাকত মেয়েদের। কামাই হত প্রচুর। কাট-ছাঁট গিয়ে মাসে ঘরে আসে সামান্য টাকা। মজুরীও ছিল পুরুষের চেয়ে কম। অন্ধকার থাকতে উঠে ছেলে-মেয়েদের জন্য ডাল ভাত রান্না করে, নিজেরা মালিকের ফেলে দেওয়া চায়ের পাতার ঝড়তি পড়তি সেদ্ধ করে কোনমতে গিলে, কোলের শিশুটিকে পিঠে বেঁধে শ্রমিক মেয়েরা ছুটত কাজে। সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫-৩০ পর্যন্ত কাজ, মাঝে একঘণ্টা খাবার ছুটি। খাটুনি হাড়-ভাঙ্গা। তখনও সংগঠিত

হয়নি এরা। তবুও মাঝে মাঝে চলত লড়াই—মজুরী বাড়াবার, রেশন বাড়াবার লড়াই। ম্যানেজারকে ঘেরাও করত মাঝে মাঝে এরা।

ডান্‌কান ব্রাদার্সের ডেঙ্গুয়াঝড় চা বাগানে কাজ করে মাইলী ছত্রী। ১৯৪৬ সনে ইউনিয়ন গড়ল মাইলী। এর দুমাস পরেই পুলিশ ডাকল মালিক। তাদের গুলিতে ঘায়েল তিনজন শ্রমিক। মাইলী হাজার মেয়ের মিছিল নিয়ে এল শহরে এর প্রতিবাদে। দাবী আদায়ের লড়াইয়ের সময় মাঝে মাঝে শহরে মিছিল নিয়ে আসত মাইলী।

কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হল মাইলীর বিরুদ্ধে। মাইলী গা ঢাকা দিল জঙ্গলে। তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। অনাহারে অনিদ্রায় হিংস্র জন্তু-সংকুল জঙ্গলের দারুণ কষ্টের মধ্যেও সে তার বাগানের ১৮০০ শ্রমিক মেয়েকে তাদের সংগ্রামে সমানে নেতৃত্ব দিয়ে চলল। কিন্তু এ কষ্ট বেশীদিন সইল না আসন্ন-প্রসবা মাইলীর। পুলিশ তার নাগাল পায়নি, কিন্তু মরণ তাকে ছাড়ল না। চলে গেল লোহার মেয়ে মাইলী—শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি আর দৃঢ়তার প্রতীক।

বঙ্গদেশের বাউরিয়া পাটকলের কর্মী বিজয় ছাঁটাই হল। একসঙ্গে রুখে দাঁড়াল যত পাটকলের পুরুষ ও মেয়ে শ্রমিক। বিজয় তাদের নেতা। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য শয়ে শয়ে পুলিশ আর মিলিটারী ঘিরে ফেলল মিল। মেয়ে শ্রমিকেরা বেরিয়ে এল দলে দলে—পুলিশকে হেঁকে বলল, দেখব তোমরা বিজয়কে কি করে ঢুকতে না দাও। তারা ঘিরে রইল বিজয়কে। ১১ দিন সমানে তারা বিজয়কে অমনি করে ঘিরে ভেতরে নিয়ে গেল আর নিরাপদে বাইরে নিয়ে এল। ১১ দিন পরে কর্তৃপক্ষ লক-আউট ঘোষণা করল। এই মিলের মেয়ে কর্মীদের সাহসের কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এবারে চেঙ্গাইল, বাউরিয়া, বজবজ ও কামারহাটির মিলে আরম্ভ হল ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে, সপ্তাহে একদিন ছুটি আর বোনাসের দাবীতে লড়াই। এইসব মিলের শ্রমিক মেয়েরা ঘেরাও করল ম্যানেজারকে। জগদ্দলের আতপুরে আর বজবজে যুক্ত সম্মেলন হল ইউনিয়নগুলির। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও এই সম্মেলনে যোগ দেয়। সাধারণভাবে সর্বস্তরের মহিলাদের সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে নারী শ্রমিকদের সংগ্রামকেও সমর্থন করার এবং সর্বরকম শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দেয় তারা।

বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস-এর ৩৫০ মহিলা শ্রমিক সবসময় সকল রকম

আন্দোলনের পুরোভাগে থাকতেন। ১৯৪৬ সনে তাঁরা মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে গেট পিকেটিং করে লাঠি এবং কাঁদুনে গ্যাসের সম্মুখীন হন।

১৯৪৮-এ বিনা বিচারে আটক আইন পাশ হলে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। বহু পটারী শ্রমিক গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর কারখানায় লক-আউট ঘোষিত হয়। ৯ ই আগষ্ট কারখানার গেটে পিকেটিং হয়। মেয়েরাই করছিল পিকেটিং। তাদের ওপর লাঠিচার্জ হয় কিন্তু মেয়েরা ভয় পাবার নয়। ছয়মাস এই ধর্মঘট চলে।

আসানসোলে মেথর ধর্মঘটের সময়, মেয়েরা সাহসের সঙ্গে লড়াই করে। তারা পুলিশের হাত থেকে তাদের নেত্রী নলিনী দেবীকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে, এবং কয়েকদিন পর্যন্ত তাকে পাহারা দিয়ে রাখে।

নিরীহ কৃষক মেয়েরা যে প্রচণ্ড সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দেয়—এই পর্বে শ্রমিক মেয়েরাও তেমনি সাহস, তেমনি সংগ্রামী হয়ে তাদের লড়াই চালিয়ে যান।

জিনিসপত্রের দাম উঠছিল হু হু করে—বেকারী, পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষদের ছাঁটাই—ইত্যাদিতে দুর্দশার অন্ত ছিল না মধ্যবিত্ত মহিলাদেরও। তাই পথে বের হতে হল তাদের। ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে, রেশন-ব্যবস্থা আরো বাড়ান হোক, এই দাবী নিয়ে মিছিল করে গেলেন তাঁরা রাইটার্স বিল্ডিং-এ। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু দেখলেন জনতার বিপুল সমর্থন রয়েছে শোভাযাত্রীদের পেছনে। নেমে এলেন তিনি—কথা দিলেন মেয়েদের দাবী পূরণ করা হবে।

কিন্তু হল না কিছুই। ইতিমধ্যে চিনি উধাও হতে লাগল বাজার থেকে। মহিলারা গিয়ে ঘেরাও করলেন বড়বাজারের পাইকারী চিনি-ব্যবসায়ীদের চিনির আড়তগুলি। এল পুলিশ, চলল লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাস। মহিলারা পা বাড়ালেন, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর দিকে। এই বর্বরোচিত পুলিশী ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। আবার লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাস। পরের দিন পুলিশ কমিশনার বললেন, কালো-বাজারীদের ধরার তাঁর কোন ক্ষমতা নেই।

শুধু তাই নয়—সংগ্রাম চলছিল আরো বহু স্তরে—নার্স, শিক্ষিকা, উদ্বাস্তু মহিলাদেরও। সেইজন্য মঃ আঃ রঃ সঃ-র পঞ্চম সম্মেলনের প্রতিবেদনের নাম হয় "সংগ্রামী মেয়েদের ডাক।"

নতুন চেতনার উন্মেষ হচ্ছিল মহিলাদের মধ্যে। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন এই শোষণ, নিপীড়ন, পিষে-ফেলা দারিদ্র্য, বেকারী, অনশন, অর্ধাশনের দুঃসহ জীবন—তা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন জীবন পেতে হলে লড়তে হবে—নারী-পুরুষের মিলিত লড়াই। শোষণ-পেষণহীন সেই জীবন দিতে পারে শুধু সেই সমাজ যা কায়েমী স্বার্থ আর ধনীর সমাজ নয়—দিতে পারে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা কয়েমী স্বার্থ আর ধনীর রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়। অতএব লড়তে হবে এই শোষণের সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো বদলাবার জন্য।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলনে সভানেত্রী নির্বাচিত হন শ্রীযুক্তা মঞ্জুশ্রী দেবী। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী, যিনি তখনও জেলে ছিলেন। এবং রেণু চক্রবর্তী তখনও আত্মগোপন করে থাকায়, শ্রমিক মহিলা—উমা দেবী সম্পাদিকা নির্বাচিতা হন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তেলেঙ্গানার অমর কাহিনী

১৯৪৭-এ দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিপুল গণ আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গেল। এই সব আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের বিলোপ, এবং স্বাধীন রাজ্যগুলির ভারতের সাথে যুক্ত হওয়া। ওই বছরই নভেম্বর মাসে জুনাগড় যুক্ত হল ভারতের সঙ্গে। মহীশূর এবং গোয়ালিয়রে "প্রজা-মণ্ডলের" আন্দোলন তীব্র হল। এর পর পালা এল কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কুরের। বৃহত্তম রাজ্য হায়দ্রাবাদ আর দুর্ধর্ষ তার নিজাম—তাই "রাজ্য গণ-সম্মেলনকে" লড়তে হচ্ছিল জান কবুল করে। কিন্তু একা লড়তে হয়নি তাদের। অন্ধ্র মহাসভার মারফৎ তাদের মদত দিয়েছিল কম্যুনিস্ট পার্টির পুরুষ ও মেয়েরা।

অন্ধ্র মহাসভা এতদিন তেলেঙ্গানা এলাকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দী মুক্তি, ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহ, সেনা বাহিনী ও বিমান বাহিনীর মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষ, ডাক-তার ধর্মঘট প্রভৃতিকে অবলম্বন করে যুদ্ধোত্তর পর্বের বিরাট বিরাট গণ-বিক্ষোভ দেশীয় রাজ্যগুলোর মানুষকেও দারুণভাবে নাড়া দিয়ে গেল। এবং অন্ধ্র মহাসভাও তার ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে একটি গণ-সংগঠনে পরিণত হয়ে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও রাজ্যের ভারত ভুক্তির জন্য আন্দোলনে নামল।

হায়দ্রাবাদে ১৭টি জেলা, লোক সংখ্যা এক-কোটি সত্তর লক্ষ। চল্লিশ শতাংশ জমি সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের হাতে। এদের কতকগুলির নিজস্ব ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, আদালত এবং জেল ছিল। চরমতম নিপীড়ন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অবাধ ছিল এসব জায়গায়। বাকী ৬০ শতাংশ জমির চাষীদের সরাসরি নিজামের অধীনে থাকার কথা; এবং কোন সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবকাশ থাকার কথা নয়, কিন্তু ছিল। দেশমুখ এবং দেশ পাণ্ডে নামে দুটি ভুঁই-ফোঁড় সম্প্রদায় রাজা এবং প্রজার মধ্যে মধ্য-স্বত্ব-

ভোগী হয়ে দাঁড়ায়। এদের কাজ রাজার হয়ে খাজনা আদায় করা। ব্যক্তি-গত ব্যবহারের জন্য এরা জমি পেত, বৃত্তি পেত। তা সত্ত্বেও দেশমুখরা গায়ের জোরে বহু সরকারী এবং রায়তী জমি বেআইনীভাবে দখল করে। তারা এই জমি অংশতঃ চাষীদের দিয়ে বেগারে চাষ করিয়ে নিত। বাকী জমি চাষীদের কাছে বন্দোবস্তে দিত এবং উচ্চ হারে কর আদায় করত।

আইনী, বে-আইনী, দুরকম জমির চাষীদের ওপরেই নিষ্ঠুর অত্যাচার চলত। অত্যধিক খাজনা, বেগার, মার-পিঠ, খুন-জখম চলত অবাধে। তাছাড়াও ছিল, জঙ্গলে গরু মোষ চরাবার অজুহাতে বে-আইনী মাশুল আদায়; চাষের যন্ত্র-পাতি, এমন কি ঘরকন্নার তৈজস ব্যবহারের নাম করেও বেচারা চাষীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা হত। শুধু যে ক্ষেতমজুরদের দিয়েই বেগার খাটিয়ে নেওয়া হত তা নয়। চাষী, ধোপা, নাপিত সকলকেই সামান্য মজুরী নিয়ে ঐভাবে খাটতে হত। এছাড়াও, সরকারী আমলারা যখন আসতেন, তখন সবাইকে বেগার দিতে হত।

নিজামের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। সভা সমিতি আন্দোলন নিষিদ্ধ ছিল। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান একটিও ছিল না। ভারতে বৃটিশ সরকারের অনুমোদিত সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতেও কোন নির্বাচন ছিল না। সংক্ষেপে নিজামের শাসন ছিল নির্ভেজাল স্বৈরতন্ত্রী।

সাধারণভাবে কেউই নিজামের শাসন পছন্দ করত না। সকলেই মনে প্রাণে এর অবসান চাইত। ১৯৩৮ সনে রাজ্য গণ-সম্মেলনের সংগঠিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়ে গণ-সংগ্রামের শুরু। কোন কোন জায়গায় শ্রমিক ধর্মঘট হয়। যে অমানুষিক অত্যাচার চলে মাচিরেড্ডী পল্লী এবং আখনুরের চাষীদের ওপর তাতে সমগ্র রাজ্যে ক্রোধ আর ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। চাষীরা বে-আইনী ধান লুটের প্রতিবাদ করায় নিজামের সশস্ত্র পুলিশ চাষীদের ওপর যে অত্যাচার, নারী ধর্ষণাদি চালায় তা এতই বর্বর ও অমানুষিক যে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর মত মানুষ বিচলিত হয়ে অকুস্থলে যান। সারা রাজ্যের মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ওদিকে জনগাঁওয়ে ঘটল আর এক ঘটনা। কুখ্যাত জমিদার বিষ্ণুর রামচন্দ্র রেড্ডির গুণ্ডারা চাষীদের যে-সব জমি বে-আইনীভাবে কেড়ে

নিয়েছিল, চাষীরা সেই সব জমি আবার উদ্ধার করল। এই সব মিলে হল ঝড়ের পূর্বাভাষ।

আন্দোলন থামাবার জন্য নিজাম দমন-নীতি চালালেন। চলল ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র—নিজাম স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। হায়দ্রাবাদ হবে দক্ষিণ-পাকিস্তান এবং তিনি হবেন সেখানকার সার্বভৌম শাসক। সেই মর্মে ১৯৪৭ এর ১২ই জানুয়ারী ফর্মান জারী হল।

ওদিকে চলতে থাকে নিজাম-শাহী-বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি। ছোট ছোট দল গড়া হয়—সম্বল চাষীদের ঘরোয়া হাতিয়ার লাঠি, বল্লম, গুলতি এবং গোটাকয় দেশী বন্দুক। এই অস্ত্র নিয়েই তারা রুখবে জমিদারদের পোষা গুণ্ডাদের।

পাকিস্থান ও বিলেত থেকে অস্ত্র আমদানী নিয়ে তখন নিজাম ছিলেন ভারী ব্যস্ত। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান প্রতিষ্ঠান মজলিশ-এ-ইত্তেহাদ্-উল-মুসলীমের নেতা কাশিম রাজভী। তাঁর রাজাকার বাহিনীকে নিজামের সেনা বাহিনীর সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাশিম রাজভীকে সাহায্য করেন নিজাম।

জনগণের সঙ্গে হাত মেলালেন না ভারত সরকার। তার বদলে তাঁরা আলাপ চালাতে লাগলেন নিজামের সঙ্গে। ১৯৪৭-এ নিজাম সরকারের সঙ্গে এক বৎসরের জন্য একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, নিজাম স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন—এবারে গণ আন্দোলনকে একেবারে শেষ করে দেবেন। রাজ্য গণ-সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে এই স্থিতাবস্থা চুক্তির বিরোধিতা করতে বা অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও গণ সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কোন মোর্চা গড়ে তুলতে সাহস করেনি।

এমনি সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টি ডাক পাঠাল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, নিখিল হায়দ্রাবাদ ছাত্র ইউনিয়ন, এবং কতগুলি শহরে যে-সব মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তাদের কাছে। ডাক পাঠাল পার্টি এবং অন্ধ্র মহাসভার সঙ্গে হাত মিলিয়ে জন জীবন রক্ষার জন্য তাদের দৃপ্ত ভাবে এগিয়ে আসতে। সাড়া দিল মহিলা আর পুরুষের দল। হাতিয়ার দিয়েই তারা অত্যাচারী নিজামের সেপাই আর রাজাকার গুণ্ডাদের হাতিয়ারের জবাব দেবে। এবং অত্যাচারী নিজামশাহীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে চিরদিনের মত।

কার্যকরী কর্মসূচি তৈরী হল। এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল—জবরদস্তি বেগারী লোপ, কৃষকদের যে-সব জমি, দেশমুখ, জায়গীরদার আর জমিদারেরা বেআইনীভাবে কেড়ে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া এবং সরকারী জমি বন্টন। গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুরদের তরফের দাবী ছিল—রায়তদের জন্য ন্যায্য হারে খাজনা; ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য মজুরী এবং জমিদারের কাছ থেকে চাষীরা যে শস্য ঋণ বা অর্থ ঋণ নেয়, তার অত্যধিক চড়া হারের সুদের লোপ।

এই কর্মসূচি কার্যকরী করার কাজে সাহায্যের জন্য কতগুলি গণকমিটি এবং সশস্ত্র গেরিলা স্কোয়াড তৈরী করা হল। অন্ধ্র মহাসভা ইতিমধ্যেই মহাসভা তেলেঙ্গানা এলাকায় একটি রাজনৈতিক গণ-সংগঠন হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে। স্থির হল এই গণ কমিটিগুলি গেরিলা স্কোয়াড্‌গুলিকে পরিচালনা করবে।

মহিলারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন এই সংগ্রামে। নিজামের অমানুষিক শোষণের শাসনে অনাহারে থেকেছেন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তাঁরা—আজ যেন তাঁরা এক সম্ভাবিত নতুন জীবনের আভাস দেখতে পাচ্ছেন। কাজেই, জমির আন্দোলনে, জমিদারের কাছ থেকে শস্য উদ্ধারের এবং ক্ষেত মজুরের মজুরী বাড়ানর সংগ্রামের তাঁরা সক্রিয় শরিক হলেন। পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা লড়লেন নিজামের সৈন্যদের সঙ্গে, রাজাকারদের সঙ্গে এবং পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সঙ্গে। এরা আজ অগ্নিগর্ভ, কারণ নিজামশাহী সৈন্য আর পুলিশ, জমিদারের ভাড়াটে গুণ্ডা এবং রাজাকার বর্বরদের হাতে এরাই নিগৃহীত হয়েছে সব চেয়ে বেশী। দিনের পর দিন এদের ওপর চলেছে অত্যাচার আর ধর্ষণ, চোখের সামনে দেখেছে নিজ সন্তানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার আর বাপ-ভাই-স্বামীর হত্যা। তাই এরা আজ লড়াইয়ে নেমেছে, এসে দাঁড়িয়েছে পুরুষদের পাশে।

জেলাগুলো চলে গেল সামরিক শাসনের হাতে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলল চড়াও আর হামলা। রাত হলে পুরুষরা ছড়িয়ে পড়ত গ্রামের বাইরে। মেয়েরা গ্রামেই ঘুমোত ২৫।২০ জন একসঙ্গে হয়ে যাতে নিজেদের সম্মান নিজেরাই রাখতে পারে। যতরকমে সম্ভব মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে প্রতিরোধের লড়াইয়ে যোগ দিত। সংঘম (অন্ধ্র মহাসভা) ছিল তাদের সঙ্গে, তাদের সর্ব সমস্যায়—এমন কি স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের ব্যাপারেও—পরামর্শদাতা, পরিচালক এবং নির্দেশক হয়ে।

বহু দুর্বলতা আর প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও কিছু লাভ হয়েছিল এই আন্দোলনের ফলে। ভেট্টি বা বেগার প্রথা বন্ধ হল। বাধ্যতামূলক শস্য-বণ্টন প্রবর্তিত হল, দেশমুখ আর জমিদাররা যে-সব জমি বে-আইনীভাবে দখল করেছিল তার পুনর্দখলও শুরু হল। মেয়েরা খুশি হলেন সব চেয়ে বেশী।

জনগাঁও তালুকের অন্তর্গত পালাকুর্তি গ্রামের চাকালা-আইলাম্মা—ধোবার কাজ করত। জমি ছিল কিছু। বিষ্ণুর দেশমুখ, সেই ঘৃণিত নামের মানুষটি ঠিক করল আইলাম্মার জমি থেকে ফসল কেটে নেবে। আইলাম্মা তার জমি আর ফসল রক্ষার জন্য প্রাণপণে লড়ল বিষ্ণুর দেশমুখের সঙ্গে। এই প্রথম লড়াই। আইলাম্মা ছিল সংঘমের বড় সমর্থক এবং কর্মী। বিষ্ণুর সংঘমের নেতাদের হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু জনতার হাতে গুণ্ডারা মার খেয়ে আধমরা হয়ে পালাতে বাধ্য হয়। বিষ্ণুর ১৩ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পুলিশী মামলায় জড়ায়। এমন কি খুনের চেষ্টা করার দায়েও দায়ী করে তাদের। দেশমুখ ভাবল, এবারে আইলাম্মার ক্ষেত থেকে ফসল কেটে আনার আর কোন বাধা হবে না। ১০০ গুণ্ডা আর ১০০ ক্ষেতমজুরকে পাঠাল আইলাম্মার জমিতে। সংঘমের নেতারা এবং ২৮ জন স্বেচ্ছাসেবক জান কবুল করে দাঁড়াল তাদের মুখোমুখি। আওয়াজ তুলে আকাশ ফাটিয়ে লাঠি নিয়ে আক্রমণ করল গুণ্ডাদের। জান নিয়ে পালাল গুণ্ডারা। সেই রাতেই এল পুলিশ; কিন্তু আইলাম্মার আঙ্গিনায় স্তূপ করা কাটা ফসল ছুঁতে সাহস করল না। বেঁচে গেল চাষীর ফসল। খুসি হল মানুষ। পরের দিন ভোরে গ্রেপ্তার হল ৬ জন নেতা। তাদের নিয়ে যাওয়া হল কাচারীতে। অকথ্য অত্যাচার হল তাদের ওপর।• বেধড়ক পেটান হল, মাথাগুলো উনানে গুঁজে দেওয়া হল, মলদ্বারে লঙ্কার গুঁড়ো ঠুসে দেওয়া হল, মুখে প্রস্রাব দেওয়া হল—ফ্যাসীদের বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গেল এই বর্বরতা। কিন্তু আইলাম্মার ফসলে কারো হাত পড়তে পারল না। কুখ্যাত দেশমুখের এই পরাজয়ে উৎসাহিত হল—সাহস পেল পুরো তেলেঙ্গানার মানুষ।

গ্রামের সাধারণ মেয়েরাও তাদের জমি রক্ষা করে নির্ভকভাবে। জমির লড়াইয়ে হাজারে হাজারে মেয়েরা সামিল হয় পুরুষদের পাশে পাশে। ক্ষেতমজুরদের অধিকাংশই মহিলা। এরা সমস্ত রকম ক্ষেতমজুর ধর্মঘটে দলে দলে এসে যোগ দেয়; লাল ঝাণ্ডা হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শনে দল বেঁধে আসে এবং শেষপর্যন্ত জমিদারের কাছ থেকে ফসলের ভাগ ছিনিয়ে নেওয়ার

অভিযানেও পিছিয়ে রইল না। ফলে জমিদাররাও ওদের তখনকার হার অনুযায়ী ক্ষেত মজুরী দৈনিক ২।৩ সের থেকে চার সের হারে বাড়াতে বাধ্য হল।

গোদাবরীর বন এলাকায় হাজার হাজার মেয়ে বিড়ি পাতা তুলবার কাজ করত, এরাও বিড়ি পাতা তোলার মজুরী বাড়াবার আন্দোলনের প্রথম সারিতে দাঁড়াল।

পিণ্ডিপ্রোলু ও ইল্লেন্দু কেন্দ্রের ৯০টি গ্রামে ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘট হয়। মেয়ে কর্মীরা তাতে যোগ দেয়, এবং এই ৯০টি গ্রামের মধ্যে ২০টি গ্রামেই লড়াইয়ের প্রথম সারিতে দলে দলে এসে দাঁড়ায় মেয়েরা এবং অনেকেই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পুরুষদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে এরা পুলিশী নির্যাতন অগ্রাহ্য করে অকুতোভয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে।

গেরিলা-স্কোয়াড্দের দেখাশোনা, পাহারাদারী, খবরদারীর কাজ করত মহিলারাই। বাড়ীতে বাড়ীতে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করত, গোপন আস্তানায় খাবার পৌঁছে দিয়ে আসত, বিশ্রামের সময় পাহারা দিত। পাহারার কাজে অসম্ভব ওস্তাদ ছিল মেয়েরা। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে অকথ্য অত্যাচার সইতে হত এদের।

বেজোয়াদার সিংগ্রাম গাঁয়ের রামুল্লাম্মা গুলির আঘাতের চিকিৎসার জন্য এসেছিল, গাঁয়ের কজন পুরুষের সঙ্গে। তার কাছেই শোনা গেল কি করে তেলেঙ্গানার আন্দোলন অমন প্রাণ পেয়ে জোরদার হল, সংগ্রামীরা কোথায় পেল অমন দুঃসাহস, কি করে মেয়েরাও সামিল হল লড়াইয়ে—সেই সব কাহিনী।

রামুল্লামার বয়স তেমন কম নয়, জাতিতে সে চাষী নয় বাজিয়া। সেবার সূর্যপেটে নিজামের পুলিশ সাংঘাতিকভাবে গুলি চালায়। সব থেকে ভীরু যে মেয়ে সেও বেরিয়ে আসে এই ঘটনার ফলে এবং এসে সংঘর্ষে যোগ দেয়।

রামুল্লামা বলে, বছরের পর বছর তাদের ওপর চরম শোষণ চলেছে কিন্তু তার প্রতিবাদের কথা তাদের মনেও আসেনি। ফসল থেকে নিজাম সরকার প্রথম নিত তার ভাগ। তারপর দেশমুখরা। নিজামের ভাগের পরিমাণ বাঁধা ছিল। দেশমুখরা নিত একর প্রতি তিন মণ। তারপর আসত তহশিল-

দার, তালুকদার, আওয়াল, দইয়ামরা (খাজনা আদায়কারী)—প্রত্যেকেই তার ভাগ নিত। এরা যে যার ভাগ নিয়ে আবার ফিরে আসত। আরো চাইত—জোর করে ঘর থেকে শস্যের বস্তা বের করে নিয়ে যেত—দাম দিত নাম মাত্র, বস্তা প্রতি ৪০ টাকা, যেখানে বাজার দর হচ্ছে ২২০ টাকা। খাতায় উশুল দিত কি কেউ জানত না।

খাবার মত দানাও নিঃশেষ হয়ে যেত। এভাবে না খেয়ে থাকত ছেলে-পুলেরা। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে উঠল মেয়েরা—আর সইল না তাদের। চাষের মৌসমে কোথায় বীজ? কিনতে গেলে ২২০ টাকা—কোত্থেকে আসবে সেই টাকা?

১৯৪৬-এর ফসল কাটার সময় স্থির হল ধান দেওয়া হবে না, তার বদলে টাকা দেওয়া হবে যার যার ভাগ হিসাবে। রেগে আগুন হল দেশমুখরা, নালিশ করল গিয়ে সরকারে। শোনা গেল রিসার্ভ পুলিশ আসছে। মণ্ডলমের নেতা নায়করা সাবধান করে দিল সবাইকে—কাঁদুনী গ্যাস থেকে বাঁচবার জন্য সবাইকে কোমরে ভিজে কাপড় জড়িয়ে রাখতে বলল। সবাইকে তাদের একমাত্র অস্ত্র গুলতি হাতে সার দিয়ে দাঁড়াতে বলল ধান পাহারা দিয়ে। পুলিশ এল। তারা ঘাবড়ে গেল কিছুটা। কিন্তু শিগগিরই এল মিলিটারী। রামুল্লাম্মা বলল "এরা যে সাক্ষাৎ যমদূত, তা জানতনা আমাদের মরদরা।"

কাঁচা বয়সের মেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হল জঙ্গলে। পুরুষরা গিয়ে দাঁড়াল একটা উঁচু ঢিবির ওপর। বয়স্কা মহিলারা দাঁড়াল তাদের পেছনে।

লরী ভরে ভরে এল সৈন্যরা। এসেই চালাতে লাগল গুলি। সামনের সারির পুরুষরা গুলি খেয়ে এক দিক থেকে পড়তে লাগল। তারপর দ্বিতীয় সারির দিকে ছুঁড়ল কাঁদুনে গ্যাস। সৈন্যরা তাঁদের বাঁধল হাঁটুর নীচে দুই হাত গলিয়ে পা মুড়ে। তারপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল লরীতে। পুরুষদের ছাড়িয়ে আনতে ছুটল মেয়েরা। সে কি লড়াই। অমন লড়াই সূর্যপেটে কেউ দেখেনি আগে। এক দিকে মেয়েরা লড়ছে খালি হাতে—আর এক দিকে সেপাইরা তাদের বন্দুকের কুঁদো চালাচ্ছে এক মেয়ের কান ফাটল—আর একজনের গোড়ালী ভাঙ্গল—কিন্তু দমেনি অসম সাহসিকা মেয়েরা। তবে খালি হাতে কতক্ষণ যুঝবে অস্ত্রধারীদের সঙ্গে? সেপাই লরী হাঁকিয়ে চলে গেল পুরুষদের নিয়ে। গাঁয়ে একজনও পুরুষ ছিলনা সেদিন—বলল রামুল্লাম্মা।

সারা জায়গা জুড়ে ছড়ান রইল ভাঙ্গা চুড়ি আর বালা। মেয়েরা ভেঙ্গে পড়ল, কেঁদে ভাসাল। উপোসী রইল তিন দিন। তারপর এল নায়ক—সাহায্য নিয়ে। বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ভারী মুষড়ে ছিল মেয়েরা। তারপর তারা চাঙ্গা হয়ে উঠল। উপোসীও আর থাকতে হলনা—ভেট্টী (বেগার) উঠে গেছে। বিনা মজুরীতে খাটে না কেউ।

ধরমপুরে, পশ্চিম টাণ্ডার লম্বাডিতে কুখ্যাত দেশমুখ বিষ্ণুরের ছেলে বাবু হামলা করতে লাগল গাঁয়ে গাঁয়ে হামু আর তার ছেলেদের বিশেষ করে থানুর খোঁজে। থানু ওই এলাকার নেতা। হামু, তার বৌ মঙ্গলিকে ও ছেলেদের এবং আরো কজনকে তারা ধরে অমানুষিক অত্যাচার করতে লাগল—বিশেষ করে মঙ্গলির ওপর। কিন্তু এত অত্যাচার সত্বেও মঙ্গলির মুখ বন্ধ হল না। দেশমুখকে গালাগালি তার চলতে লাগল। শোধ তুলবে, জানিয়ে দিল।

পাঁচজন যুবককে ধরে বাধ্য করে চিতা সাজান হল। হামু আর মঙ্গলির ওপর পীড়ন চলতে লাগল—থানুর হদিস চাই। কিছুতেই সেই হদিস ওরা দিল না। তখন চলল গুলি—কজন ঢলে পড়ল, তার মধ্যে ছিল হামু আর মঙ্গলির এক ছেলে। মরল সে বাপ মায়ের সামনে। সাজান চিতায় পোড়ান হল তাদের।

দুমাস পরে আবার চলল বাবুর হামলা—এবারও মঙ্গলিই ওদের অত্যাচারের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নরম হল না মঙ্গলি—যদিও ওর চার ছেলে জেলে, বউ, নাতি, নাতনীদের ওপর চলছে অত্যাচার, অপমান। ভারতীয় সেনা হায়দ্রাবাদে এলে জনগণের হাতে নিহত হয় বাবু। ধরা পড়ে থানুও। ওকে মারা হয় গুলি করে।

এ পর্যন্ত মহিলারা রাজনৈতিকভাবে কোন আন্দোলনে যোগ দেয়নি বা সেভাবে শিক্ষিতও হয় নি। কিন্তু সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বীর্যে ত্যাগে অগ্নি-দীক্ষা হল। এতদিন তারা লড়েছে নিজেদের গাঁয়ে বা নিজ বাড়ীতে। এখন তারা এগিয়ে এল—তারা লড়তে যাবে জঙ্গলে, আর গেরিলা হবে তারা। কিন্তু নেতারা সামান্য কজন মহিলাকে মাত্র পাঠালেন বনে জঙ্গলে লড়াইয়ের জন্য। গেরিলা দলে নেওয়া হল আরও কম।

এই অগ্নি-দীক্ষারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কম্রেড্ স্বরাজ্যম এবং কম্রেড্ আরুৎলা কমলা দেবী। এঁরা বরাবর বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠন এবং পরিচালনা করেছেন, রাইফেল নিয়েও লড়েছেন।

কম্রেড্ স্বরাজ্যম্ বালিকা বয়সেই অন্ধ্র মহাসভায় যোগদান করেন এবং সেখানকার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরে তিনি কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। তেলেঙ্গানা সংগ্রামের জন্য স্ত্রী পুরুষের বহু আন্দোলন সংগঠন করেন স্বরাজ্যম। নিজাম ও রাজাকারদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইনি গোদাবরী বন অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে লড়াই করেছেন। গুণ্ডালা কেন্দ্রে কয়ার গণ-আন্দোলনের ইনি নেত্রী ছিলেন। স্বয়ং জমিদার কন্যা হয়েও স্বরাজ্যম নিপীড়িত মানুষ, শ্রমিক, কৃষকদের সঙ্গে অবাধে মিশে উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়ে তাদের সংগঠিত করতেন।

আরুৎলা কমলা দেবীর বিয়ে হয় ১২ বছর বয়সে। তাঁর স্বামী আরুৎলা রামচন্দ্রম্ তেলেঙ্গানা সংগ্রামের এক প্রবাদ বীর। স্বামীর উৎসাহ এবং চেষ্টায় কমলা দেবী বিয়ের পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি স্বামীর সঙ্গে অন্ধ্র মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৩৮ সনে রাজ্য গণ-সম্মেলন গঠিত হলে দুজনেই তাতে যোগ দেন এবং রাজ্যে জনগণের সমস্ত রকম কাজকর্মে, বিশেষ করে গঠনমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ভোঙ্গির তালুকে ওঁর নিজের গ্রাম কোলনপাকে একটা প্রাথমিক স্কুল চালাতেন কমলা। গ্রামের জায়গীরদার এসব কাজ পছন্দ করত না। স্কুলটি হত জায়গীরের একটা বাড়ীতে; সে সেখান থেকে তুলে দেয় স্কুলটিকে। স্কুলটা তখন জৈন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক বৎসর বেশ ভালো ভাবেই চলে স্কুলটা। জায়গীদার এর শাসনাধীনে বেগার, অতিরিক্ত করের চাপ, নানা ভাবে বেআইনী অর্থ-শোষণ ইত্যাদির চাপে কোলান-পাকের মানুষের পর্যুদস্ত অবস্থা নিজের চোখে দেখে কমলা। উৎসাহিত, উদ্দীপ্ত করে সে মহিলাদের এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। বিষম লড়াই শুরু হল বর্বর জায়গীরদারী শোষণের বিরুদ্ধে। গ্রামের প্রতিটি মানুষ যোগ দিল সে লড়াইয়ে। বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কমলা গ্রামে গ্রামে সভা করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল। এ ছিল সশস্ত্র সংঘর্ষের পর্ব। বিপদ চারদিকে। কিন্তু দমানো যায় নি কমলাকে। শুধু মেয়ে মহলই নয়—পুরুষ মহলেও কমলা ছিল প্রেরণার এক দীপ্ত শিখা। সারা তেলেঙ্গানা জুড়ে কমলার নাম।

তারপর পুলিশ আসে। বন্দুক সমেত ধরা পড়ে কমলা ১৯৪৯-এ। বিভিন্ন জেলে থাকতে হয় তাকে। ওয়ারেঙ্গল জেলে থাকাকালীন রাজনৈতিক

বন্দী হিসাবে গণ্য হবার দাবীতে ৫০টি মেয়ে নিয়ে কমলা অনশন ধর্মঘট চালায়। ১৯৫১তে জেল থেকে সে ছাড়া পায়।

গোদাবরী বন এলাকায় বহু মেয়ে বিশেষ করে কয়া উপজাতির মেয়েরা গেরিলা দলভুক্ত হয়। গেরিলা স্কোয়াডেই অন্তর্ভুক্ত ছিল - জন; তার মধ্যে দ্বিতীয় মুখ্য পরিচালক ছিল দুজন; ১৫ জন ছিল সংবাদ আদান প্রদানের কাজে, দুজন সংগঠক এবং ১০ জন স্কোয়াড সভ্য। শুধু যে জঙ্গল এলাকায়ই তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সমর্থন মেলে তা নয়। মেলে শহর এলাকায়ও নিজামশাহী আর হিংস্র রাজাকারদের চোখের সামনেই। মেলে নবজীবন মহিলা সমিতির মহিলাদের কাছ থেকেও। নবজীবন বিশেষ করে অ-তেলেগু ভাষা-ভাষী মহিলাদের একটি সংগঠন। এই সংগঠনের বহু মহিলা শহর অঞ্চলে চমৎকার কাজ করে। এই সক্রিয় মহিলাদের মধ্যে ছিল পলা। গ্রামের মেয়ে সে। অদম্য আকাঙ্ক্ষা তার লেখাপড়া শেখার। মারাঠাওয়াদা গ্রাম থেকে আসে শহরে। বয়স বেশী, ইস্কুলে পড়ার বয়স নেই। তিন বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে। তারপর ডাক্তারী পড়ার জন্য ভর্তি হয় কলেজে। ছাত্রী-মহলের অত্যন্ত প্রাণবন্ত সক্রিয় কর্মী সে। রাজাকারদের আক্রমণের সময়—সূর্যপেটে গুলি চালানোর প্রতিবাদে বিরাট এক বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়—কাদাওয়ান্দীর ছাত্রীদের। রাজাকারদের ভয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন অভিভাবক, শিক্ষক এবং জনসাধারণ। সমস্ত বাধা-বন্ধ ভেঙ্গে দৃপ্তভাবে রাস্তায় বেরিয়ে আসে ছাত্রীরা। পদ্মা স্কুলে স্কুলে গিয়ে প্রচার চালায়, তাদের উদ্দীপ্ত করে, বিক্ষোভ মিছিলের বাণী বহন করে নিয়ে যায় তাদের কাছে।

ছিল সরোজিনীও। অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা গ্রাম ধুলপেত। সেই গ্রামের মেয়ে সে। ভারী দুঃখের জীবন। স্বামী সংসার দেখে না। স্বল্প আয়ে পাঁচটি সন্তান নিয়ে কষ্টে সৃষ্টে চলে। ভারী পরিশ্রমী মেয়ে সরোজিনী। তাও বাইরের কাজে সে অলস। রেশন-ব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের পুরোভাগেই যে শুধু ছিল সে তা নয়, রাত দিন খেটে সে রেশন কার্ড লিখত, বিলি করত। নবজীবন মহিলা সমিতির হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে সে। তার অসাধারণ সংগঠন প্রতিভা দিয়ে সে রাজাকার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে মহিলাদের মধ্যে। অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় সে।

আর একটি মেয়ে এন্. সত্যবতী। তেলেগু তার ভাষা। অন্ধ্র মহিলা

সভা আর অন্ধ্র যুবতী মণ্ডলীতে কাজ করে সে। তেলেগু মেয়েদের সংগঠিত করার ভার পড়ে তার ওপর।

আখনুর আর মাচিরেড্ডিপেলিতে মেয়েদের ওপর আক্রমণ হয়। ধর্ষিতা হয় বহু মেয়ে। ক্রোধে ফেটে পড়ে রাজ্যের সব মানুষ। জাস্টিস্ পণ্ডিতকে সভাপতি করে এবং মহিলা সংগঠন সহ যাবতীয় গণ সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়, যাতে সত্যবতী অন্ধ্র যুবতী মণ্ডলীর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। দুবার সে গ্রেপ্তার হয়।

এইভাবে হায়দ্রাবাদ শহরে নানাভাবে, নানা দিক থেকে তেলেঙ্গানা আন্দোলনে সমর্থন আর সহায়তা মেলে: গ্রামের আন্দোলনেরও শক্তি বৃদ্ধি হয় এতে।

যশোদাবেন নবজীবন মণ্ডলের কর্মী। রাজাকারদের অত্যাচারের সময় মেয়েদের সংগঠিত করার কাজে প্রধান ভূমিকা ছিল যশোদার। নবজীবন মণ্ডলকে পরিচালন সেই করে। সস্তা দুগ্ধ-বিক্রয়-কেন্দ্র খোলার জন্য সে আন্দোলন করে। বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্যের জন্য সে অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে।

বম্বেতে যে প্রথম হিন্দী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার অধ্যক্ষ হয়ে আসেন প্রমীলা মহেন্দ্র। রাজ্য গণ-সম্মেলন নিষিদ্ধ থাকায় কতগুলি স্থানীয় কমিটি স্থাপিত হয়। প্রমীলা কাজ করেন মহারাষ্ট্র সম্মেলনে। তিনি সস্তা চাল-ডালের কুপন বিলি করেন এবং সস্তা দুগ্ধ-কেন্দ্র চালনা করেন। নবজীবন মণ্ডলের সম্পাদিকা নির্বাচিতা হন। বহু জনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয় যার ফলে তেলেঙ্গানা সংগ্রামের অন্য নেতারা গ্রেপ্তার হলে তিনিই কাজ চালিয়ে যান। তিনি সীতা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে নিজামী পুলিশ কর্তৃক মেয়েদের ওপর অত্যাচারের অকুস্থল আখনুর ও মাচিরেড্ডিপল্লীতে যান এবং সরেজমিনে খোঁজ খবর নিয়ে একেবারে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসেন পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে।

নিজাম-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান মেয়েরা এ যাবৎ যোগ দেয়নি। তাই জামালুন্নিসা বেগমের আদরের নাম বাজি-বাহিনী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই সে 'মনে মনে জাতীয়তাবাদী। জেল থেকে মুক্ত হয়ে মৌলানা মহম্মদ আলি যখন তাঁর পীড়িতা কন্যাকে

দেখতে যাচ্ছিলেন, জামালুন্নিসা বেগম মহম্মদ আলির হাতে ২২৲ তুলে দেয়। এই টাকা সে ১৯.৬।২৭-এ সংগ্রহ করে। সে পর্দা ও বিদেশী বর্জনের সংকল্প গ্রহণ করে। জামালুন্নিসা পড়াশোনা করে বাড়ীতেই। রাজনীতি নিয়ে সে না মাতলেও পাকিস্তান সে সমর্থন করে না।

কিন্তু জামালুন্নিসা-বাজীকে নামতে হয় রাজনীতিতে। তেলেঙ্গানা আন্দোলন তখন তুঙ্গে, রাজাকাররা মারমুখী। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। জনপ্রিয় নেতা, কবি মখদুম মহীউদ্দীন, গা ঢাকা দিয়েছেন, আরেকজন নেতা রাজবাহাদুর গৌর হাসপাতাল থেকে সদ্য পলাতক। বাজীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল বিপ্লবী কাজে। সে পলাতক কর্মীদের জন্য পালাবার ঠাঁই জোগাড় করে, পার্টির কাজের মধ্যে যোগাযোগ বিধান করে, প্রচারের কাজ করে। সবই বিপদের কাজ। জেনে শুনে ঝুঁকি নিয়েই সে করে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত তার বাড়ীটি হয় পলাতক নেতাদের গা ঢাকা দিয়ে থাকার জায়গা ও পার্টির জেলার কর্মীদের আস্তানা। রাজাকাররা ওদের পরিবারকে হুমকি দেয়। কিন্তু ওরা পরোয়া করে না। এই বাড়ীতেই মখদুম মহীউদ্দীন সক্রিয় কর্মীদের রাজনীতির ক্লাস নেন। রাজাকাররা যখন অস্ত্র ত্যাগ করতে আরম্ভ করে, সেই সব অস্ত্রশস্ত্র কিছু সংগ্রহ করে ঐ বাড়ীতে জমা হয়ে, পরে তেলেঙ্গানায় পাঠান হয়।

১৯৪৯-এ বাজীদের বাড়ী খানাতল্লাস হয়। ওর চার ভাই ও এক বোন গ্রেপ্তার হয়। এই সময়ে ওর স্বামী মারা যান। বীমা থেকে যে ১০,০০০৲ টাকা পাওয়া যায় তাই দিয়ে বাজী একটা উর্দু সংবাদপত্র বের করে। কাগজখানা বস্তুত কম্যুনিস্ট পার্টিরই কাগজ হল। মখদুম পালিয়ে থাকা কালীন, তার পরিবারকে ও অর্থসাহায্য করত। ওর ভাইরা জালনা ডিটেন্সন ক্যাম্পে অন্তরীণ থাকার সময়ও ওদের বাড়ীতেই শ্রী এ. কে. গোপালন হেন আত্মগোপনকারী সর্বভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের দেখা সাক্ষাৎ ও মিটিং ইত্যাদি হত। অত্যন্ত ঝুঁকি নিতে হত বাজীকে। কিন্তু সাহসী বেপরোয়া মেয়ে বাজী -অন্য কোন মুসলমান মেয়ের সাহস হত না— ওর মত অমন সাহস করে এসব বিপ্লবী কাজ করার। বাজী তার দুঃসাহসী উদ্যম দিয়ে তেলেঙ্গানা আন্দোলন বা যে কম্যুনিস্ট পার্টি এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাকেই সাহায্য করছিল। এই ভাবেই নানা দিক হতে সাহায্য পুষ্ট হয়ে এবং শক্তির যোগান পেয়ে, তেলেঙ্গানা আন্দোলন পাঁচ

বৎসর নিজামের স্বৈরতন্ত্রের, ও রাজাকারদের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং দরিদ্র কৃষকের ও দলিত, পিষ্ট উপজাতিদের বিশেষ করে কয়াদের ক্ষুধার অন্ন রক্ষা করার জন্য লড়তে পারল।

এই সংগ্রামের মাধ্যমেই মহিলারা বহু শতাব্দীর বহু সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্তি পেল।

মহিলারা অমন বৃহৎ সংখ্যায় তেলেঙ্গানা আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ হল ৪০-এর দশকের শুরু থেকেই মহিলাদের সংগঠনে মহিলা কর্মীদল গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। যুদ্ধের সময় যখন বিশাখাপত্তনমে, কাঁকিনাড়ায় জাপানী বোমা পড়ল, মেয়েদের নিরাপত্তা ও ইজ্জত রক্ষার বিষয় অন্ধ্রের মহিলা কর্মীদের সামনে এক জীবন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এই সময়ে মহিলাদের গণ-সংগঠন অন্ধ্র মহিলা সংঘমের জন্ম হয়। তার ভিত্তি রচিত হল গ্রামের মাটিতে।

অন্ধ্র সাধারণতঃ গ্রাম এবং ছোট ছোট শহর সম্বলিত কৃষি-প্রধান জায়গা। ঐ সময় কোন শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষও ছিল না। মেয়েদের শিক্ষা খুবই পিছিয়ে ছিল। গোটা অন্ধ্রে একটিও মেয়েদের কলেজ ছিল না। মাধ্যমিক স্কুলও গড়ে জেলা প্রতি একটার বেশী ছিল না। প্রখ্যাত সমাজ-সংস্কারক শ্রীবীরেশলিঙ্গম ও ব্রাহ্মসমাজ ১৮৯০-১৯১০ পর্বে মেয়েদের উন্নতির জন্য বহু কাজ করেন। কিন্তু ১৯৩০ সনের কংগ্রেস আন্দোলন বিশেষ করে নারী সমাজে বিপুল জাগরণ সঞ্চার করে। এই জাগরণের ফলে যে বহু নারী সংগঠন গড়ে উঠেছিল তা নয়। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান হয়; কিন্তু সেগুলো মুখ্যতঃ শহরের বড় বড় রাজকর্মচারী, ধনী, ব্যবসায়ী, উকিল-ব্যারিস্টারদের স্ত্রীদের ক্লাব হয়ে ওঠে।

১৯৩৭-৩৮ এ কম্যুনিস্ট পার্টি কোঠাপালাম এবং মাতানাবারিপালামে মেয়েদের জন্য গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক ক্লাস চালায়। এসব ক্লাসে প্রধানতঃ পার্টি সভ্যদের স্ত্রী ও ভগ্নীদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠ্যক্রম ছিল কিছু প্রাথমিক রাজনৈতিক জ্ঞান ও দেশ বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান। এই প্রথম মহিলারা তাদের ঘরের বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে, তার কথা শোনে। এবং সেই জ্ঞান বাস্তব হয়ে ওঠে যখন নিজের ঘরের কোণে জাপানী বোমা বর্ষণ হল। অন্ধ্রের কৃষ্ণা জেলায় এক শ' গ্রাম নিয়ে মহিলাদের একটি গণ-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথম অন্ধ্রের কৃষকদের বৌ-ঝিরা বেরিয়ে

এল। ধীরে ধীরে বিরাট এক গণ-সংগঠনে সংগঠিত হতে লাগল তারা। স্থানীয় ইউনিয়নগুলি থেকে ৬০০০ শ্রমিক মেয়েরাও এসে যোগ দিল। এ একটা নতুন জাগরণ। কৃষক মেয়ে সত্যবতী কৃষ্ণা জেলা মহিলা সঙ্ঘম্-এর সভানেত্রী হন। ১৯৪৩-এর জুন মাসের মধ্যে সঙ্ঘমের সভ্য সংখ্যা হয় ৮০০০।

সঙ্ঘম্ বড় হচ্ছে—এখন তার আরো প্রসার, আরো সংহতির জন্য চাই কর্মী। কর্মীর দল গড়ার জন্য চাই তাদের শিক্ষা। শিক্ষা এবং শিক্ষণের জন্য ১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে বেজওয়াদায় (বর্তমান বিজয়ওয়াড়া) দুটি স্কুল খোলা হল: এদের শিক্ষা ও শিক্ষণের মান হল স্কুল স্তরের এবং পদ্ধতি হল বাস্তবভিত্তিক। প্রধান শিক্ষণীয় ছিল এক সঙ্গে হয়ে নিয়মিত পদ্ধতিতে কাজ করা। তাছাড়াও—গ্রামের মেয়েদের আসল সমস্যা, আত্মরক্ষা, সামান্য কিছু রাজনীতি ইত্যাদির কিছু কিছু জ্ঞান দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ হল। এইসব কর্মী মেয়েদের শিক্ষাক্রমের কাঠামোটি নীচে দেওয়া হল:

১। সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে সামাজিক জীবনযাপন করার পদ্ধতি শেখান; ২০।২৫ টি মেয়েকে ৪।৫ টি ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেকটি দলের আলাদা সম্পাদিকা নির্বাচন করা হল। এই সম্পাদিকারা এক সঙ্গে হয়ে আবার তাদের স্কুল সম্পাদিকা নির্বাচন করে। সম্পাদিকাদের কমিটি স্কুলের দেখাশোনা করে আর নিজ নিজ দলের মাধ্যমে কাজ করে। এত নিয়ন্ত্রিত ছিল এদের দৈনিক জীবন, যে এরা সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ম মেনে কাজ করতে শিখে গেল।

২। মাতৃত্ব, শিশুপালন, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি এদের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাতে এরা গিয়ে গ্রামের মহিলাদের ভালো মাতা ও সুগৃহিণী হতে শিক্ষা দিতে পারে। আতোহামাম্বা ছিলেন একজন নাম-করা মহিলা ডাক্তার। তিনি মাতৃত্ব ও শিশুপালন সম্বন্ধে তেলেগু ভাষায় একখানি পুস্তিকা লেখেন। বইটা সব গ্রামে এত জনপ্রিয় হল যে অল্প দিনের মধ্যে কয়েকটি সংস্করণ বিক্রী হয়ে গেল। কর্মী মেয়েদের পক্ষেও বইটাতে খুব সাহায্য হত নিরক্ষর মেয়েদের শেখাবার কাজে।

৩। কিছু আত্ম-রক্ষণ পদ্ধতিও শেখান হল—শুধু জাপানী আক্রমণের ভয়ে নয়। মেয়েদের সংগঠনের ও অন্যান্য কাজে বাইরে যেতে হয় এবং অনেক সময় গুণ্ডাদের পাল্লায় পড়ে তারা।

৪। প্রাথমিক রাজনীতি ও সহজ অর্থনীতি, রাজনৈতিক ভূগোল, নারী আন্দোলনের সংগঠন।

৫। এক ঘন্টা করে বৃন্দগানও শেখান হত—কারণ সংগঠন ও শিক্ষার জন্য মহিলাদের আকর্ষণ করার পক্ষে বৃন্দগান একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

৬। লজ্জা ত্যাগ করতেও তাদের শিক্ষা দেওয়া হত—এজন্য জন-সমক্ষে বক্তৃতা দেওয়া ও বিতর্ক ছিল শিক্ষাক্রমের অঙ্গ। সপ্তাহে দুই দিন বিতর্ক হত।

১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর নাগাদ রাজ্য স্তরে চারটি শিক্ষণ শিবির খোলা হয়। সঙ্ঘম ইতিমধ্যে বহু জেলায় বিস্তৃত হয়েছে এবং এগুলির সংগঠন ও সংহতির জন্য কর্মী চাই। উক্ত শিক্ষণ শিবিরে শিক্ষা-প্রাপ্ত কর্মীরা ঘুরে বেড়াত গ্রামে গ্রামে, সঙ্ঘমের শাখা স্থাপন করত; হাজার ছোট হলেও মেয়েদের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করত। বৃহত্তম সমস্যা ছিল, মেয়েদের পায়খানার। পায়খানার জন্য আন্দোলন করাল কর্মীরা—স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে মেয়েদের জন্য পায়খানা তৈরী করে দিতে হবে। অত্যন্ত জনপ্রিয় হল এই আন্দোলন। পায়খানার অভাব চিরকাল বোধ করেছেন মহিলারা। কিন্তু মুখে বলতে পারেন নি; বললে কাজ হবে এ বিশ্বাসও ছিল না তাদের।

প্রতিটি গ্রামে কতগুলি দলকে আগুন নেভানও শেখান হত শুধু জাপানী বোমার ভয়েই নয়। যদিও তাও একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ হল গ্রীষ্মে খড়ের গাদায় প্রায়ই আগুন লাগত। ইন্দুপল্লীতে সেবার আগুন লাগল। অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল পুরুষেরা। মেয়েদের আগুন নেভান দল এসে আগুন আয়ত্তে আনল অল্প সময়ের মধ্যেই। সঙ্ঘমের সমাদর বেড়ে গেল। মেয়েরাও বুঝল এত কাজের কাজ শেখায় সঙ্ঘম—এ সঙ্ঘম তাদের চাই-ই। দলে দলে তারা সঙ্ঘমে যোগ দিতে লাগল।

এই ভাবে ছোট বড় কাজের মধ্য দিয়ে, সঙ্ঘম বড় হতে লাগল, পেতে লাগল সমর্থন আর শক্তি। মহিলারা এখন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন; খাদ্যের জন্য লাইনে দাঁড়াতে শেখান; দরিদ্র এবং অশিক্ষিত-দের জন্য রেশন-কার্ড সংগ্রহ করেন, রাও কমিটির মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিলের সমর্থনে সই সংগ্রহ করেন; মাতৃ-কল্যাণ-কেন্দ্র খোলার জন্য পৌরসভায় ডেপুটেশন নিয়ে যান; ডেপুটেশন নিয়ে যান পানীয় জলের বন্দোবস্ত আর মেয়েদের পায়খানার জন্যও।

১৯৪৪-এর এপ্রিল নাগাদ সঙ্ঘমের সভ্য সংখ্যা হল ২০,০০০*। বাংলার পরেই বৃহত্তম গণ প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘম—যার মূল হল গাঁয়ের কৃষক মেয়েদের মধ্যে। শহরের কিছু কিছু মধ্যবিত্ত মেয়েরাও এর সভ্য ছিল। ডা: আচ্চামাম্বা ছিলেন এর সভানেত্রী এবং সূর্যবতী ছিলেন সম্পাদিকা। সংগঠন-কর্মীরা সভা করত, ডেপুটেশন নিয়ে যেত, আলোচনা করত রাজনীতি আর মেয়েদের সম্পর্কিত নানা বিষয় ও সমস্যা নিয়ে, জাপানীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। আলোচনা করত নাৎসীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট মেয়েদের দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসিক প্রতিরোধ নিয়ে। শুধু আলোচনাই সার ছিল না, নিজেদের বালা, চুড়ি, কানের নাকের গয়না দিল সঙ্ঘমের অর্থ ভাণ্ডার বাড়াবার জন্য।

আগেই বলা হয়েছে, সঙ্ঘমের অধিকাংশ সভ্য কিষান মেয়েরা। ১৯০৪-এ বেজোয়াদায় হল সর্বভারতীয় কিষান সভার বিরাট সম্মেলন। মণ্ডপের ১/৫ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা হল মহিলাদের জন্য। ভরে গেল পুরো জায়গা, তিল ধারণের জায়গা রইল না। কর্মী মেয়েরা দিনের পর দিন খেটেছে এই সম্মেলনে তাদের আনবার জন্য। মহিলারা বুঝেছিলেন পুরুষদের সম্মেলন হলেও যাবেন তাঁরা, কেননা সংসার চালায় মেয়ে পুরুষে মিলে—একের সমস্যা তাই দুইএরই সমস্যা। মহিলা সংঘম আছে দাঁড়িয়ে পাশে। তবু সাহায্য নিতে হয় পুরুষের। তাছাড়া এ কিষানদের সম্মেলন। শোষণ চলে দুইএর ওপর। তাই সংগ্রামও দুইএর। তাই বেজওয়াদায় কিষান সম্মেলনে তারা দলে দলে এল স্বামী, ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তাদের শক্তি-বৃদ্ধি করতে।

কিষান সভার ভাইদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েই মসলিপত্তম খালকে উদ্ধার করল এই মহিলারা।

অন্ধ্রের কৃষ্ণা জেলায় কৃষ্ণা-খাল পুঞ্জ ৬০০,০০০ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করে। পলিতে প্রায় ভরে এল খালগুলি। সেচের জল কমে গেল। মসলিপত্তম খালটির পলি তোলার কাজ করার সরকারী অনুমতি এল। কিন্তু আমলাতন্ত্রের গড়িমসি। তারা জানিয়ে দিল, কাজ আরম্ভ হবে পরের বছর। অথচ এই খালটির পলি উদ্ধার হলে আরো বেশী জমি সেচের জল পাবে এবং আরো ৫০,০০০ একর জমি চাষের ও খাদ্য উৎপাদনের আওতায় আসবে।

এগিয়ে এল কিষান সভা, এগিয়ে এল অন্ধ্র মহিলা সঙ্ঘমও। তারাই করবে খাল উদ্ধার। বিরাট কাজ। কাজের লোক লাগবে হাজার হাজার। অথচ লোক কম। তারা ঘোষণা করল ক্ষেত মজুরীর বেশী মজুরী দেওয়া হবে। তিন হাজার মানুষ—স্ত্রী-পুরুষে ২,০০০ ক্ষেতমজুর, এক হাজার কম্যুনিস্ট ও ২০০ পার্টি সমর্থক—সবাই মিলে ৩৫ দিন খেটে উদ্ধার করল মসুলিপত্তম খাল।

বড্ড পরিশ্রমের কাজ বলে মহিলাদের প্রথমে নিষেধ করা হল। কিন্তু পরিশ্রম বলে পিছিয়ে থাকবেনা মেয়েরা। অগত্যা কোমর বাঁধতে হল ডাঃ আচ্চামাম্বাকেও, এল সঙ্ঘমের তরুণী সভানেত্রী সূর্যবতী, তার শ্বাশুড়ী, আরো অনেকে। পলি পরিষ্কার হলে জমি বাড়বে, সেচের জল বাড়বে। খাদ্য ফলবে বেশী—সে খাদ্য তো সবাই খাবে। অতএব খাটুনির ভাগও তারা নেবে।

বেজওয়াদা থেকে ২৫ মাইল দূরে মহিলা সঙ্ঘমের সম্মেলন হল ২৯শে আর ৩০শে এপ্রিল। আশ্চর্য ব্যাপার, ৭০০০ মহিলা এলেন কাভুরের মত পিছিয়ে পড়া গ্রামেও, যেখানে আছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ, পণ দেওয়া, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে রক্ষিতা-পোষণ ইত্যাদি নানা রকম কুপ্রথা ও কদাচার। এই সাত হাজারের মধ্যে ২০০০ ছিল প্রতিনিধি। তিন হাজার পুরুষও সম্মেলনে যোগ দেয়।

প্রতিনিধি সম্মেলনে স্বাস্থ্য এবং জন স্বাস্থ্যের ওপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মহিলা সঙ্ঘম ইতিপূর্বেই গ্রামের মহিলাদের নিয়ে আন্দোলন করে আসছিল। অতি বাস্তব ও জীবন্ত সমস্যা বলে, প্রস্তাবটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। মাতৃ ও শিশু কল্যাণ সম্বন্ধেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডাঃ আচামাম্বার সাহায্যে ১৯৪২ সনে সঙ্ঘম একটি শিক্ষণ কেন্দ্র খুলে ৫০ জন মহিলাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও সেবায় প্রশিক্ষণ দেয়। ১৯৪৩ সনেও বিভিন্ন গ্রামে ১২৫ জন মহিলাকে অনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। এরাই নিজ নিজ এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য প্রচার ও আন্দোলন করবে।

হিন্দু কোড বিলকে সমর্থন করেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ বিলের সমর্থনে এরা হাজার দুয়েক গ্রাম থেকে ৭০০০ সই সংগ্রহ করে। এতেই প্রমাণ মহিলা সঙ্ঘম গ্রামের মহিলাদের একেবারে ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছিল।

১৯৪০-এর মে দিবসের কদিন আগেই জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালিত হয় গুনটুরে। হাজার দুই মহিলা এই শোভা-যাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলায়, তালুকে মিউনিসিপ্যাল কর্মীদের ধর্মঘট হয়। মহিলারা দলে দলে প্রভূত উৎসাহের ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই ধর্মঘটে যোগদান করে। এই আন্দোলনে শ্রমিক মহিলাদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

অন্ধ্রের নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন ছিল প্রধানত উচ্চ মধ্যবিত্তদেরই প্রতিষ্ঠান। অন্ধ্র মহিলা সংঘের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনের পর তার বিভিন্ন জেলার শাখাগুলো মিলে গিয়ে সেটি অন্ধ্র রাষ্ট্রীয় মহিলা সঙ্ঘম নামে পরিচিত হল। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে সঙ্ঘমের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হল সঙ্ঘম কম্যুনিস্টদের প্রতিষ্ঠান এই অজুহাতে।

অন্ধ্র-রাষ্ট্রীয় মহিলা সঙ্ঘমের সভ্য সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৪৫ হাজারে দাঁড়ায়। স্থির হয় ১৯৪৮ সনের ২৫ এবং ২৬ এপ্রিল সম্মেলন হবে বেজওয়াদায়। এর আগেই বের হয় সঙ্ঘমের মাসিক মুখপত্র অন্ধ্র-বনিতা। সম্মেলনের ক'দিন আগেই ১৪৪ ধারা জারি হয় গোটা বেজওয়াদায়। সব সভা সমিতি নিষিদ্ধ হয়। যে ছাপাখানা থেকে অন্ধ্র-বনিতা বের হত, তাতে তালা পড়ল।

২০০ মধ্যবিত্ত এবং কিসান মহিলা কালেক্টরের বাড়ী গেল, সম্মেলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার এবং তাদের কাগজখানা ছাপবার অনুমতির দাবী নিয়ে।

মালাবার স্পেশ্যাল পুলিশের সঙ্গে ভেট হল গান্ধীনগরের গেটে। গান্ধীনগর তপ্‌শিলী জাতির সম্মেলনের জন্য নির্মিত মণ্ডপ। দু চারজন পুলিশ নয়—রীতিমত একটি বাহিনী। মহিলারা কিছু বোঝবার আগেই কাঁদুনে গ্যাসের বন্যা এসে পড়ল ওদের ওপর। অন্ধ্র রাষ্ট্র মহিলা সঙ্ঘমের সভানেত্রী ডাঃ আচ্চামাম্বাম গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর বাড়ী খানাতল্লাসী হল। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা তাঁর বাড়ীতেই ছিল। ও বাড়ীর সকলকে গ্রেপ্তার করা হল। মালাবার পুলিশ ওখানে আস্তানা গেড়ে রইল তিন দিন। ৭৫ জন ধৃতা মহিলাকে রাতের অন্ধকারে সেনাবাহিনীর ট্রাকে করে বেজোয়াদা থেকে ৩৫ মাইল দূরে নাদিগামা সাবজেলে নিয়ে যাওয়া হল। পাহারাদারী পুলিশের সংখ্যা ছিল বন্দীদের চেয়ে বেশী। নাদিগামায় মাত্র ২১ জন

বন্দী থাকার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং অবস্থা শোচনীয়। চারদিন বে-আইনী আটক রাখার পর ৫৯ জন মহিলাকে বেজোয়াদায় এনে ছেড়ে দেওয়া হল। বাকী ১৬ জনকে এবং ডাঃ আচ্চাম্বাকে, সম্পাদিকা সূর্যবতীকে ও অন্ধ্র-বনিতার পরিচালিকা অন্নপূর্ণাকে ও যুগ্ম সম্পাদক এম উদয়মকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে দায়ী করা হয়। অগত্যা তাদের জামিনে ছেড়ে দিতে হয়।

তেলেঙ্গানা সংগ্রাম চলতে থাকল। তখনকার মত সংঘও নিষিদ্ধ রইল।

নবম পরিচ্ছেদ

কেরলের পুন্নাপ্রা-ভায়ালার

১৯৪২-এর শেষ। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র প্রথম পর্বের ঢেউ বয়ে গেছে দেশের ওপর দিয়ে। কংগ্রেস, মুসলিম লিগের সম্পর্কের ফাটল হয়েছে গভীরতর। জাপানীরা ঘরের দোরে। এই সঙ্গীন সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির ডাক এল—কংগ্রেস-মুসলিম লিগ ঐক্য চাই—দেশের সংকট-ত্রাণে কংগ্রেস-মুসলিম লিগ ঐক্য চাই। এই দাবীর ওপর ভিত্তি করে পালিত হল ঐক্য সপ্তাহ এবং স্বাক্ষর-সংগ্রহ অভিযানও চলল।

এই ঐক্য সপ্তাহ চলাকালীন, মালাবার কোচিন, (কোজি খোদ) আর ত্রিভাংকুরের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে এক সম্মেলন হল কালিকটে। এই সম্মেলনে এলেন কৃষক আর শ্রমিক মেয়েরা, স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা আর সাধারণ গৃহিণীরা। মঞ্চ থেকে ঘোষিত হল, দুনিয়া থেকে ফ্যাসিবাদকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। এই সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে মেয়েদের। সোভিয়েত ও চীনের কাছ থেকে ওরা প্রেরণা পায়, সংকল্পের শক্তি পায়। ঐক্য অভিযানকে সফল করার জন্য আহ্বান গেল কেরলের মহিলাদের কাছে।

অভূতপূর্ব আলোড়ন জাগল কেরলের মহিলাদের মধ্যে এই আহ্বানে। তারা ফ্যাসিদের বর্বরতার কথা, তাদের গ্যাস চেম্বার আর মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনেছে। শুনেছে চীন এবং রাশিয়ার মা-মেয়ে-বোনেদের ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যের কাহিনী। দেশ রক্ষার ডাক তাই সাড়া জাগাল তাদের বুকে।

লড়াইয়ের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আছে কেরলের মেয়েদের। তাদের লড়তে হয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, মর্যাদা রক্ষার জন্য। তাই কেরল রাজ্যে রমণীদেরই প্রাধান্য। শিক্ষায়, বিবাহ ব্যাপারে তারা অন্যান্য রাজ্য থেকে অগ্রসর। উত্তরাধিকার ব্যাপারে এদের মারুমাখায়াম পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

এই পদ্ধতি অনুসারে মেয়েদের সূত্রে অধিকার বর্তায়। কেরল রাজ্যের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েদের বিবাহে ও বিবাহ-বিচ্ছেদে স্বাধীনতা আছে। তাদের পর্দা নেই। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে কেরলের স্থান প্রথম।

এই রকম একটা অগ্রসর রাজ্যেও নিঃভাঃমঃসঃ কোন স্থান করে নিতে পারে নি। তাদের কথা এ রাজ্যে বিশেষ কেউ জানত না।

১৯৩০-৩২-এর কংগ্রেস আন্দোলনে বহু মেয়ে যোগ দেয়। কিন্তু এতে তাদের চিন্তায়, কর্মে বা সামাজিক জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটায়নি। কংগ্রেস আন্দোলন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে এদের সংগঠিতও করেনি। ঐ আন্দোলনেই তাদের উদ্দীপনা শেষ।

এই আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল কতগুলি সামাজিক আন্দোলন। কেরলের অনুন্নত সম্প্রদায় লড়ছিল অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। নাম্বুদিরী তরুণরা লড়ছিল প্রগতি-বিরোধী পারিবারিক প্রথার বিরুদ্ধে। কেরলের পুরানো সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধসে পড়ছিল।

এ থেকেই মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে নাম্বুদিরী সমাজে নতুন মানুষ দেখা গেল নতুন সংগ্রামের অগ্রদূত হিসাবে। নাম্বুদিরী সমাজে বহু-বিবাহ, ও বাধ্যতামূলক পর্দা ছিল; মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল না, বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার ছিল না। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এরা ছিল পিছিয়ে। এইসব নিয়ে আরম্ভ হল সংগ্রাম। দাবী করা হল—আইন করে বহু-বিবাহ বন্ধ করা হোক, মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার চাই। বিশেষ করে মালাবার, কোচিন আর ত্রিবাংকুরের মেয়েদের মধ্যে এই দাবী সোচ্চার হল। ১৯৩১-এ সাতজন মেয়ে প্রকাশ্যভাবে পর্দা ত্যাগ করল—এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল বহু মহিলা। ১৯৩৪ সনে বিধবা-বিবাহ হল; চলতে লাগল নাম্বুদিরী মেয়েদের অ নাম্বুদিরি ছেলেদের সঙ্গে বিবাহ; মেয়েরা স্কুলে যেতে লাগল। মুক্তির পথে এগিয়ে চলল নাম্বুদিরী মেয়েরা।

এইসব আন্দোলনের সংগ্রামী মেয়েরাই এবার গড়ে তুলতে লাগল মেয়েদের মধ্যে জাপ-বিরোধী আন্দোলন। এদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন আর্যপাল্লাম এবং এম, ই, ভট্টথিরীপাদ—যিনি প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন। নিখিল-কেরল-মহিলা সমিতি স্থাপিত হলে এঁরা দুজনেই তার কার্যকরী সমিতির সদস্য হলেন।

বৃটিশ ভারতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসনকালে নানা রাজ্যে গণ-কৃষক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসার লাভ করছিল। এর হাওয়া এসে লাগল কেরলেও। তখন আর শুধু শহরের ওপর-তলার ফ্যাসান-দুরস্ত মহিলারাই নয়, এল দলে দলে কৃষক গৃহিণীরা। আন্দোলন শুধু বিবাহ বা সামাজিক অসাম্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বেকারী ও মজুরী বৃদ্ধির প্রশ্ন বড় হয়ে উঠল। কলে, কারখানায়, ক্ষেতে, মাঠে এই সংগ্রামে পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াল মেয়েরা। কম্যুনিস্ট মহিলাদের কাছ থেকে এরা আরো উৎসাহ উদ্দীপনা পেতে লাগল।

১৯৪০-৪২-এ কম্যুনিস্টদের আত্ম-গোপন করতে হয়। আন্দোলনের শক্তি এই সময় বাড়ে সবচেয়ে বেশী। কমপক্ষে ১০০০ পরিবারের ৩০০০ থেকে ৬০০০ মেয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তাদের কার্যক্রমের সংস্পর্শে আসে। এদের মন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল। সেই চেতনায় এরা ফ্যাসীবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থবিরোধী সংগ্রামের জন্য যেকোন ত্যাগে প্রস্তুত হল।

এই প্রস্তুতিই জাপ হামলা এগিয়ে আসতে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের মধ্যে এগিয়ে আনল মেয়েদের। বিরাট গণ আন্দোলন আরম্ভ হল। কোট্টায়ামে ৩০০ থেকে ৫০০ মেয়ের জাঠা বের হল। কোচিন রাজ্যের অম্বলিপুরে ১৫টি প্রচার স্কোয়াড তৈরী হল। মেয়েদের অলংকার, তৈজসাদি দিয়েই অম্বলিপুরের মেয়ে কর্মীদের অর্থের জোগান হতে লাগল। গোটা কেরলেই চলতে থাকল কাজ।

১৯৪২ সনের নভেম্বর মাসে মালাবারের তেল্লিচেরীর মহিলারা তাদের পুরহালি গান গেয়ে নাচতে নাচতে মুসলমান এলাকায় যায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য। গোটা মুসলমান সমাজে তার ঢেউ লাগে। ঐক্য-সপ্তাহের শেষের দিনে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। সামনে ৩০০ ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল, তার পেছনে ৩৫০ মহিলা ও বালিকা। হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য জিন্দাবাদ—এই ধ্বনি দিতে দিতে রাস্তা মুখর করে এগিয়ে চলে।

১৯৪২ সনের ১লা নভেম্বর একটি ঐক্য সমাবেশ হয়। বৃষ্টির মধ্যে ধ্বনি দিতে দিতে, সকলের বুকে দোলা জাগিয়ে কৃষক মেয়েরা চলেছে সমাবেশে। ১৩০০ মানুষ জমায়েত হয় সেই ঐক্য সভায়। তার মধ্যে ৫০ জন কৃষক মহিলা। এদের মধ্যে ছিলেন সেই বীর কৃষক রমণী, যিনি মাসের পর মাস

আশ্রয় দিয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শ্রী এ আর, গোপালনকে।

১৯৪৩-এর প্রথম। আওয়াজ উঠল "পুরুষরা কিসান সঙ্ঘমে, মেয়েরা মহিলা সংঘমে এবং ছোট ছোট বালক-বালিকারা এসো বালক সংঘমে।" কোচিন রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে সংগঠিত জায়গা ছিল আজখিকড়। সেখানে চমৎকার একটি স্বেচ্ছাসেবক দল এবং মদ্য নিবারণ আন্দোলন গড়ে উঠল। মহিলাদের একটি সংগঠনও তৈরী হল। এক সপ্তাহে ৭৮৭ জন মহিলা সেই সংগঠনের সভ্য হলেন। ২৮টি স্থানীয় কমিটি গঠিত হল। এই সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কাউন্সিল তৈরী হল। তখন জাপানী বোমা পড়ছে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। কাউন্সিলের মহিলারা নানা রকম গান প্রভৃতি শক্তিশালী মাধ্যম ব্যবহার করে জাপ-বিরোধী চেতনা জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এঁরা মহিলাদের মহিলা-সঙ্ঘমে নিয়ে আসতেও সচেষ্ট হলেন।

নিখিল কেরল মহিলা সঙ্ঘম গঠিত হল। বাল্লুবাজাড় তালুকে তার সম্মেলন হল, নিখিল কেরল মহিলা সঙ্ঘমের সম্পাদিকা থাংকাম্মা কৃষ্ণা পিল্লাইয়ের সভানেত্রীত্বে। ২০০-র বেশী মেয়ে উপস্থিত ছিলেন এই সভায়। এই মহিলাদের মধ্যে নাম্বুদিরী ও মুসলমান মহিলাও ছিলেন। এঁরা এলেন পর্দা ভেঙ্গে। থাংকাম্মা তাঁর ভাষণে খাদ্যাভাবে মহিলাদের নিদারুণ সংকটের কথা বলেন; মহিলা সঙ্ঘম শুধু কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে মিথ্যা প্রচারের খোলস ছিঁড়ে ফেলে জোরের সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন যে সঙ্ঘম সর্ব মতের, সর্ব-পথের মেয়েদের সঙ্ঘম— যার কাজ মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য লড়ে যাওয়া।

তালুক মহিলা সঙ্ঘমের অধীনে ছিল ১১টি ক্রিয়াশীল মহিলা সঙ্ঘম এরা খাদ্য-সংকটে করণীয় সম্পর্কে মেয়েদের বোঝাত। কতখানি খাদ্যের প্রয়োজন এক এক এলাকায় তারও একটা হিসাব তৈরী করল এরা। ১৯৪৩ এর ১৫ই এপ্রিল পালিঘাট তালুক কিসান সংগঠনের সম্মেলন হল ভাণ্ডাজি গ্রামে। প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রায় ১০০ মহিলা ছিলেন। প্রধানতঃ খাদ্য-সংকটের তীব্রতা একটা দূর গণ্ডগ্রামে গিয়েও আঘাত করেছিল। তারই সুরাহার পথ খুঁজতে এসেছিলেন এই মহিলারা। এক দরিদ্র কিসানের মেয়ে

যশোদা মহিলা সঙ্ঘমের সর্বসময়ের সংগঠক হয়। নিজের আগ্রহে ও বৃত্তি পেয়ে সে লেখাপড়া শেখে এবং পরে শিক্ষিকা হয়।

১৯৪৩-এর ২৩মে এরনাড তালুক (মালাবার) মহিলা সঙ্ঘমের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সারা তালুক থেকে প্রায় ১৫০ জন মহিলা এই সভায় আসেন—শিক্ষাগত এবং সামাজিকভাবে সব থেকে পিছিয়ে পড়া মোপলা ও নাম্বুদিরীপাদ সম্প্রদায় থেকেও কয়েকজন আসেন। আম্মন সভানেত্রীত্ব করেন। ৫টি স্থানীয় কমিটি তালুক জুড়ে কাজ করছিল। ৫০ জন মহিলাকে সংগঠনের কাজ শেখানর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তালুক মহিলা সঙ্ঘমের সভানেত্রী ও সম্পাদিকা নির্বাচিতা হন যথাক্রমে কমলাক্ষী এবং সরস্বতী।

জমি এবং মজুরী বৃদ্ধির লড়াই করে করে কেরলের মহিলারা অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠেন। সেই সচেতনতাই তাদের অসম সাহস জোগায় ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যর সি, পি, রামস্বামীর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুন্নাপ্রা-ভায়ালার সংগ্রামে। প্রাণও দিতে হয় কয়েকজনকে। জনগণের এই সংগ্রামে গৌরব-জনক ভূমিকা পালন করে শ্রমিক মেয়েরাও।

১৯৪৬-এর ১৭ই অক্টোবর। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ত্রিবাঙ্কুরের উপকুলস্থিত শহরগুলির ৫০০,০০০ দড়ি শ্রমিক, এদের মধ্যে মহিলা ছিল অনেক। দেওয়ান স্যর সি পি তাদের রুখবার জন্য তাঁর পুলিশ দল পাঠান। তারা হটে এল। তারপর পাঠালেন গুণ্ডা। তাদেরও হঠে আসতে হয়। এবার এল সেপাই। বিক্ষোভকারীরা যাতে অফিসগুলির সামনে যেতে না পারে, তা ঠেকাবে তারা। কিন্তু জনতার দৃঢ়তার সামনে তাদের স্তব্ধ হতে হয়। কর্তৃপক্ষও গুলি চালাবার হুকুম দিতে সাহস করেনি।

১৯৪৬-এর ২১শে অক্টোবর। স্যর সি পি-র অত্যাচারী শাসনতন্ত্রের অবসান এবং দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠার দাবী করে প্রায় এক লক্ষ শ্রমিকের বৃহত্তম ধর্মঘট হয়। ২২ অক্টোবর এই সঙ্গে যোগ দেয় নৌ, রবার, তেল এবং বস্ত্র শ্রমিকরাও। এক সর্বাত্মক ধর্মঘট।

অ্যালেপ্পীতে পুলিশের গুলিতে একজন শ্রমিক নিহত হয়। শ্রমিকরা থানা ভেঙ্গে ধুলিসাৎ করে দেয়। রীতিমত লড়াই হয় জনতায় আর পুলিশে। সামরিক আইন জারী হয়। আম্বালাপুঝা এবং এরশেরতেল্লাই-এ প্রতিটি রাস্তায় সৈন্য মোতায়েন করা হয়। তারা প্রতিটি পথচারীকে তল্লাসী করে। প্রতিটি

বাড়ীতে জোর জুলুম, লুটপাট, ভাঙ্গচুর, নির্বিচার নারী ধর্ষণ ইত্যাদি চালিয়েছে। বাড়ীঘর-দোর সব মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

দেওয়ানের সেপাইদের ভয়ে বহু নর-নারী-শিশু বায়ালোরে আশ্রয় নিয়েছিল। বায়ালোর চতুর্দিকে জল-বেষ্টিত; সেপাইরা ভাবল—ভালোই হয়েছে—একেবারে মরণ ফাঁদে পা দিয়েছে বাছাধনেরা। সেপাইদের গুলির তাই বিশেষ লক্ষ্য হল বায়ালোর। কিন্তু বাদ পড়ল সে-সাধে।

১৯৪৬-এর ২৮শে অক্টোবর। সেপাইএর দল নৌকা বোঝাই করে আসল। দেখে বায়ালোরের মানুষ শপথ নিল জান কবুল—মরতে হয়, লড়ে মরবে। নেমে এল সেপাইরা, ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। সেপাইরা চালাল মেশিন-গান, ওধারে হাতে তীর-ধনুক, সুপারী কাঠের বল্লম আর অল্প কটা বন্দুক। লড়াই চলল পাঁচ ঘণ্টা। স্যর সি, পি-র দাবী অনুসারে, মানুষ মরেছে ৫০০। কিন্তু ঠিক কতজন যে জান দিয়েছে তার হিসেব নেই। কজন মেয়ে জান দিল তা-ই বা কে জানে। মেয়েরাও লড়েছিল জান কবুল করে। তারা লড়েছিল খালি হাতে, কাস্তে হাতে, ঢিল নিয়ে। এ সংবাদ কম্যুনিস্ট-বিরোধী কাগজ দীপিকার। তারা দেখেছে কাস্তে হাতে, আর থলিতে ঢিল নিয়ে মেয়েদের মার্চ করে ছুটে যেতে। আরও বলা হয়েছে ওই কাগজে যে বায়ালোর শিবিরে অন্ততঃ ৩০০ মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের ওপর গুলি চালানো নিষেধ ছিল। কিন্তু তারা এগিয়ে গেছে—তাই মরেছেও।

পুন্নাপ্রায় সন্ত্রাসের রাজত্ব। ২৪শে অক্টোবর—সামরিক আইন ভেঙ্গে ১০,০০০ নারী-পুরুষ-শ্রমিকদের এক বিরাট জাঠা চলল পুন্নাপ্রার দিকে। ক্যাপটেন হুকুম দিলেন তাদের শিবিরের প্রতিটি জানালা থেকে ঢালাও গুলি চালাতে। তিনটে বল্লম এসে ফুঁড়ল ক্যাপটেনকে। গুলি চলল যতক্ষণ না ওদের গুলির ভাণ্ডার ফুরোল। এবার চলল বেয়নেট। ওদিকে ১০ হাজার মানুষ। হাতাহাতি লড়াই। সাতজন এ পক্ষের মরল। সৈন্যরা বন্দুক ফেলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জয় হল।

নারী আর পুরুষ শ্রমিকেরা দেখিয়ে দিল রাজ্য-গণ-সম্মেলন, জওহরলাল নেহরু আর জাতীয় নেতাদের যে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ জয় সম্ভব হত না হাজার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে—রক্ত দিয়ে কেনা এই জয়।

দশম পরিচ্ছেদ

পাঞ্জাবের নারী জাগরণ

১৯৪৩ সাল। পাঞ্জাবে খাদ্য-সংকট। সংকট বাড়ছিল আর দাম চড়ছিল দিনের পর দিন। খাদ্যশস্যের দোকানের সামনে প্রতিদিন লম্বা লাইন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লাইনে ধস্তা-ধস্তি, ঠেলাঠেলি, কে কার আগে যাবে। এর সঙ্গে আছে অসাধু দোকানদারের ইতর ব্যবহার আর কালোবাজারী। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৈরী হল পাঞ্জাবের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।

কিন্তু বহুদিন আগে থেকেই চলছিল ছাত্রী আন্দোলন। ১৯৪০ ৪১ মে ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্রী শাখা তৈরী হল। কাজ তখন হচ্ছিল ফতেচাঁদ কলেজ, কিন্নার, আর লাহোরের কলেজগুলি নিয়ে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ল লায়লপুর ও রাওলপিণ্ডিতেও। আন্দামান ও অন্যান্য জেল থেকে যাবতীয় রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে হাজার কুড়ি ছাত্রের এক শোভাযাত্রা বের হল ১৯৪১-এর এক দিন। বহু ছাত্রীও এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়।

ছাত্রীরা—বিশেষ করে মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলির শিক্ষয়িত্রীদের সংগঠিত করতে লাগল। এই ছাত্রীদের মধ্যে পূরণ মেহতা আর শীলা ভাটিয়া ছিল সবচেয়ে বেশী কর্মঠ। ১৯৪৩-৪৪-এ মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষিকাদের বিরাট এক ধর্মঘট হল। ঐ বছরই গড়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ওদের খুব সাহায্য করল।

লাহোরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে উঠলে, তার প্রথম সভানেত্রী হলেন কৃষক মহিলা বিবি রঘুবীর কৌর আর পূরণ মেহেতা হলেন প্রথম সম্পাদিকা। বিবি রঘুবীর কৌর ১৯৩৭ সনেই পাঞ্জাব বিধান সভায় নির্বাচিতা হয়েছিলেন। ১৯৩৯ সন থেকে হেন লড়াই ছিল না যাতে শ্রীমতী কৌর যোগ দেননি। জেলে যান তিনি। স্বামী দরিদ্র কৃষক, ১৯৩০ থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। জেলে থাকতেই ইনি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। এই সময়ে কম্যুনিস্ট নেতারা গা ঢাকা দিলে রঘুবীর তাদের

সাহায্য করেন ; পার্টির গোপন ছাপাখানা চালান এবং বে-আইনী কাগজ-পত্র বিলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

এর অল্প পরেই তিনি গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ হন। বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত যবার পরও বাইরে জনগণের মধ্যে তাঁর কাজ অব্যাহত থাকে। গ্রামে গ্রামে কৃষক মেয়েদের সংগঠিত করেন রঘুবীর। ১৯৪০-এর কিষান-সত্যাগ্রহের সময় রঘুবীরের এক বৎসরের জেল হয়। ছাড়া পাওয়ার পরেই একটা বক্তৃতার জন্য আবার আট মাসের জেল হয় এবং এর পরে তাঁর বক্তৃতা দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৩-এ পাঞ্জাব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সভানেত্রী হন।

মহিলাদের মধ্যে কাজ আরম্ভ হয় লাহোরে—সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই ছড়িয়ে দেওয়ার কাজের প্রধান শক্তি ছিলেন শকুন্তলা সারদা, বিবি শকুন্তলা, কাংড়ার (বর্তমান হিমাচল) শকুন্তলা শর্মা, জলন্ধরের সুনীলা, লিট্টো রায়, পেরিন ভারুচা, পূরণ মেহেতা, লাহোরের শীলা ভাটিয়া প্রমুখ মহিলারা।

আগেই বলা হয়েছে, পাঞ্জাব আত্মরক্ষা সমিতির জন্ম হয় ১৯৪৩-এ তীব্র খাদ্য-সংকটের সময়। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের সময় দুর্গতদের প্রভূত সাহায্য করে পাঃমঃআঃরঃসঃ। কলেজের পরে ছাত্রীরা এসে খাদ্যশস্যের দোকানের সামনে লাইন করে দাঁড়ানো মেয়েদের মধ্যে খাদ্য বিতরণে সাহায্য করে, জিনিসের মাপ যাচাই করে, যাতে ঠিকমত ওজনের জিনিস পায় মেয়েরা, লাইনে দাঁড়ানো মহিলাদের ওপর পুলিশের দুর্ব্যবহার বন্ধ করে ; কাজের সুবিধার জন্য রেশন কার্ডে নম্বর দেওয়ার কাজ করে, রেশন কার্ড পরীক্ষা করে, রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য আন্দোলন প্রভৃতি কাজ করে। খাদ্যের দোকানগুলি ছিল অসাধুতার কেন্দ্র। ছাত্রীদের চেষ্টায় তা বন্ধ হয়। কতগুলি দোকানের ভার সরকার পাঞ্জাব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির হাতে ছেড়ে দেয়।

এইসব কাজ করতে গিয়ে ছাত্রীরা পরিচিত হয় বিভিন্ন মহল্লার অশিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে, নিম্ন মধ্যবিত্ত মহিলাদের সঙ্গে—যারা এতদিন ছিল হিন্দু সনাতন-পন্থী এবং আর্য সমাজীদের প্রভাবের মধ্যে ; পরিচিত হয় মুসলমান মহিলাদের সঙ্গে ; তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে পাঞ্জাব মহিলা আত্ম-রক্ষা সমিতিতে—এ কাজ এই প্রথম। খাদ্য সংকটের সময় স্বেচ্ছাসেবিকাদের কাজ দেখে বহু মহিলা আকৃষ্ট হন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দিকে। এঁরা

আন্দোলন করে মেয়েদের আলাদা দোকানের জন্য, যাতে তাঁদের পুলিশী অভদ্রতা সইতে না হয়। মেয়ে-পুলিশ অত্যাচারও কম নয়—তা বন্ধ করার জন্যও চলে এদের সংগ্রাম।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য সংখ্যা ২০০০ হয়। অমৃতসরে গ্রামের ৪০০ মহিলা সভ্য হন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ; ১৯৪৩-এর অগাস্ট মাসের মধ্যে ফিরোজপুর থেকে সভ্য হলেন ১০০০ মহিলা ; কাজ আরম্ভ করার সপ্তাহ দুই-এর মধ্যে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এলেন ১১০০ জন।

ভাখনা গ্রামের মহিলা সমিতি কিছুটা জমি পায়। নিজের হাতে এই জমি চষে ধান বোনে তারা। স্থির হয় এই চাল সস্তা দরে দরিদ্র ক্ষেত-মজুরদের দেওয়া হবে—কারণ যা মজুরী পায়, তা দিয়ে চাল কিনে খাবার ক্ষমতা হয় না এদের।

১৯৪৩ সনের ২৩শে জুলাই একটি জলসা হয়। এই জলসায়, মেয়েদের সংগঠন কেন প্রয়োজন তা দেখিয়ে একটি নাটক অভিনীত হয়। তিনটি গ্রাম থেকে মহিলারা আসেন এই নাটক দেখতে, এবং দেখে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন।

রেশনের দোকানে কাজের সঙ্গে সঙ্গে শহরের মহল্লায় মহল্লায় সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলল। মেয়েদের আত্ম-বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন, এই জন্য কতগুলি কর্মকেন্দ্র খোলা হয়।

ইসলামিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের সব ছাত্রীরা পাঞ্জাব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য হল। ১১টি দোকানের মারফৎ চিনি বন্টনের ব্যবস্থা করান সম্ভব হল। স্বেচ্ছাসেবিকারা গিয়ে তদারক করত বন্টনের কাজ—যাতে ওজন ঠিক হয়, দোকানদারের অসাধুতার ওপর নজর রাখে ; পর্দানসীন মহিলাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এসে যাতে রেশন নিতে পারে, তার ব্যবস্থা করে। এই সব ছোট খাট ব্যাপারে সাহায্য মনস্পর্শ করে মহিলাদের। এরপর আরম্ভ হয় বস্তীগুলিতে কলের জল ও অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য আন্দোলন। আবহমান কাল থেকে বস্তির মহিলারা জলের জন্য দুর্ভোগ ভুগেছেন বছরের পর বছর।

১৯৪৩-এ ভাখনাতে কতগুলি কর্মী-শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা হয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে।

১৯৪৩-এর মার্চ মাসে নিখিল ভারত কিসান সম্মেলন হয় ভাখনাতে। ঐ

সময় কৃষক মেয়েদেরও একটি পৃথক সম্মেলন হয় ২রা এপ্রিল। বিবি শকুন্তলা, শকুন্তলা সারদা, রঘুবীর কাউর প্রভৃতি নতুন কর্মীরা আগে থেকেই গ্রামে গ্রামে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। তাদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০০ মহিলা আসেন এই সম্মেলনে—এর মধ্যে ২০০ জন ছিলেন মুসলমান মহিলা। বাকীরা শিখ। প্রবীণ কিসান কর্মী কারারুদ্ধ বাবা রূঢ় সিং-এর পত্নী বিবি জ্ঞান সিং সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। কৃষকদের সমস্যা সম্বন্ধে মহিলাদের সচেতন ও সক্রিয় হতে আহ্বান করে ভাষণ দেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী এবং শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক। মহিলাদের একতাবদ্ধ হতে এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগ দিয়ে নিজেদের ও সমিতির শক্তিবৃদ্ধি করতে আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দেন যশবন্ত এবং শীলা। মহিলাদের কাজে প্রোৎসাহিত করার জন্য কিষাণ সভাকে অনুরোধ জানিয়ে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিসান মহিলাদের কিসান সভার সঙ্গে এক যোগে কাজ করার এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্তভাবে দাবীর আন্দোলনে যোগ দানের আহ্বান জানান হয়। আরো খাদ্যের দোকান খোলার এবং গণ কমিটি গঠনেরও দাবী করা হয়। ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধে অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে লড়ছেন সোভিয়েটের ভগ্নিরা—তাদের অভিনন্দনও পাঠান হয়।

একটি প্রদর্শনী হয়—"সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্রবর্গ"—এই বিষয়বস্তুর ওপর। এই প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হন মহিলারা—বিশ্বাস করতে পারেন না নিজেদের চোখকে যখন ছবিতে সোভিয়েট মহিলাদের নির্ভীকভাবে হাওয়াই জাহাজ আর ট্যাংক চালানোর ছবি দেখেন। দেখেন আর ভেতরটা উথলে ওঠে উন্মাদনায়। একজন মহিলা লেনিনের ছবির সামনে প্রণাম করে বলেন, "এই মহান নেতাই মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সমান করে দিয়েছেন।"

কিসান সভার সঙ্গে একসঙ্গে কিসান মহিলাদের কাজ করার কথাবার্তা শুনে জিজ্ঞাসা করেন এক বৃদ্ধ কিসান সে কি করে সম্ভব হবে। মুখের ওপর সোজা জবাব এল "বৌদের পেটানটা একবার বন্ধ করুন দেখি।" বৃদ্ধ বললেন, "কথাটা তো মনে হয়নি এতদিন। এ তো আমরা সবাই পারি। সবাই মারত, আমরাও মারতাম।"

১৯৪৪-এর মার্চে খ্যাত-নাম্নী কংগ্রেসী নেত্রী শ্রীমতী রাধাবাই সুব্বারাওনের পৌরোহিত্যে পাঞ্জাব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয় লাহোরে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা রাজ্যে—অমৃতসর, ফিরোজপুর, রাওলপিণ্ডির মত দূরের শহরেও। জলন্ধরের জুনদালায় একটি ভালো কেন্দ্র ছিল। ভাখনা ও ওরানতরায়ও ভাল কাজ হচ্ছিল। ফিরোজপুরে, মোগা তহশীলে এবং আন্দামানের প্রখ্যাত বিপ্লবী রূঢ় সিং-এর বাড়ী যেখানে—সেই চূরচাক গ্রামে চমৎকার কাজ করছিলেন মহিলারা। এই সম্মেলনে সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হন শ্রীমতী রসিদী লতিফি এবং সম্পাদিকা হন পেরিন রমেশচন্দ্র। অমৃতসর থেকে বিদ্যাবতী সেঠ, লাহোর থেকে সীতা দেবী, ফিরোজপুর থেকে শ্রীমতী আহুজা প্রমুখ কংগ্রেস মহিলারা যোগ দেন সম্মেলনে। এদের ছাড়াও এসেছিলেন—পুরণ, স্নেহ, শৈলা, শকুন্তলা সারদা, সুশীলা চৈন সিং, বিবি শকুন্তলা, বিধান সভার সদস্যা বিবি রঘুবীর কাউর, রবীরা মাহে, এবং খদিজা প্রভৃতি কম্যুনিস্ট কর্মীরা। এঁরা সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এবং সমিতির কাজকে আরও প্রসারিত করতে বিশেষভাবে চেষ্টা করেন।

দোয়ারাতে (হোসিয়ারপুর ও জলন্ধর জেলার মধ্যবর্তী) কিসান সম্মেলন হয় ১৯৪৪-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর। সঙ্গে সঙ্গেই হল আরেকটা মহিলা সম্মেলন। এতে লাহোর, ফিরোজপুর হোশিয়ারপুর, লুধিয়ানা, মন্টগোমারী প্রভৃতি জায়গা থেকে মহিলারা এলেন প্রায় ৪৫০০। মুসলমানদের পাকিস্তানের প্রশ্ন জোরদার হয়ে উঠেছে। সম্মেলনে দাবী করা হয় পাকিস্তান যদি হতেই হয় তবে তা যেন হয় বয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণ-পরিষদ কর্তৃক তৈরী সংবিধান অনুসারে পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এবং এতে যেন সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষিত হয়। কিন্তু তার পরে কয়েকটি দশক চলে গেল, এত বড় একটা প্রশ্ন আজও স্বপ্নের বিষয়ই হয়ে রইল।

প্রস্তাব গৃহীত হয় খাদ্যের ওপরেও। এই প্রস্তাবে মজুতদার, মুনাফাখোর পাঞ্জাব মন্ত্রীসভাকে নিন্দা করা হয়, কারণ তাঁরা জনপ্রিয় খাদ্য এবং কিসান-কমিটিগুলির সহযোগিতা উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত দামে সরাসরি চাষীর কাছ থেকে চাল কিনতে অস্বীকার করে তাদের মজুতদার-মুনাফাখোরদের কাছে কমদামে চাল বিক্রী করতে বাধ্য করেছেন এবং এভাবে ঐ অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দিয়েছেন।

প্রথমে যখন খাদ্যশস্য কেনার লাইনে দাঁড়ানো মহিলাদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে লাহোরের আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরা, শীলা ভাটিয়া প্রথম গান লেখেন

এই লাইনে দাঁড়ানো মেয়েদের নিয়ে। বঙ্গ দেশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে, এবং হীর-রঞ্জার কাহিনী নিয়ে অপূর্ব, উদ্দীপনায় ভরা আরো গান লেখেন। বহু নাটকেরও অভিনয় হয়—যাতে ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। এইসব মাধ্যম আশ্চর্যভাবে মহিলাদের চেতনা জাগিয়ে তোলে। ফিরোজপুরের মত অন্য জায়গায়ও সাংস্কৃতিক দল গঠন করা হয়।

লাহোর এবং ফিরোজপুরের দুইটি সাংস্কৃতিক দল দোয়াবা সম্মেলনে দুটি অপূর্ব গান করেন—যার মর্ম ছিল "যারা আমাদের অন্ধকারে রেখেছে, অত্যাচার করছে আমাদের ওপর, তারাই আজ উপোসী রাখছে শহরের মানুষকে। এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। শ্রমিকরা বোনে কাপড় কিন্তু তারাই থাকে উলঙ্গ। এস, সবাই হাত মেলাই, কাঁধ মেলাই—রক্ষা করি আমাদের শস্যের ভাণ্ডার। তাই দিয়ে আমরা খাওয়াব শহরের মানুষকে।…খাদ্য কমিটি গুলির সাহায্যে চাল, কনট্রোল ও রেশন ব্যবস্থাকে সফল করে তুলব।"

আরেকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল—রাশিয়ায় বীর কন্যা জয়াকে নিয়ে একটি নাটক। সেই জয়া, বালিকা জয়া, ফ্যাসী-বিরোধী সংগ্রামে প্রাণ দেয়। ওসীমা রেখী জয়ার ভূমিকায় অভিনয় করে, মাতিয়ে দেয় শ্রোতৃ-বৃন্দকে। এমনি করেই জনগণের হৃদয় দ্বারে জাগরণের বাণী পাঠায় সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলি। অন্যভাবে একাজ সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

পাঞ্জাবের কম্যুনিস্ট কর্মীদের উদ্যোগে এবং তাদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে সাংস্কৃতিক দলগুলি নানা অনুষ্ঠান করে যায়—তারা উদ্বুদ্ধ করে, শিক্ষা দেয় শুধু মেয়েদের নয়—জনগণকেও। ১৯৪৪ সনের জুন মাসে শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু বের হলেন জেল থেকে। তিনি আত্মরক্ষা সমিতির কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের পাঞ্জাব শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করেন পাঞ্জাব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে।

১৯৪৪-এর জুলাই মাসের শেষ। পাশাপাশি কাজ করে যায় নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন আর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি—মেয়েদের স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার জন্য গৃহ শিল্প স্থাপন করার কাজ, রেশন ব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের কাজ, খাদ্যের দোকানগুলিতে কাজ, দুধ সরবরাহের জন্য, আর শিক্ষার জন্য আন্দোলনের কাজ এমনি আরো কত কাজ। একটা কমিটি তৈরী হল—যাতে সদস্য হলেন, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির,

লাহোর ছাত্র সঙ্ঘের ছাত্রী শাখার, মুসলমান ছাত্রী ফেডারেশন, শিক্ষয়িত্রী সঙ্ঘ আর ইস্ত্রী সহায়ক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

১৯৪৪-এর শেষ দিকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,০০০-এ। এবং এই ১৩০০০ সভ্য নিয়ে সমিতি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। পাঞ্জাবই একমাত্র জায়গা যেখানে এ সম্ভব হয় এবং এ সম্ভব হয়েছিল শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরুর উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই। অন্যান্য জায়গায় যে-সব সংস্থায় কম্যুনিষ্ট মেয়েরা কাজ করত, সেগুলি হতে শত হস্ত দূরে থাকত নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন।

১৯৪৫-এর স্বাধীনতা সপ্তাহে সমস্ত পাঞ্জাবে সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ হল। সাংস্কৃতিক দলগুলি এল সেই অভাব পূরণ করতে। চমৎকার কাজ করে চলল তারা।

১৯৪৫-এর ২৭শে জানুয়ারী একটি অভিনয় মঞ্চস্থ হল লাহোরে। বিষয়বস্তু ছিল জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং কংগ্রেস-লীগ ঐক্য। সর্ব দলের ও সর্ব স্তরের প্রায় ১২০০ মহিলা এলেন দেখতে। শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু উদ্বোধনী ভাষণে বললেন যে লাহোরে মহিলাদের এত বড় সমাবেশ আর কখনও তিনি দেখেননি। অনুষ্ঠানে গানে গানে ছবি ফুটে উঠল—সাম্রাজ্যবাদীদের আগমনের, স্বাধীনতা সংগ্রামের। কংগ্রেস-মুসলিমলীগের অভ্যুদয়, আর মহাযুদ্ধের গানের বাণী মেয়েদের মর্মের মধ্যে ডাক পাঠাল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের।

কুপল্যাণ্ড প্ল্যানের মাধ্যমে আরেকটি অপ-সংবিধান প্রবর্তন করার চেষ্টা করে বৃটিশ সরকার। গানে আর লোকনৃত্য-নাট্যে তা রূপায়িত করে পরিবেশন করা হয়। বিধানসভায় কংগ্রেস-লীগ ঐক্য দ্বারা সরকারের পরাজয় নিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক গান রচিত হয়—চানাচুর গরম বলে। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ত্যাগ করলে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে তারা সিং-এর বিবৃতি নিয়ে রচিত হয় একটি প্রহসন। উঁচু হারে কর ধার্য হওয়ার দরুন মানুষের যে দুর্দশা হল, তা, আর সরোজিনী নাইডুর আশার বাণী—যে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য হওয়া রোজ সূর্য ওঠার মতই সত্য—এই নিয়েও হয় গান লেখা। বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে স্বতন্ত্র ভগতের লেখা গান জল আনে মানুষের চোখে। সমাজে বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা ও সম্পত্তি-বঞ্চিতা নিঃস্ব মহিলাদের শোচনীয়

অবস্থা বর্ণনা করে ও হিন্দু কোড বিল গ্রহণের আবেদন জানিয়ে রচিত হয় একটি একাংক নাটক।

জেল থেকে সদ্য-মুক্ত শ্রীমতী সীতা দেবী, শ্রীমতী অচিন্ত রামের মত কংগ্রেসের নেত্রীস্থানীয় মহিলারা এই সব গান আর নাটক দেখে এত মুগ্ধ আর অভিভূত হন যে তাঁরা বলেন—যারা কম্যুনিস্টদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে—তাদের সঙ্গে কাজ করতে চায় না—তাদের ভুল ভাঙ্গানোই তাঁদের ব্রত। অমৃতসরের কংগ্রেস নেত্রী বিদ্যাবতী সেঠ শুধু এই নাটক দেখতেই এলেন এবং ফিরে গেলেন গভীরভাবে অভিভূত হয়ে। বিদ্যাবতী সেঠের সঙ্গে এসেছিল অমৃতসর কলেজের ছাত্রীরাও। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কথা বলত না এরা ১৯৪২-এর অগাস্ট থেকে—এরাও ফিরে গেল মুগ্ধ হয়ে। আরো এলেন—ইস্ত্রী সহায়ক সভার শ্রীমতী সি, এল, আনন্দ, কংগ্রেস নেত্রী অমর কৌর, মুসলিম লীগ নেত্রীবৃন্দ বেগম বসির আহমেদ ও বেগম তাসাদের হোসেন—সকলের বুকেই গভীর ছোঁওয়া লাগল এই সব নাটক আর গান দেখে আর শুনে। তাঁরা অভিনন্দন জানান কর্মীদের।

সব থেকে সুখী হলেন মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ভগ্নী)—তাঁর ছাত্রীদের তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন জাতীয় এবং নানা সংগ্রাম-মূলক আন্দোলনের ভাবধারায়; সাংস্কৃতিক দলগুলিতে এই ছাত্রীরাই ছিল বেশী।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লব্ধ সব অর্থই দিয়ে দেওয়া হল AIWC আর মহিলার আত্মরক্ষা সমিতির কর্মকেন্দ্রগুলিতে। পাঞ্জাবের, বিশেষ ভাবে লাহোরের সাংস্কৃতিক দলগুলির এইসব গণ-মাধ্যম গ্রামের কৃষক মহিলাদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে এই সব মাধ্যমেই তারা জানতে পারে।

শীলা ভাটিয়া ছিলেন তৎকালীন একজন কম্যুনিস্ট কর্মী। মহিলাদের মধ্যে কম্যুনিস্ট আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক মাধ্যমের ক্ষেত্রে কাজ করতেন তিনি। একটা প্রকাণ্ড কৃষক সমাবেশকে মাতিয়ে দিলেন তিনি, ভারতের মানুষের জাতীয় জাগরণ নিয়ে রচিত গান "হুল্লে হুল্লারারি" দিয়ে। স্বতন্ত্র ভগতের গানও মানুষ কোন দিন ভুলবেনা—হীর রঞ্ঝার কাহিনীর মত পূর্ব বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাসের গ্রামের একটি মেয়ের কাহিনী—দুর্ভিক্ষ-পিষ্ট

বাংলার মেয়েদেরই প্রতীক কাহিনী নিয়ে বাঁধা সেই অমর গান।° ১৫,০০০ শ্রোতা বসে রইল স্তব্ধ হয়ে—শুধু ঝরতে লাগল তাদের চোখের জল।

পাঞ্জাবের মেয়েরা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল মহিলাদের নিয়ে। হিন্দু কোড্ বিলের সমর্থনে তাদের আন্দোলনের কথা এই বই-এরই সামন্ত-তান্ত্রিক আইন-কানুন ও প্রথা বিরোধী আন্দোলনের অধ্যায়ে লেখা হয়েছে।

কিন্তু সব ভেঙ্গে চুরে ধুলোয় মিশে গেল ১৯৪৭-এ—যখন ভারত ভাগ হল—পাকিস্তান হল, লাহোর চলে গেল পাকিস্তানে—হিন্দু আর মুসলমান আলাদা হয়ে গেল—দাঙ্গায়, নির্মম হত্যাকাণ্ডে পাঞ্জাবের মাটি রক্তে যখন রাঙ্গা হল। আবার নতুন করে গড়ে তোলা—পুরাতনের ভস্মের, আবার ধৈর্য দিয়ে গড়ে তুলতে হবে প্রাণের ইমারত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ওয়রলিদের দাসত্ব হতে মুক্তি

ভারতীয় কম্যুনিস্টদের সংগ্রামের ইতিহাসে গোদাবরী পারুলেকর একটি নাম। মহারাষ্ট্রের থানা জেলার অন্তর্গত উম্বারগাঁও, ডাহানু এবং পালঘর তালুকের আদিম উপজাতি—অর্ধ নগ্ন, আধুনিক শহর বোম্বাই-এর মাত্র মাইল ষাটেক দূরে—বন-জঙ্গল হতে কোন মতে খুঁটেখাওয়া মানুষ নাম-ধারী কতগুলি জীব—তাদেরই আবহমান কালের দাস্য থেকে মুক্তির আলোয় নিয়ে আসেন গোদাবরী পারুলেকর।

পুনার মেয়ে গোদাবরী পারুলেকর, বড় হয়েছেন সেখানেই। শ্রী এন্ এম জোশীর প্রেরণায় অল্প বয়সেই তিনি সার্ভ্যান্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে যোগ দেন। ট্রেড ইউনিয়নেরও কাজ করেন গোদাবরী এবং নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং কাজও করি তাঁর সঙ্গে। পরে তিনি এবং শান্তা ভালেরাও কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে আকৃষ্ট হন। গোদুতাই নামেই সবাই ডাকে গোদাবরীকে—এবং তাঁর স্বামী কমরেড এস পারুলেকর, দুজনেই কৃষক সভার মাধ্যমে নামেন কাজে ওয়র্লিদের মধ্যে।

বছর শতেক আগে আদিবাসীরাই ছিল সমস্ত জমির মালিক। ইংরেজরা আসার পরে হিন্দু, মুসলমান, পার্সী সবাই এসে ভিড় করতে লাগল এসব এলাকায়। একেবারে নিরক্ষর, নেহাৎ নিরীহ এই আদিবাসীরা। তারই সুযোগ নিয়ে আরম্ভ হল এদের জমি লুণ্ঠন। এবং অল্প দিনের মধ্যে সবাই জমি হারাল এবং দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার হয়ে বসল লুণ্ঠনকারীরা এবং চলল এদের অমানুষিক ও অকল্পনীয় শোষণ। এই শোষণ চলল দুইভাবে। এক হল নিজেদের জমিতে ওয়রলিদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে নেওয়া; এই বেগার খাটিয়ে নেওয়ার মধ্যে ছিল ওরা নিজেদের জন্য চাষ করে যেটুকু ফসল ফলাত তা শুদ্ধু কেড়ে নেওয়া; দ্বিতীয় হল ওদের দিত একেবারে নীরস কিছু জমি, তাও আধা বা তার বেশী বখরার শর্তে। ঐ জমিকেই জমি-ভুখা ওই

আদিবাসীর দল পরম বিত্ত বলে মনে করত। পাছে ঐটুকু জমিদার কেড়ে নেয় সেই ভয়ে নিরীহ মানুষগুলো জমিদারের ক্ষেতে, খামারে, ঘাস জমিতে, বনে, সর্বত্র সব রকম বেগার দিত। বিয়ে করতে এদের প্রায় ৪০'০০ থেকে ৫০'০০ টাকা লাগত। কয়েক বছর বেগার দেবার শর্তে সেই টাকা তাদের ধার করতে হত। কিন্তু এই কয়েক বছর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবন শর্তেই দাঁড়াত এবং কখনও তাতেও শেষ হত না। চলত বংশানুক্রমে।

শুধু বেগার নয়—জমিদারের অমানুষিক অত্যাচার। সে অমানুষিকতার বুঝি সীমা নেই। জমিদারের জমিতে নিজেরই হাতে পোঁতা আম গাছের একটি আম খাওয়ার জন্য বেচারা এক ওয়রলিকে গাছে বেঁধে চাবুক মারতে মারতে পিট ফালা ফালা করে দেয় জমিদার। বেগার দিতে অস্বীকার করার অপরাধে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে বেঁধে মাথা নীচে করে ঝুলিয়ে, মাথার ঠিক নীচে আগুন জ্বেলে নাকে চোখে লঙ্কা পোড়ার ধোঁয়া আর সঙ্গে সঙ্গে পিঠে চাবুক যতক্ষণ না বেগার দিতে স্বীকার করে ততক্ষণ। প্রত্যেক জমিদারের দেউড়ীতে ঝোলান থাকত চাবুক—এই ওয়রলিদের ক্রীতদাসত্বের প্রতীক।

এই দাসত্বের অভিশাপ থেকে বাদ যেতনা মেয়েরাও। প্রজার বৌ-ঝিদের জমিদার মনে করত তারই সম্পত্তি। তার যথেচ্ছ ভোগের বস্তু ছিল এরা। এই যথেচ্ছ ভোগজাত সন্তানদের নিয়ে ওয়াট্টা নামে একটি আলাদা শ্রেণীরই সৃষ্টি হয়েছিল। গোদাবরী পারুলেকারের কাছে একটা বীভৎস গল্প শুনেছি। এক আদিবাসী, বৌটি তার সুন্দরী। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে জমিদার লোক পাঠাল ওকে নিয়ে যেতে। ও যেতে চাইল না। তখন ধরে নিয়ে যাওয়া হল সকলের চোখের সামনে দিয়ে। ভয়ে কেউ কোন কথা বলেনি। স্বামী ফিরে একটু হৈ চৈ করতে তাকে জ্যান্ত মাটির নীচে পোঁতা হল। তার ভাইকেও শাসান হল—টুঁ শব্দটি করলে তার ভাগ্যেও তাই হবে। তবু এ ঘটনার কথা ছড়াল চার-দিকে। একটা মামলার প্রহসন হল। গর্ত খুঁড়ে যে হাড় পাওয়া গেল—সিভিল সার্জন রায় দিলেন তা কোন জন্তুর হাড়।

এদের এই জীবনে আশা আর আলো নিয়ে এলেন গোদাবরী পারুলেকার এবং তাঁর স্বামী। গোদাবরী হয়ে উঠলেন ওদের বাই।

"বেগার প্রথা ধ্বংস হোক", আওয়াজ প্রথম শুনল এই আদিবাসীরা ১৯৪৫ সনে, থানা জেলার তিত্তোয়াল্লা গ্রামে যখন মহারাষ্ট্র কিষান সম্মেলন হল।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘরে ফিরল তারা লাল পতাকা নিয়ে। আরম্ভ করল বেগার দিতে অস্বীকার করতে—জমিদারের অত্যাচার যেতে লাগল সীমা ছাড়িয়ে। অসহায় হয়ে পড়ল ওরা।

এলেন গোদাবরী বাই—নিজের চোখে দেখবেন এদের অবস্থা। থানা জেলার উম্বেরগাঁও-এর অন্তর্গত তালেসারী গাঁয়ে প্রথম সভার আয়োজন আরম্ভ করলেন গোদাবরী। হেঁটে চললেন গ্রামের পর গ্রাম, পাহাড় পেরিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে পায়ে হেঁটে। আদিবাসীদের ভাঙ্গা কুঁড়েয় বা আস্তাবলে কখনও জোটে আশ্রয়—কখনও মাঠে ঘাটে। খান তাদেরই অখাদ্যের মতো খাদ্য—পান সকলের অসীম ভালোবাসা, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা। দেখলেন তিনি নিজের চোখে, বুঝলেন বুক দিয়ে।

জেগে উঠল ওয়রলিরা। ১৯৪৫-৪৭ সেই মহা-জাগরণের পর্ব—নারী-পুরুষ-শিশু সব ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামে।

কিসান সভা আদিবাসীদের সম্মেলন ডাকল ১৯৪৫-এর ২০শে মে। উমরাও তালুক থেকে হাজারে হাজারে আদিবাসীরা এল জারিতে সম্মেলনে যোগ দিতে। এই সম্মেলনের বাণী তারা নিয়ে গেল দাহানু, আম্বেসারি এবং ধনগাঁও-এর ভাই-বেরাদরদের কাছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ১০ মাইল পর্যন্ত যত গ্রাম ছিল সর্বত্র সভা-সমিতি হতে লাগল, হাজারে হাজারে আদিবাসীরা এসে যোগ দিল সেই সব সভায়।

কোসবাদে সভা হল ৮ই অক্টোবর। ৭০০০ আদিবাসী এল সেই সভায়। "বিবাহ-বেগার" (অর্থাৎ বিয়ের জন্য নেওয়া ঋণের বেগারের শর্ত) রুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হল। চার ভাগে ভাগ হয়ে গেল ওরা। প্রত্যেক দল মিছিল করে এক এক দিকে গেল। প্রত্যেক জমিদারের বাড়ী গেল ওরা। এই 'বিবাহ-বেগার' বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হল ওদের মুক্তি আন্দোলনের প্রথম ধাপ। ওরা আওয়াজ তুলল "নেংটি হাঁড়ি সামলে নাও, লড়াইএতে যোগ দাও," "বিয়ের বেগার খাটবনা, গোলাম হয়ে থাকব না।" প্রত্যেক বাড়ীর সামনে এসে ওরা থামে আর আওয়াজ তোলে—শুনে আদিবাসীরা আর তাদের বৌরা যে যেখানে কাজ করছিল—ফেলে ছুটে আসে মিছিলে। তিন দিন চলল এই পরিক্রমা। জমিদারের যথেচ্ছ অত্যাচার আর ভোগের বস্তু ছিল এই 'বিবাহ-দাসেরা'। আজ তারা ভয়ে মুখ লুকিয়ে রইল বন্ধ ঘরের পেছনে।

আজ তাদের দাপট বন্ধ। আদিবাসীরা তাদের মুখের ভাষা ও বুকের বল পেল লাল ঝাণ্ডার কাছ থেকে—তাই বলেন গোদারী সকলের গোদুতাই।

১০ই অক্টোবর ১৯৪৫ সন। চার দিকে রটে গেল—গোদুতাই সভা ডেকেছেন তালওয়াডা গাঁয়ে—তাঁর জীবন বিপন্ন—ছুটে চলুক আদিবাসীরা কাস্তে, কুড়ুল যা পায় নিয়ে। তাই ছুটল ওয়রলিরা, তালওয়াডার চার দিকের প্রায় ২০টি গ্রাম থেকে ছুটে এল ৭০০০ মানুষ হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে।

এল পুলিশ। ওদের সশস্ত্র দেখে চালাল গুলি। আবার ওরা শুনল, পরের দিন ১১ই অক্টোবর সভা হবে লালঝাণ্ডার ডাক। আগের দিনের গোলাগুলির কথা গ্রাহ্য না করে এল ৪০০০ মানুষ। কিন্তু মিথ্যে গুজব। কিসান সভার একজন কোন মতে সেখানে পৌঁছে জানিয়ে দিল তা। চালাকী খেলা হয়েছে ওদের ওপর। দেরী না করে বাড়ী যাক ওরা।

কিন্তু ওরা বাড়ী যাবার আগেই এল পুলিশ। সরাসরি চালাল গুলি। জখম হল দুজন ওয়রলি। শেষ হয়ে গেলেন জেঠিয়া গংগড়।

এর কদিন পরেই গোদাবরী পারুলেকর এবং তাঁর স্বামীর প্রবেশ নিষেধ হল থানা জেলায়।

১৯৪৫-এর ১৫ থেকে ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে জমিদার ও পুলিশের যে অত্যাচার চলল আদিবাসীদের ওপর তা অবর্ণনীয়। কিন্তু আদিবাসীদের টলান গেলনা। জমিদারের ঘাস-জমির ঘাস কাটা হয়না; সংকট দেখা দিল বোম্বাইতে। অবশেষে মাথা নত করতে হল সরকারকে। পারুলেকারদের ওপরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হল: সমস্ত আটক আদিবাসীকে ছেড়ে দিতে হল; কিসান সভার দাবী ছিল আদিবাসীদের দৈনিক মজুরীর হার হবে ২·৫০ এবং ৩·০০; কিন্তু জমিদার ৩·৫০ টাকা—৪·৫০ টাকা দিতেও রাজী হলেন কারণ অবিলম্বে ঘাস না কাটলে বিপদ। জয় হল আদিবাসীদের এবারে ওরা আত্ম-বিশ্বাসের আলো পেল—উপলব্ধি করল একতার শক্তি।

১৯৪৬-এর দশহরা দেওয়ালীর মরশুম। গাছ কাটার ধুম পড়েছে। যুদ্ধকালীন মুনাফায় ফুলে উঠেছে ঠিকাদারের দল। তবু গাছকাটার মজুরী রইল দিন চার আনা। আদিবাসীরা চাইল ১ টাকা চার আনা। লালঝাণ্ডার ডাকে ১৫০০ ওয়রলির কুড়ুল থামল। তারা ধর্মঘট করল। মোষের গাড়ীও

চালায়না আদিবাসীরা, কিসান সভার অনুমতি পত্র পেলে তবে তারা তাদের গাড়ী ভাড়া খাটাবে। অব্যাহত রইল ধর্মঘট।

অবশেষে চুক্তি হল ১'২৫ টাকাই দেওয়া হবে। কিন্তু সরকার সে চুক্তি মানতে রাজী হল না। ১৯৪৬ সালের ১৪ই নভেম্বর আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হল। বহু ধরপাকড় হল। কিসান সভার বহু কর্মী ও গ্রেপ্তার হল। আবার পারুলেকার এবং আরো কয়েকজনের উক্ত এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হল।

বহু বিবাহ-দাসকে মুক্ত করল ওয়রলিরা। সাংকাশের সাউকার হোমি-দিবিয়েরওয়ালার বাড়ী যখন ওয়রলিরা কয়েকজন বিবাহ-দাসকে ছাড়িয়ে নিতে আসে, পুলিশ আসে বন্দুক উঁচিয়ে সাউকারকে সাহায্য করতে। পুলিশ দেখে পালায় ওয়রলিরা। ওরা ভয় পেয়েছে মনে করে পুলিশ ধাওয়া করে। কিছুদূর গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ওয়রলিরা—মুখ ওদের কঠিন, ভয়ানক। পুলিশ ভয় পেয়ে, বন্দুক কানে চেপে দৌড়ে যায় হোমির বাড়ীর দিকে। এবার ধাওয়া করে ওয়রলিরা। পুলিশ ওদের কাছে কাকুতি মিনতি করে এসব কথা ওয়বলিরা যেন অন্য কাউকে না বলে। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় ওরা, তারপর কম রুজীতে যারা সাউকারের বাড়ীতে খাটছিল তাদের নিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যায়।

বহু বন্ধন থেকে মুক্তি পায় ওয়রলিরা তাদের সংগ্রামের ফলে।

নেতাদের ঐ এলাকায় প্রবেশ নিষেধ এবং বহু ওয়রলি গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও গাছ কাটা ওয়রলিদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। সরকার কাষ্ঠ ব্যবসায়ী সমিতি ও কিসান সভার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের পথ নেয়। ভয় দেখাবার জন্য বহু ওয়রলিকে মিথ্যা মামলায় জড়ান হয়। বোম্বাই থেকে আইনজীবীরা এসে ওয়রলিদের মামলা চালায়। কখনও কখনও গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া হয়, কতজনকে বহিষ্কার করা হয়। সংবাদ-পত্রে এইসব নিয়ে সোরগোল ওঠে। অবশেষে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহারে বাধ্য হয় সরকার।

পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুসলপড়া গ্রামকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয় পুলিশ ও গুণ্ডারা মিলে। শয়ে শয়ে আদিবাসীরা গিয়ে দাহানু স্টেশনের দুদিকের বিরাট বিরাট ফলের বাগানের যত গাছ সব কেটে মাটিতে শুইয়ে দিল। একটি গাছও দাঁড়িয়ে রইল না।

১৯৪৭-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা করার মিথ্যা অভিযোগে

গোদাবরী পারুলেকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। উক্ত এলাকায় আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য এক হাজার সৈন্য মোতায়েন করা হয়। কয়েকজন মারোয়ারী জমিদার ও পুলিশ বাড়ীর পুরুষরা জঙ্গলে পালিয়ে গেছে বলে মেয়েদের মারধর করে ; দলের লোকের নাম বলে দেবার জন্য ওয়রলিদের মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কালেক্টর সভা ডাকেন। একজনও আসেনা। তখন তিনি পলাতকদের পরিবারকে ধরে মারপিট করতে হুকুম দেন। ভেবেছিলেন পরিবারের ওপর নির্যাতন হলে পুরুষরা বেরিয়ে আসবে। তখন তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। দেবজী ভাগুেলের মাকে তার ছেলেকে বের করে দিতে বলে—না বের করে দিলে রাতে তাকে মেরে তার লাশ এনে ফেলে দেবে তার সামনে। তানু ভালবীর কুঁড়েঘরটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তানু তার বড় ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। আর তার বৌ ছোট ছেলেটিকে নিয়ে চলে যায়। কেউ আর ফেরে না। শেষ হয়ে যায় পরিবারটা।

এ লড়াই নতুন জীবন, নতুন মর্যাদা লাভের লড়াই। তাই এতে বৃহৎ ভূমিকা পালন করেন মেয়েরাও। এ যাবৎ ক্ষেত খামারে কাজ করা বেগার-শ্রমিক মেয়েরা মালিকের লালসার যথেচ্ছ শিকার হয়ে এসেছে। এই অপকর্মের লীলাভূমি খামারগুলিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল ওয়রলিরা সর্বপ্রথম, এখানেই তাদের ঘরের মেয়েদের মর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এবার চরম পন্থা নেয় সরকার। সৈন্য পাঠায়। ১৯৪৬ এর ২১শে নবেম্বর থেকে, ১৯৫৪-র ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত গোদাবরী পারুলেকার প্রকাশ্যে থানা এলাকায় আসতে পারেননি। বহু কষ্ট সয়ে, বহু বিপদ মাথায় নিয়ে গোপনে আসতেন তিনি ওখানকার লাঞ্ছিত মানুষগুলিকে বল দিতে আর সাহস দিতে। পরম যত্নে, জাগ্রত প্রহরায় ওঁকে আগলে রাখত ওয়রলিরা, রক্ষা করত বুক দিয়ে, পৌঁছে দিত বোম্বাইতে তাদের পরম ভরসার বাইকে —যে তাদের কাছে এনে দিয়েছে নতুন এক মর্যাদার জীবনের স্বাদ।

ওয়রলিদের অনমনীয় সংকল্প এবং দৃঢ়বদ্ধ একতায় প্রতিহত হয়ে পিছু হঠতে হয় সরকারকে। সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়, আটক ওয়রলিদের মুক্তি ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৫ থেকে ওয়রলিদের কঠিন সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে যায়—বিবাহ-বেগারী, বৌবেগারী, চার আনা রোজে ঘাস কাটা আর জঙ্গলের কাজ ইত্যাদি যত শোষণের আর অত্যাচারের পথ আর পদ্ধতি। নব জন্ম নেয় ওয়রলি পুরুষ আর নারী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সংগ্রামে নারী-শ্রমিক

ভারতের কারখানাগুলিতে মোট শ্রমিক সংখ্যার তুলনায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম। ১৯২৮-এ বস্ত্র শিল্পে যে বিরাট ধর্মঘট হয়, তার পর থেকে কারখানায় প্রতিটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এবং যখনই ট্রেড ইউনিয়ন কোন সংগ্রামের ডাক দিয়েছে, নারী শ্রমিকদের তার মধ্যে আনতে তারা চেষ্টা করেছে।

মেয়েরা সব সংগ্রামেই প্রথম সারিতে থেকে অত্যন্ত সাহস এবং দুঃখবরণের সঙ্গে লড়েছে। কিন্তু ইটালি, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ার মত ট্রেড ইউনিয়নের পাশে পাশে সহায়িকা নারী-শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়নি এদেশে। ঐ সব দেশে, সহায়িকা সংগঠনগুলি নারী শ্রমিক ও শ্রমিক-পত্নীদের সদা সর্বদা কাজের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করে যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেরাই ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারে।

তবু মেয়েরা পেছনে পড়ে ছিল না। ১৯৪৫-৪৬-এ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন যখন একেবারে চরম পর্যায়ে এবং ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধেও জয় হয়েছে তখন কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মঘট ও বিরাট বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। এতে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, যা থেকে বোঝা গেছে, তারা কতখানি অনুপ্রাণিত এবং দাবী-সচেতন হয়েছিল।

১৯৪৬-এ দক্ষিণ ভারত রেলওয়েতে (SIR) কয়েকজন শ্রমিককে বরখাস্ত করায় বিরাট এক ধর্মঘট হয় ২৪শে আগস্ট। ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিচিনোপল্লীর রেল কারখানাগুলিতে পুলিশ সন্ত্রাসের রাজ্য চালায়। বালিকারা ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য অর্থ সংগ্রহে বের হলে তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। কেন ওদের ধরা হল, জিজ্ঞাসা করাতে সঙ্গের মালাবার স্পেশ্যাল পুলিশের কুখ্যাত সাব-ইনস্পেক্টর গালাগালি করে এবং অশ্লীল বলে মেয়েটিকে মারতে যায়। পুলিশের গাড়ীতে কিছুতেই উঠতে রাজী হল না মেয়েরা।

সারা রাস্তা হেঁটে তারা থানায় গেল ধর্মঘটের সমর্থনে ধ্বনি দিতে দিতে এবং পুলিশী আচরণের কথা চীৎকার করে বলতে বলতে।

১৯৪৬-এর ২৬শে আগস্ট ত্রিচী রেল জংশনে ধর্মঘটের সমর্থনে ধ্বনি দেবার জন্য ধরা হয় কৃপাপুরি, এবং কমলা রামস্বামী এবং আরো ১৫ জন মেয়েকে।

SIR-এর ৪০,০০০ কর্মীর এই ধর্মঘট পুলিশী তাণ্ডব উপেক্ষা করেও চলল ২৯ দিন। মেয়েদের ওপরেও চলে পুলিশী অত্যাচার। রেহাই পায়নি ৬০ বছরের মা-ও।

১৯৪৬-এর নবেম্বরে ধর্মঘট হয় কোয়েমবাটোর বস্ত্র-কলগুলিতে। ১১ই নবেম্বর প্রায় একশ শ্রমিক মিলের দরজায় আসে পিকেটিং করতে। বহু মেয়ে ছিল এই দলে। পুলিশ কতগুলি দালালকে লরীতে করে নিয়ে আসে এবং পিকেটারদের মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার হুকুম দেয়। বেলা ৮টার মধ্যে এসে উপস্থিত হয় প্রায় হাজার পিকেটর।

পুলিশ লাঠি চার্জ করে, অবাধে চালায় বন্দুকের কুঁদো আর বেয়নেট। কালেশ্বর মিলে আম্মু বলে একটি মেয়েকে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর বেয়নেট চেপে ধরে। আম্মু বেয়নেট কেড়ে নেয়, তখন কাছ থেকে গুলি করে তাকে মেরে ফেলে মিলের ভেতরে ঢুকে পুলিশ নিরস্ত্র শ্রমিক মেয়েদের ওপর যথেচ্ছ গুলি চালায়।

শ্রমিক ভাইদের সাহায্য করার সময় শ্রমিক মেয়ে সুব্বোথাকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। মাথায় জখম হয় আরেকটি শ্রমিক মেয়ে। এক বাড়ীতে গিয়ে একটু জল খেয়ে তক্ষুণি সেই রক্ত-ঝরা মাথা নিয়ে সে ছুটে গেল কম্রেডদের কাছে।

৯-৩০-এর সময় মেট্রপালায়াম থেকে এল এক ট্রেন। রেল লাইনের ওপর পড়েছিল এক রমণীর মৃতদেহ। পুলিশ গার্ডকে তার ওপর দিয়েই ট্রেন চালিয়ে নিতে বলল। কিন্তু গার্ড সরাসরি অস্বীকার করতে পুলিশ মৃতদেহ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

গুলি চালনা বন্ধ হতে ২৫০০ শ্রমিক—তাদের আগে আগে চলছিল দুইজন মহিলা—আসে তাদের ইউনিয়নের অফিসে। পুলিশ বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। সামনের মহিলারা চীৎকার করে বলে পুলিশকে, "কর গুলি

যদি সাহস থাকে—খা, যত পারিস খা তোরা মজদুরের রক্ত।" পায়ে বুলেটের জখম নিয়ে আর একটি মেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে শোভাযাত্রার সামনে পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়াল।

এমনি দুঃসাহসী ছিল বস্ত্র-কলগুলির শ্রমিক মেয়েরা।

১৯৪৬-এর ৭ই আগস্ট বিরাট এক শোভাযাত্রা করে বিধানসভার সামনে এল বজবজ চটকলের শ্রমিকরা। বহু মহিলা শ্রমিকও ছিল এই শোভা-যাত্রায়। এরা বিধায়কদের কাছে এসেছিল "কাজের ঘণ্টা সংশোধনী আইনের" প্রতিবাদ জানাতে। এই আইন বলবৎ হওয়ায়, হাজার হাজার মেয়ের কাজ এখন যাবার মধ্যে।

এদের বাধা দেবার জন্য বিধানসভার গেটের বাইরে বিপুল এক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল। বিরোধী পক্ষের প্রখ্যাত নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর দেহেও হস্তক্ষেপ করে। বিধানসভার ভেতরে তখন তুমুল হুলুস্থুল চলছে। চার দিক থেকে প্রতিবাদের এমন তুফান উঠেছে যে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেবকে উঠে বাইরে এসে জ্যোতি বসুকে ভেতরে নিয়ে যেতে হয়। এই প্রথমবার পাটকলের এত মেয়ে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য বিধানসভায় আসে।

বোম্বের ধনরাজ কাপড় কলেও মেয়েরা লড়েছিল অসম সাহসে।

কলের কর্তৃপক্ষ ১৫০ জন মেয়ে-শ্রমিকের ওপর ছাঁটাই নোটিশ দেন ১৯৪৭-এর মার্চ মাসে। শ্রমিক মেয়েদের দাবী—ঐ নোটিশ তুলে নিতে হবে। গিরণী কামগার ইউনিয়ন তাদের সমর্থন করে। ৪ঠা মার্চ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সব মেয়ে-কর্মীরা ওই দাবী নিয়ে ম্যানেজারের অফিসে যায়।

ম্যানেজার কথাটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। মেয়েরা ওখানে বসে পড়ে। তিন দিন তারা শক্ত হয়ে অনাহারে বসে রইল সেখানে। তারা বলল—"হয় নোটিশ তুলে নাও, নয় আমাদের সঙ্গে কথা বল।"

বোম্বাই সরকারের তৎকালীন শ্রম-মন্ত্রী জি এল নন্দা ধর্মঘট বেআইনী এই অজুহাতে কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে অস্বীকার করেন।

পরের দিন পুলিশ আসবে বলে ভয় দেখান হল। পুরুষ শ্রমিকদের মেয়েদের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হল না।

সন্ধ্যার সময় ২০ জন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এল একজন ইনস্পেক্টর ও ৫ জন সাব-ইনস্পেক্টর। ম্যানেজারের সঙ্গে তারা মিলের ভেতরে ঢুকে এল ধর্মঘটী মেয়েদের কাছে—তাদের ওই এক কথা। ম্যানেজারের কাছে তারা জবাব চায়। ইনস্পেক্টর পিস্তল তুলল। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে বেদম মারপিট চালাতে লাগল। ২০ জন জখম হল, ১৪ জনের বুকে ও পেটে দারুণ আঘাত লাগল।

নরসুবাই ভীমায়া ছিল গর্ভবতী। বুকে ও পেটে সে এমন আঘাত পায় যে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। চান্দোবা বাই রমাকে পুলিশের গাড়ী থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যায়; গঙ্গুবাইয়ের হাত পেছনের দিকে মুচড়ে দেওয়া হয়।

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় দুর্বল মেয়েরা। হিন্দু, মুসলমান সব মেয়েই ছিল। নরম হল না কেউ। ওই অবস্থায় তারা হেঁটে গেল তাদের নেত্রী গঙ্গু বাইকে ছাড়িয়ে আনতে। গিরনী কামগার ইউনিয়ন গঙ্গুবাইকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে তারা ফিরে এল।

১৯৪৫-৪৬ এমনই কত সংগ্রাম যে হয়েছে—দু একটার কথা মাত্র ওপরে লেখা হল। মিলে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি এই মেয়েদের। বাড়ীতে সামন্ত-তান্ত্রিক অত্যাচার। সুযোগ পেলে এরা নিপুণ সংগঠক ও নেতা হতে পারত।

এই সব লড়াই কর্মীরা লড়েছে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনার দিনগুলিতে এসব হঠাৎ-বীরত্বের উচ্ছ্বাস নয়। কম্যুনিস্ট মেয়েদের বছরের পর বছরের নীরব, নিরলস কাজের ফল। স্বতন্ত্রতা সংগ্রামের পাশাপাশি তারই অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে।

অতএব সেই যুগে নারী শ্রমিকদের চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে যে সব মহানকর্মী প্রয়াস করে এবং পথ দেখিয়ে গেছেন তাদের কথা যদি অনুল্লিখিত থেকে যায় ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলনে কম্যুনিস্ট মহিলা কর্মীদের অবদানের এই কাহিনীতে, তবে তা অসঙ্গত হবে। নারী আন্দোলনে শ্রমিক মেয়েদের এই জাগরণ ও সংগ্রামের তাৎপর্য গভীর।

১৯২৮-২৯ থেকেই উষাতাই ডাঙ্গে শ্রমিক মেয়েদের সংগ্রামী কাজ-কর্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। সেকালের ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে উষা তাই।

বাল-বিধবা। ব্রাহ্মণ বিধবাদের ওপর সামাজিক নিষ্ঠুর অত্যাচার তাঁর ওপর দিয়ে গেছে। তাছাড়া দেখেছেন মায়ের ওপর অত্যাচার। মা যখন বিধবা হন, তিনিও বালিকাই ছিলেন। দশ দিন তাঁকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখা হল। তারপর মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হল। এবং আরও কত অত্যাচার, কত অপমান। উষা তাই-এর নিজের বিয়ে হয় ১৩ বছর বয়সে। শ্বাশুড়ীর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত নির্মম। বিয়ের ক'বছরের মধ্যেই বিধবা হন তিনি। শ্বাশুড়ী চাইলেন তাঁর মাথা মুড়িয়ে দিতে এবং চাইলেন ব্রাহ্মণ বিধবাদের জন্য যে সব নিয়মকানুন আছে তা উষা পালুক। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামী মারা যাবার তিন দিনের মধ্যে তাঁর শিশু কন্যাটিও মারা যায়। শোকে দুঃখে মুহ্যমান হলেও উষা তাঁর শ্বাশুড়ীর বিধান মেনে নিতে রাজী হলেন না —তিনি চলে এলেন পিত্রালয়ে।

সমবয়সী আর একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় উষার। মেয়েটির নাম চাবু। দুইজনের গভীর বন্ধুত্ব হয়। ক্রমে পরিবার দুটিও ঘনিষ্ঠ হল। শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে চাবুর ভাই।

ডাঙ্গে উষাতাইকে নার্সিং শেখার জন্য সেবা সদনে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। এতে শ্বাশুড়ী ভীষণ চটে যান। এবারে উষাতাই চিরকালের মত বেরিয়ে আসে শ্বশুরবাড়ী থেকে। চলে আসে বোনের বাড়ী। সেখান থেকে সে যায় সেবা সদনে। জাত পাত ভেঙ্গে ফেলে সে। সব জাতের মেয়ে ছিল সেবা সদনে। সকলের সঙ্গেই সে রান্না খাওয়া দাওয়া করে।

বছর খানেক পরে বাধা আসে কাকার কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত সেবা-গ্রাম ছাড়তে হয় উষাতাইকে। তখনকার দিনে এমনি বাধাই ছিল মেয়েদের বাইরে বেরোন এবং লেখাপড়া শেখায়।

ডাঙ্গের জেল হয়। ইন্দিরা দেশপাণ্ডে নামে উষার এক বন্ধু তাকে বম্বের কে. ই. এম. হাসপাতালে নার্সিং শিখবার জন্য বলে। ১৯২৫-২৭ এই দুবছর সে পড়ে সেখানে। উষার আর যা সংস্কার ছিল সব ভেঙ্গে গেল—মনের জড়তা থেকে একেবারে মুক্ত হল সে। এই সময়ে অনেক কিছু শিখল উষা তাই। এখানে হল তার সংগ্রামের হাতে খড়ি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বিলেতী ধরনের পোষাক পরতে হবে নার্সদের। ঘোর আপত্তি তাদের। বাধল লড়াই—জিতল নার্সরা। ভারতীয় পোষাকই পরবে তারা।

ডাঙ্গে জেল থেকে বের হলে উষাতাই-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল।

আত্মীয় স্বজনরা বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন নি। তাঁরা উষাতাইকে চিরতরে ত্যাগ করেন। মেয়ে হবার সময় ১৯৩০-এ একবার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল উষাতাই-এর।

বারাসাই গ্রামের পরিমণ্ডল থেকে বোম্বেতে এলেন উষা। নিজেই তাঁর বইয়ে স্বীকার করেছেন তিনি যে হিন্দু বিধবার মনোভাব সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তিনি—গোঁড়ামী এমনি গভীরভাবে রক্তে মজ্জায় মিশে যায় মানুষের। তাঁর বই-এ তিনি আরো লিখেছেন, তাঁর তখনকার সমগ্র রাজনীতির জগৎ ছিল মহাত্মা গান্ধী, তিলক প্রভৃতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিয়ে। তিনি বুঝতেন ডাঙ্গে আর একটু অন্যরকম কথা বলে, সে কম্যুনিস্ট। কিন্তু সব ভালো করে না বুঝে তিনি কোন কাজে যাবেন না। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সর্বত্র তিনি যেতেন।

১৯২৭-এর নবেম্বরে উষা ডাঙ্গের সঙ্গে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কানপুর গেলেন। ভারতের সব জায়গা থেকে এসেছে মানুষ—বন্ধুভাবে মিশছে, হাসছে, কথা বলছে। এ দৃশ্য আগে আর কখনও দেখেন নি উষা—এত মানুষ এবং ভিন্ন হয়েও এই একাত্মতা। অবাক হয়ে গেলেন উষা তাই। একবার ওঁকে একটা কম্যুনিস্ট. মীটিংএ নিয়ে গেলেন ডাঙ্গে। সেখানে দেখলেন শওকত উসমানীর মত মুসলমানকে, দেখলেন পাঞ্জাব থেকে আসা পাঠানদের, ইংরেজ ফিলিপ স্প্র্যাট্ এবং আরো অনেককে। শুনলেন তাঁদের বক্তৃতা। জীবনে এই প্রথমবার বুঝলেন শ্রমিক দুনিয়ায় আন্তর্জাতিকতার স্থান।

১৯২৮-এ একটা মিলে ধর্মঘট হয়। ঐ সময়ে মিলের বয়ন-শিক্ষককে কে বা কারা হত্যা করে। পাপা মিয়া এবং বাবু মারুতি এই দুইজন শ্রমিক অভিযুক্ত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সংবাদ শুনে পাপামিয়ার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে যান। কমরেড্ ডাঙ্গে ও উষাতাই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। মহিলার সন্তান সম্ভাবনা ছিল। যে-দিন ফাঁসী হয় পাপা মিয়ার, এমন চীৎকার করে ওঠেন তাঁর স্ত্রী, যে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রসব হয়ে যায়। এ চীৎকার উষা তাই-এর বহু দিন মনে থাকে।

সর্বপ্রকারে একজন বিপ্লবীর উপযুক্ত স্ত্রী হতে চেষ্টা করেন উষাতাই। সমস্ত রকম দুঃখবরণ করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি বলেন, "কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ডাঙ্গে যখন ৪ বৎসর জেলে ছিলেন—তখনকার

একাকীত্ব এবং মানসিক যন্ত্রণা আমার এখন আর ছিল না—কারণ আমার চারদিকে এখন শ্রমিক মেয়েদের জগৎ, তারাই ঘিরে আছে আমায়।"

শ্রমিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রথম পদক্ষেপ হল এবারে।

১৯২৯-এর মার্চ মাসে ডাঙ্গে আবার গ্রেপ্তার হন। এবার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। এর ছমাস পরে উষার প্রথম কন্যার জন্ম হয়। কন্যার জন্মের সাত দিন পরে সওয়ারী পুলিশ কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। ১২ দিনের উঠে উষা তাই মিলে গেল পিকেটিং করতে। মীটিংএ যাবার সময় মেয়েকে নিয়ে যেতেন। উনি যখন ব্যস্ত থাকতেন অন্য কোন মা এসে শিশুকে নিজের বুকের দুধ খাওয়াত। উষাতাই কাজ করেন এদের জন্য। এদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা উনি পেয়েছেন, তাই সবাই মা মেয়ের জন্য যেটুকু পারত করত।

শ্রমিক মেয়েরা প্রথমে এই দলের সভ্য হতে ভয় পেত। কিন্তু দাবী যখন এদের আদায় হল ১৯২৮-এর ধর্মঘটের ফলে তখন অনেকে আসতে লাগল। ম্যানেজার, সর্দার, সরদারণীদের যথেচ্ছাচার থামল। যে সব সর্দারণীরা নানাভাবে ওদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করত তারা এখন একটা সুপারিও পায় না। লাখে লাখে কর্মীরা আসত মিটিংএ, সঙ্গে মেয়ে কর্মীরাও আসত। ওরা দাবী করে ক্রেশ পেল, প্রসূতি ছুটির নিয়ম হল, কাজের সময় কমল। লালঝাণ্ডা হাতে নিয়েই এসব হল। লাল ঝাণ্ডা আর তারা ছাড়ল না।

উষাতাই-এর কাজের অনেক চমৎকার গল্প আছে। সেবার সভা করা নিষিদ্ধ হল। নেতাদের ধরা হল। কিন্তু চলতে থাকল মিটিং। পুলিশ এল লাঠি সোটা নিয়ে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে দৃশ্য পরিবর্তন হল। পুলিশ ছুটছে, মেয়েরা ছাতা নিয়ে তাদের তাড়া করছে।

আর একবারের কথা। একজন সার্জেন্ট একজন শ্রমিকের দিকে পিস্তল বাগিয়েছে। একজন মেয়ে-শ্রমিক নাম সীতা এসে তার কব্জি ধরে বলল, "আমাদের ছেলেদের মারছেন কেন?" আরো অনেক মেয়ে এসে গেল ইতিমধ্যে। সার্জেন্টকে ঘিরে ধরে হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিল।

শোষিত শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে এমনি করে শক্তি লাভ করতে লাগল।

শ্রমিকদের সংগ্রাম, ধর্মঘট ইত্যাদি আর মীরাট মামলা নিয়ে চিন্তার শেষ রইল না উষাতাই-এর। তিনি বলেন আগে ডাঙ্গের সঙ্গে চেঁচামেচি করতেন

কেন সে ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করে না ; কিন্তু এখন সে নিজেই মাঝ-রাতের আগে খাবার সময় পায়না, তাও শুধু ডাল আর ভাত, একটি সন্তান জন্মের ঠিক পরে পরেই। কিন্তু তাতেই তার গর্বের অন্ত নেই—ডাঙ্গের অনুপস্থিতিতে সে এমনভাবে কাজ করে যেতে পারছে। ডাঙ্গের জেলে থাকা-কালীন শ্রমিকরাই তাকে সাহায্য করেছে, শক্তি জুগিয়েছে। কোথা দিয়ে আর একলা লাগবে ? ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, মারাঠী বা অন্য জায়গার এসব কিছুই ভেদ থাকে না। সবাই শুধু মানুষ। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই উষাতাই শ্রমিকদের শক্তি উপলব্ধি করেন।

তারপর আসে বিটিয়া মিলসের অভিজ্ঞতা। একদিন এক শ্রমিক এসে জানায় উষাতাইকে—মিলে ধর্মঘট, শ্রমিকরা মালিককে ঘিরে বন্দী করে রেখেছে। তক্ষুণি যেতে হবে উষাতাইকে। গেলেন তিনি। পুলিশ এসেছে। মেয়েরা বসে আছে। পুরুষেরা ভেতরে। মিলের কাজ বন্ধ। কজন শ্রমিক মেয়েকে ছাঁটাই করা হয়েছে, তাই নিয়ে গণ্ডগোল। শ' সাতেক মেয়ে অফিস ঘিরে রেখেছে। তারা সিঁড়িতে বসে আছে। মিলটা রুইয়াদের। কর্মীরা তার তরুণ ছেলে সেঠের কাছে ছাঁটাই মেয়েদের ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করে। অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে, তারা তাকে ঘেরাও করে। ক্রমশ আরো মেয়ে আসতে লাগল—তারা পালা করে বাড়ী গিয়ে পরিবারের লোকদের খাওয়াবার কাজ করে। ইউনিয়ন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে রুইয়াদের যে ছেলেটিকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে তার কোন হানি করা হবে না। তবে যতক্ষণ না উষাতাই আর ডাঙ্গে রুইয়ার ওপর নজর রাখবেন বলে কথা দেন ততক্ষণ মেয়েরা যাবে না।

ছেলেটির মা উষাতাইকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন ছেলের জন্য খাবার পাঠাতে পারেন কিনা। তিনি বলেন যে মা যেন চিন্তা না করেন। শ্রমিকরা যা খাবে তার সঙ্গে ভাগ করেই খাবে।

বম্বে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী ধর্মঘটিদের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে কথা বলতে চাইলেন। ডাঙ্গে শেঠ, উষাতাই ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ী যাবার সময় পথে আর একটা গাড়ীতে সেঠের মায়ের সঙ্গে দেখা হল। গাড়ী থামিয়ে সেঠের মা নেমে ডাঙ্গেকে মিনতি জানালেন 'দেখবেন আমার ছেলের যেন কিছু না হয়। সবাই বলছে কম্যুনিস্টরা ওকে মেরে ফেলবে'। উষাতাই তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'আমরা

মানুষ মারিনা। আপনি আপনার ছেলের জন্য ভাবছেন ; কিন্তু যারা ধর্মঘট করে আছে, তাদেরও সন্তান আছে। তাদের কথা একবার ভেবেছেন।'

সেই ধর্মঘট আট মাস চলল—বলতে গেলে শ্রমিক মেয়েরাই চালাল।

এক আশ্চর্য যোগাযোগ যে ১৯২৯, সে গ্রামের মেয়ে উষাতাই যখন নানা সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন আর শ্রমিক মেয়েদের সংগঠন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেই ১৯২৯-এই জন্ম নিল উচ্চ-মধ্য-বিত্ত বুদ্ধিজীবী মহিলাদের সংগঠন—নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন। কিন্তু তফাৎ রইল দৃষ্টিকোণে আর আদর্শে। কম্যুনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে—শোষণ এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি আছে শুধু শ্রমিক শ্রেণীর। তারাই মুক্তি আনবে শুধু নিজেদের নয়, গোটা সমাজের। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কম্যুনিস্ট মেয়েরা কাজ করে শ্রমিক মেয়ে, দরিদ্র কৃষক মেয়ে, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, শহরের দরিদ্র শ্রেণীর মেয়েদের নিয়ে, তারা কাজ করে এদের জাগাতে, চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে, আর সংগঠিত করতে। আর নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কাজ হবে শুধু সমাজ আর শিক্ষা নিয়ে।

আর এক মহিলা যিনি কম্যুনিস্ট হলেন, শ্রমিক মেয়েদের বিশেষতঃ বস্ত্র শিল্পের শ্রমিক মেয়েদের নিয়ে কাজ করলেন—তিনি হলেন পার্বতীবাই ভোর। পরে তিনি গিরনি কামগারের যুগ্ম-সম্পাদিকা হন। নাপিত ঘরের মেয়ে পার্বতী। সমাজের নানা কুসংস্কারের মধ্যে জীবন। জলচলও নয়। উঁচু জাতিরা যেখান থেকে জল নেয়, যেখান থেকে এরা জল নিতে পারেনা। মেয়েরা বেরুলে খারাপ হয়ে যায় বলে ওর স্বামী ওকে বেরুতে দিতনা। কিন্তু কিছুতে আটকাতে পারল না পার্বতীকে।

পার্বতী বম্বে আসে ১৯২৮ সনে। বম্বের ৬ মাস-ব্যাপী ধর্মঘট সবে শেষ হয়েছে। পার্বতী দেখল এই ধর্মঘটে লাভ হয়েছে শ্রমিকদেরই। এখানে পরিচয় হল পাটকর, তাম্বিদকার এবং বেন ব্র্যাডলির সঙ্গে। ওর জীবনকে প্রভাবিত করল এরা।

ক্রমে পলাতক রাজনৈতিক কর্মীদের সাহায্য ও আশ্রয় দিতে লাগল পার্বতী। উষাতাই-এর সঙ্গে সে বিটিয়া মিলস-এর ধর্মঘটিদেরও সাহায্য করতে যায়। ওর পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ায় ওর কিছু উপার্জনের দরকার হয়। ও কাজ করে স্বামীর আপত্তি, পরিবারেরও

আপত্তি সত্ত্বেও। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর ও দরজীর কাজ নেয় সকলের ক্রোধ ও বিদ্রূপ সহ্য করেও।

১৯৪০-এ আরম্ভ হয় মাগগি ভাতার জন্য বোম্বের শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। যুদ্ধ চলছে—জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে সাংঘাতিক। বেতনের টাকা প্রতি পাঁচআনা করে মাগগি ভাতা তাদের দাবী। তাদের আরো দাবী বোনাস ও ন্যায্য মূল্যের দোকানের। এক দিকে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, আর চার দিকে ধর্মঘট, আরেক দিকে মিল মালিকরা কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে আরো মুনাফা করার ফন্দী আঁটল। শ্রমিকরা বাধা দিল। ৬ দিনের মধ্যে কম্যুনিস্টরা সকলেই গ্রেপ্তার হল। ডাঙ্গে, রণদিভে. পাটকার, মিরাজকর সকলেই যারবেদা জেলে। পার্বতী ধর্মঘটী ভাইবোনদের জন্য টাকা তুলতে যায়। ধনীদের কাছ থেকে ফিরে আসতে হয়। সামান্য কিছু মেলে মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে। অন্যান্য মিলের শ্রমিকেরা বেতনের দিনে দিল বহু টাকা। কোহিনুর মিলে গিয়ে পার্বতী পিকেটিং করে। এই সময়ে পার্বতী জনসমক্ষে তার প্রথম ভাষণ দেয়। অতি প্রাঞ্জল বলিষ্ঠ ভাষণ। এর পর শ্রমিক শ্রেণীর বক্তাদের মধ্যে সে একজন প্রথম শ্রেণীর বক্তা হয়ে দাঁড়ায়। এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের জয় হয়। কর্তৃপক্ষ মাগগি-ভাতা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে এবং মাগগি ভাতা দেওয়ার রেওয়াজ শুরু এখান থেকেই।

মীনাক্ষী সানে আর একজন কম্যুনিস্ট মহিলা যিনি, সেই তখনকার সময়ে শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে আসেন। তাঁর আগেকার কর্মক্ষেত্র ছিল কোলাপুর—একটি বিশিষ্ট শিল্প কেন্দ্র। ৫টি কাপড়ের কল ছিল, এছাড়াও ছিল বহু তাঁত আর বিড়ির কারখানা। ১৯৩০ সনের কথা—শ্রমিকদের জন্য আইনের কোন রক্ষা-ব্যবস্থা ছিলনা। কাপড়ের কলগুলিতে কাজের সময় ছিল ১০ ঘন্টা। এমনি সাময়িক ছুটি বা অসুখের ছুটির কোন বিধান ছিল না। ১৯৩০—স্বাধীনতা যুদ্ধের তরঙ্গে উত্তাল। চারদিকে পিকেটিং আর বিদেশী বস্ত্র বর্জন, সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন। মীনাক্ষী বাই যোগ দেয় এসব সংগ্রামে। তার বড় ভাই সদাশিব সরদেশাই কম্যুনিষ্ট। তার প্রভাবে সে বুঝতে পারে কংগ্রেস আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতি। সে দেখল, তখন পর্যন্ত কোন দল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজে নামেনি, চেষ্টা করেনি তাদের নিজেদের অধিকার ও শ্রেণী-সচেতন করে

তুলতে। "এ কাজ করেছে শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টি। মীনাক্ষী বাই এ কাজও হাতে তুলে নিল।

১৯৩০-এর অর্থ-সংকট সংকট আনল শ্রমিকদের জীবনেও। তাদের বেতন কমে গেল, ছাঁটাই হতে লাগল। তারা ধর্মঘট করল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। ১৯৩৪-এ এমনি একটা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ধর্মঘট চলল তিন মাস। মীনাক্ষী বাই সোলি বাটলিওয়ালা নামে একজন তরুণ কম্যুনিষ্টকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল সেখানে। সাধারণতঃ এসব অসংগঠিত ধর্মঘট ভেঙ্গে যায়, শ্রমিকদের এতে বৈষয়িক লাভ বিশেষ হয় না, তবে তারা সংগ্রামী হওয়ার শিক্ষা পায়। এবং তাদের রাজনৈতিক শিক্ষাও হয়, আর শ্রেণী সচেতনতাও হয়। এই প্রথম ধর্মঘটে মহিলা কর্মীদের সংগঠিত করার কথা মীনাক্ষীর মনে হয়নি—কারণ দশ ঘণ্টা মিলে খেটে তারা ছোটে বাড়ীতে, রান্নাবান্না যাবতীয় কাজ করে আর তাদের কোন সময় থাকে না। তবু এ কথা মীনাক্ষীর মনে পড়ল যে এই মেয়েরাই কি শক্তি, সাহস আর সংকল্প নিয়ে ধর্মঘটের সময় কাজ করেছে। সুতরাং এদের সংগঠিত করলে এরা শুধু যে শ্রমিক আন্দোলনেই নেতৃত্ব দিতে পারবে তা নয়, নিজেদের বিশিষ্ট সমস্যা নিয়েও এরা লড়তে পারবে।

শহরের বিড়ি মজদুরদের অধিকাংশই মহিলা; সংখ্যায় প্রায় ১০০০। ১৯৩৬-এ এরা ধর্মঘট করে। বস্ত্র শিল্পের মেয়েদের চাইতে এদের অবস্থা অনেক শোচনীয়। এদের কাজের অর্ধেক এরা করে কারখানায়, বাকী অর্ধেক করতে হয় বাড়ীতে। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়। মজুরী পায় সামান্য—হাজার বিড়িতে মাত্র ছ আনা পয়সা। এই ধর্মঘটের পরেই, লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় বিড়ি শ্রমিকদের। মেয়েদের ধর্মঘট করা এ কালে অজ্ঞাত এবং অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। বিড়ি কারখানার মহিলা শ্রমিকদের ওই ধর্মঘটে চার দিকে আলোড়ন জাগাল। এত অভিভূত হলেন ঔপন্যাসিক এন্ এস ফাদকে, যে তিনি এসে দেখা করলেন ধর্মঘটি মেয়েদের সঙ্গে এবং পরে আগোয়ালী (অগ্নিময়ী) নামে একখানি একাঙ্কিকা লেখেন, এবং তা বিখ্যাত পত্রিকা স্ত্রী-তে ছাপান হয়। এক মাস পরে এই ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। এর ফলে মজুরী বৃদ্ধি হয় সামান্য। ফল যতই সামান্য হোক; লাভ হল আর এক দিকে, মেয়েরা আরো সচেতন ও সংকল্প-দৃঢ় হয়ে উঠল এই সংগ্রামে লড়ে।

এই ধর্মঘটের অভিজ্ঞতায় বুঝল মীনাক্ষী যে এদের সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। এই সংযোগ রাখার উপায় কি হবে? প্রথম আরম্ভ করে সে লেখা পড়া শেখানর কাজ। প্রথম দিন এল পাঁচ জন, পরের দিন তিনজন। তারপরের দিন কেউ না। সুতরাং এ চলবে না। এমন জিনিস, যা এদের যে শুধু আকৃষ্ট করবে তা নয়, এরা আসবে আপনা থেকে নিজের তাগিদে। বস্তীতে কাজ-করার সময় মীনাক্ষী অনুভব করেছে, শ্রমিক মেয়েদের জীবন কাজের ঠাস বুনোনী। তাদের কোন বিনোদনের ব্যবস্থা বা একটু আমোদ-আহ্লাদ করার কোন সুযোগ নেই। অতএব সেই পথেই চলা যায় কি না। সে স্থির করল চিরাচরিত জনপ্রিয় কোন মাধ্যমই সে গ্রহণ করবে। তাই হল। আরম্ভ করল ভজনের দল। মারাঠী ভাষায় ভালো ভালো ভজন আছে, যা একাধারে শিক্ষাপ্রদ, এবং সুরে ছন্দে প্রাণগ্রাহী। বস্তীর মেয়েদের নিয়ে সে একটি ভজন মণ্ডল গঠন করল। একে একে এল ৩৫ জন মেয়ে— তারা ঠিক সময়ে আসে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এক টাকা করে চাঁদাও দিতে লাগল। এর পর মীনাক্ষী দু একটা গানের পর দেশ বিদেশের বৃত্তান্ত শোনাতে লাগল। এবং ভজন গানের সঙ্গে বিপ্লবী গানও শেখাতে লাগল। প্রাণ মন আর খুসি দিয়ে গাইত তারা এ সব গান। এমন হয়ে দাঁড়াল যে এসব গান গাইবেই তারা রোজ। গান আলোচনার শেষে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে তারা বাড়ী যায়। তিন ঘন্টা চলত এসব বৈঠক। এমনি ডুবে থাকত এরা এর মধ্যে, কোথা দিয়ে যে সময় চলে যেত বুঝতেই পারত না। এত জনপ্রিয় হল এই দল, যে অন্য বস্তীতেও এদের ডাক আসতে লাগল, তাদের উৎসবে অনুষ্ঠানে। এরা আনন্দিত হয়, অনুপ্রাণিত হয় এই অভাবনীয় সমাদরে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এরা পুরুষ দর্শকদের সামনেও একটি চিরাচরিত নৃত্য-গীতের প্রদর্শনীও দেখাল। এদের জীবনে এ একটি নতুন এবং বিপ্লবী ঘটনা। এর মধ্যে বাদ যায়নি রাজনৈতিক দিক। দেশে বিদেশে যা ঘটেছে ও ঘটছে সে সবের সঙ্গেও রাজনৈতিক পরিচয় ঘটেছে মেয়েদের ওই একই মাধ্যমে। অছ্যুৎ, হরিজন, মুসলমান, খৃষ্টান সবাই আসত ভজন মণ্ডলে। তারাও দেশ বিদেশের কথা। তাদের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা জাগল। বহু মহিলা সাধু-সন্ন্যাসী আর গুরুদের কাছে যায়। তাদের খপ্পরে পড়ে ঠকে। ভজন মণ্ডল বহু মেয়েকে ও পথ থেকে ফিরিয়ে বাঁচিয়েছে। মণ্ডলের মেয়েরা মণ্ডল সম্বন্ধে কি ভাবে তা

জানতে চায়। তারা প্রাণ খুলে ওকে জানায় যে ভজনের দিনটির জন্য ওরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। সে দিন ওরা তাড়াতাড়ি কাজ সারে যাতে তাড়াতাড়ি মণ্ডলে আসতে পারে। যে তিন ঘণ্টা ওরা ভজন মণ্ডলে থাকে, কোন দুঃখ কষ্টের কথা ওদের মনে থাকে না।

এ ভাবেই শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে কঠিন পরিশ্রম করে চলে মীনাক্ষী সানে হাজার প্রতিবন্ধকের মধ্যেও। পেছনে পুলিশ—এক জায়গায় থাকার উপায় নেই ; আজ এখানে কাল সেখানে। গোয়েন্দা পুলিশ বাড়ীওয়ালাদের ভয় দেখায়। বিড়ি-শ্রমিক মেয়েরা যখন সন্ধ্যে বেলা বাড়ী ফেরে, কোন গলিতে দাঁড়িয়ে সে দু-চারটে কথা বলে তাদের সঙ্গে। মেয়েরাও দু এক মিনিটের মধ্যে সব খবর দিয়ে ঝটপট কেটে পড়ে। মালিক জানতে পারলে চাকুরী যাবে।

শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, বিশেষ করে কম্যুনিষ্টদের এমনি কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হত। বিড়ির মেয়েদের নিয়ে মীনাক্ষী যে প্রকাশ্য সভা করবে, তার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কাগজ বিলি করেও লাভ নেই—মেয়েরা প্রায় সব নিরক্ষর। তবু অত্যাশ্চর্য ব্যাপার যে এই অবস্থার মধ্যেও বিড়ি শ্রমিক মেয়েরা নিজেদের মধ্যে চার আনা করে চাঁদা তুলে তাদের সমিতির জন্য মাসে ৫০্-৭৫্ করে দিত।

এমনি করে সেই প্রথম অবস্থায় কম্যুনিষ্ট মেয়েরা শ্রমিক মেয়েদের কল্যাণের জন্য প্রাণ ঢেলে কাজ করেছে। নানা মাধ্যম উদ্ভাবন করে, নানা ভাবে তাদের ট্রেড ইউনিয়নের দিকেই যে শুধু টেনে এনেছে ও সংগঠিত করেছে তা নয়, নিজেদের সমস্যা তাদের বুঝতে শিখিয়েছে, যাতে সে সব সমস্যা সমাধানের পথ তারা খুঁজে পায়, সেজন্য তাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগাতেও সাহায্য করেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ভারতের গোটা সমাজের ওপর সামন্ততান্ত্রিকতা জগদ্দল পাথরের মত চেপে তো বসে ছিলই ; তার ওপরেও মেয়েদের সমাজে ও পরিবারে হীন ও হেয় করে রাখার জন্য ছিল বহু সামন্ততান্ত্রিক প্রথা, নিয়ম, শাস্ত্র ও সংহিতা—বিশেষ করে মনু সংহিতা। এই সব শাস্ত্রের অনুশাসনে মেয়েরা কোন অবস্থাতেই স্বাধীন ছিল না। তারা "বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন"। এবং আবহমান কালের অভ্যস্ততায় এ জীবনই তারা সত্যকার জীবন বলে জেনেছিল।

এই অন্ধকার থেকে আলোর পথের নিশানা দিলেন রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিরাশীলিঙ্গম পান্তুলু, রানাড়ে প্রভৃতি মহামানবগণ সেই উনিশ শতকে। বহুযুগ-সঞ্চিত অন্ধকারের চাপ এক শতকে যাবার নয়। সেই সংগ্রাম চলছে সেই থেকে আজও।

তাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে কম্যুনিস্ট মেয়েরাও হাতে তুলে নিয়েছিল মেয়েদের মনের ও বাইরের বন্ধন মোচনের কাজ। তারা নানা স্তরের মেয়েদের সঙ্গে মিশে বুঝেছিল, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের চাপ মেয়েদের মনের জগতেই বেশী। সুতরাং তাদের সচেতন করে তোলার কাজই ছিল সব চেয়ে বড় ও কঠিন। কঠিন হলেও পিছ-পা হয়নি তারা।

বাধা-বন্ধন কি কম ? আছে পর্দা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক পরবশতা, বিবাহে গৌণ স্থান, উত্তরাধিকারে অসাম্য, পণ-প্রথার অভিশাপ—আরো কত কি। এ কাজে বিপ্লবী উদ্যমের প্রয়োজন। কম্যুনিষ্ট মেয়েরা শুধু একাই নয়—দেশের চিন্তাশীল, প্রগতিশীল মানুষ অনলস পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁদের সঙ্গেই কম্যুনিস্ট মেয়েরাও কাজ করে চলে। মেয়েদের বুঝিয়ে এই মুক্তির লড়াইয়ে তাদের গণ আন্দোলনের পথে উদ্বুদ্ধ করতে তারা চেষ্টা করে।

রাও বিল এল। এই সব বিষয়ে সর্বভারতে একরকম আইন হওয়াই প্রথমে কম্যুনিস্টদের কাম্য ছিল। কিন্তু প্রবল বিরোধিতার জন্য এই মত ত্যাগ করে প্রত্যেকটি বিষয় আলাদাভাবে নেওয়াই স্থির হয়। তাই বিবাহ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত হিন্দু কোড বিলটিই প্রথম নেওয়া হয়। অভিজ্ঞতায় বোঝা গিয়েছিল সব রকম গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও সংকল্প মেয়েদের নিজেদের যদি না থাকে তা হলে যতই আইন হোক বাস্তবে কোন সাম্য বা স্বাতন্ত্র্য আসবে না।

কম্যুনিষ্ট মেয়ে কর্মীরা যেতে লাগল তাই গ্রামে, গঞ্জে, শহরের বস্তি এলাকায়, নিম্নবিত্ত এলাকায়—সর্বত্র তারা বোঝাতে লাগল হিন্দু কোড্ বিলের তাৎপর্য এবং কি করে এতে খানিকটা তাদের বন্ধন মুক্তির সহায়তা হবে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি চলে গেল একেবারে গ্রামের অভ্যন্তরে। প্রতিটি জেলায় গেল তারা হিন্দু কোড্ বিলের সপক্ষে প্রচারের কাজে।

১৯৪৩-এর ২৭শে অগাস্ট নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, মহারাষ্ট্র ভগিনী সমাজ এবং AIWC-এর একটি মিলিত সম্মেলন হয় মহাবোধি সোসাইটি হলে। উক্ত সভার দাবী ছিল সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিলটিকে যত শীঘ্র সম্ভব আইনে পরিণত করা। প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী ঐ সভায় সভা-নেত্রীত্ব করেন।

এরপর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একটি সই সংগ্রহের অভিযান করে। ১৯৪৩-এর ২৭শে অগাস্টের মধ্যে ২000 সই সংগৃহীত হয়। সব জায়গায় সভা হয়। এদিকে বিলের বিরোধীরা বিলের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ বানচাল করতে উঠে পড়ে লাগল। কাজেই বড় একটা সভা ডেকে বুঝিয়ে বলতে হল—শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যা বলা হচ্ছে যে বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আর সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ—এসবই ভাঁওতা, শাস্ত্রের নামে সব মিথ্যা।

ময়মনসিংহ জেলায় ১৯টি সমিতি স্থাপিত হল। ১৯৪৩-এর ২৫শে অগাস্টের মধ্যে সবগুলি সাব-ডিভিশন এর আওতায় এল। মহিলা কর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের আলোচনা সভায় আসতে অনুরোধ করতে লাগল। নালতেবাড়ীতে সপ্তাহে দুবার করে বৈঠক বসতে লাগল।

এই সব বৈঠকে সাধারণ কথাবার্তাও হত ; নানা আলোচনাও হত নিজেদের সমস্যাদি নিয়ে। হিন্দু কোড্ বিল নিয়েও আলোচনা হত। এই সমস্ত আলোচনার পরে রাও বিলের সমর্থনে সই সংগ্রহ হত। এই সব কাজের মাধ্যমে মহিলা সমিতির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক কুরীতিগুলির প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল গ্রাম। বিবাহ এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারের সংগ্রাম নিয়ে যাওয়া হল গ্রামগুলোতেও।

১৯৪৪-এর অক্টোবর মাসে A1WC এবং মঃ আঃ রঃ সঃ-এর একটি যুক্ত কমিটি গঠিত হয় রাও কমিটির সুপারিশের সপক্ষে সংগ্রামকে জোরদার করবার জন্য। শুধু মহিলা নয় পুরুষদেরও আনতে হল টেনে এই সব আলোচনার মধ্যে। এই আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে হল তাদেরও। রাও কমিটির বিলটিকে ত্বরান্বিত করার অনুরোধ করে বৃহৎ একটি সই সংগ্রহ অভিযান হল। বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মহিলা ও পুরুষদের একটি মিলিত সভা হল কলকাতার তীর্থপতি বিদ্যালয়ে, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে। বিলটিকে ব্যাখ্যা ও সমর্থন করে ভাষণ দেন খ্যাতনামা আইনজীবী শ্রীশরৎ জানা। প্রায় ১০০ জন আগ্রহশীল মহিলা ও পুরুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরলাবালা সরকারের সভানেত্রীত্বে উত্তর কলকাতায় পরলোকগত শ্রী জে. এন, বসুর বাসভবনে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস নেতা শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী বিলটিকে সমর্থন করেন ও ব্যাখ্যা করেন। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বিলটির সমর্থন ও ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। A1WC-র রেণুকা রায় বহু প্রশ্নের উত্তর দেন। সভাটি উত্তর কলকাতার সনাতনী এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু তবুও এটি অত্যন্ত সাফল্যপূর্ণ হয়। কাত্যায়ন, নারদ, শাস্ত্রবিদ্ বলে কথিত বশিষ্ঠ প্রভৃতির বিধান উল্লেখ করে একটি পুস্তিকা রচিত হয়। উক্ত পুস্তিকায় শাস্ত্রোক্ত বিধান দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে স্বামী যদি যৌন-ব্যাধি আক্রান্ত হয়, পুরুষত্বহীন হয়, দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়—এই সব ক্ষেত্রে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ সিদ্ধ। নারদ মনুর ভাষ্যকার বলে জ্ঞাত। পরাশর মনুরও পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয়। পরাশরের স্পষ্ট মত হল, স্বামী যদি প্রব্রজিত হন, বিকলাঙ্গ হন, নিখোঁজ হন বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পুনর্বিবাহের পূর্ণ অধিকার স্ত্রীদের আছে। স্মৃতি-শ্রুতিতে নারী পণ্ডিত তাঁদের সাহায্যে

কমলা মুখার্জী একটি পুস্তিকা লেখেন। বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধী প্রস্তাবিত আইনের যে প্রবল বিরোধিতা হচ্ছিল শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ধর্ম গেল ধর্ম গেল রব তুলে, শাস্ত্র দিয়েই তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা হিন্দু ধর্মের রসাতলে যাওয়া প্রতিপন্ন করেন, তা যে অপব্যাখ্যা তা প্রমাণ করে উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে পুস্তিকাটি বের করতে হল সংযুক্ত কমিটিকে।

রাও বিলের কথা পিছিয়ে-থাকা গ্রামের মেয়েদের বোঝানো কম্যুনিস্ট কর্মীদের পক্ষে আরো কঠিন কাজ হল। শহরের মহিলা মহলেও কাজ কম কঠিন ছিল না। এমন কি বর্ধিষ্ণু পরিবারের মহিলাদেরও অস্থিতে মজ্জায় এমনভাবে বসে গেছে সনাতনী ভাবধারা যে সেখানে হাত দেওয়া কঠিন। উপরন্তু তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে যে হিন্দু ধর্মের সর্বনাশ করার জন্যই রাও বিল আনা হয়েছে।

এ জন্যই কলকাতার নানা এলাকায় ছোট বড় নানা রকম সভা সমিতি হতে লাগল।

উত্তর কলকাতার সবচেয়ে পুরানো বসতি এলাকার অধিবাসীরা একটি সভা করলেন রামমোহন লাইব্রেরী হলে। সনাতনপন্থী সুধী শ্রীবসন্ত চ্যাটার্জি বিলটির বিরোধিতা করলেন। কিন্তু সমর্থন করলেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখার্জি এবং ইলা মিত্র। বাঙ্গালী সমাজ ছাড়াও কেরল ক্লাব, সাউথ ইণ্ডিয়ান লেডিস্ ক্লাব, মহারাষ্ট্র ভগিনী সমাজ প্রভৃতিতেও বিলটি নিয়ে আলোচনা হতে লাগল।

তর্কে, আলোচনায় সপক্ষীয় বিপক্ষীয় সকলেই অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন। বেশ বোঝা গেল, রাও কমিটির কাজ চলতে থাকবে। আরো শোনা গেল কেন্দ্রীয় পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে এক-বিবাহ সম্পর্কে একটি বিল উঠবে। এই সময়ে নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন হল বরিশালে। এখানে স্থির হয় যে বিলগুলির সপক্ষে আন্দোলনকে আরো জোরদার করা হবে।

তৎকালীন কলকাতার বৃহত্তম হল কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটা বড় সভার আয়োজন হল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা দিলেন এই সভায়। হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য দলের তরফ থেকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের সব কথাই জানা ছিল—শুধু জানা ছিল না, কোন

পথে কোন ধরনে আসবে আক্রমণ ; আঁচও করা যায় নি তা। শ্রীযুক্তা নাইডু সভায় এলেন—তিল ধারণের ঠাঁই নেই হলে। এমনকি প্রবেশ পথও ভিড়ে দুষ্প্রবেশ্য। কোন রকমে তাঁকে মঞ্চে নিয়ে এলেন মণিকুন্তলা সেন। কিন্তু স্থান নেই মঞ্চে। সমস্ত চেয়ার জুড়ে বসে আছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, রমাপ্রসাদ মুখার্জি, অনুরূপা দেবী প্রমুখ হিন্দু মহাসভার চাঁই চাঁই ব্যক্তিরা। অবাঙ্গালীও ছিলেন বহু। ওপরের ব্যালকনিতে সব অবাঙ্গালী। পরে জানা গেল এঁরা বড়বাজারের নানা জাতির ব্যবসায়ী অধ্যুষিত এলাকার মহিলা ; এদের সভায় নিয়ে আসা হয়েছে। সে যাই হোক।

কিন্তু একখানা চেয়ারও ছাড়লেন না কেউ। অতি কষ্টে শ্রীমতী নাইডুর জন্য একখানা চেয়ার জোগাড় করা যল। মনিকুন্তলা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে জানালেন, শ্রীযুক্তা নাইডু বলবেন। শ্রীযুক্তা নাইডু এতক্ষণে ব্যাপারটা সবই বুঝতে পেরেছেন। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, জ্বলন্ত ভাষায় আরম্ভ করলেন তাঁর কথা। মঞ্চে যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে উঠলেন এবং ওপরের মহিলারা প্রাণপণে কোলাহল শুরু করলেন তার স্বরে। এবং তার পরেই সব সভা ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন। এরা সব পাথুরেঘাটা—সব চেয়ে কট্টর সনাতনী এলাকার মানুষ। এদের সঙ্গে আলাপে জানা গেল যে এদের মধ্যে এই মর্মে প্রচার চালান হয়েছে যে, সরকার যে আইন করছেন তা দিয়ে হিন্দু মহিলাদের মুসলমান করা হবে। খ্যাতনামা ব্যক্তিরা যে এরকম জঘন্য প্রচার চালাবেন, তা কল্পনারও অতীত ছিল। সামন্ত-তান্ত্রিক ভাবধারার দুর্গ যে এখানে কি দুর্ভেদ্য ছিল, তা এ সব ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। এই দুর্ভেদ্য দুর্গকে ভেদ করার কাজকে চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করল কম্যুনিস্ট মেয়েরা।

এ প্রতিরোধ যে শুধু বাংলাদেশেই ছিল, তা নয়। শোনা গেল, সমস্ত উত্তরপ্রদেশ জুড়ে চলছে হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য সনাতন-পন্থীদের প্রতি-বাদের প্রবল ঢেউ।

হিন্দু নাগরিকদের একটি কমিটি তৈরী হল। তাদের কাজ হল হিন্দু কোড বিলের ধারাগুলির প্রবল প্রতিরোধ করা। আশ্চর্যের বিষয় এই সমিতির সভাপতি হলেন খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রী কে এন কাটজু।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যখন বেনারসে যান, হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে

কতগুলি সভা হয় বিলটির প্রতিবাদে, এবং স্বাক্ষর সংগ্রহও করা হয়। স্কুলের নাবালিকা ছাত্রীদেরও সই নেওয়া হয়।

এই সব প্রতিবাদের সমর্থনে পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় ১৯৪৫-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী এই মর্মে একটি বিবৃতি প্রচার করেন যে, বিবাহ এবং উত্তরাধিকার বিধান সংস্কারের জন্য যে বিল আনা হয়েছে তা হিন্দু সমাজ ও নীতির বিরোধী, অতএব তা বর্জন করা উচিত।

আনীত বিলের বাদ প্রতিবাদের এই ডামাডোলের মধ্যে স্থির হয় যে AIWC-র আগ্রা শাখার বাৎসরিক সম্মেলন হবে এলাহাবাদে। শ্রীমতী হাজরা বেগম, কজন কম্যুনিস্ট মেয়ে কর্মী নিয়ে এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন।

১৯৪৫-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাও কমিটি এলাহাবাদে এলে তাঁদের কালো-পতাকা প্রদর্শন করা হয় এলাহাবাদ স্টেশনে। ভয়ানক সোরগোলের সৃষ্টি হয় এবং বহু ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে বাধা দেওয়া হয়। এত বিরোধিতা সত্ত্বেও কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই বিলের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেননি।

প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্ত হলেও, পরে শহরের মহিলা মনোরঞ্জন ক্লাব, পূর্ণিমা সম্মেলন, মহিলা ক্লাব, ছাত্র ফেডারেশন ইত্যাদিরা বিলটি আলোচনার জন্য নানা সভা সমিতি করেন। AIWC-র সম্মেলনকে ব্যর্থ করার জন্য বিপক্ষীয়-দের তরফ থেকে নানা গুজব রটনা হয়। সম্মেলন বর্জনের জন্য আন্দোলন হয়, কালো পতাকা প্রদর্শন ইত্যাদি নানাভাবে সভার কাজে বিঘ্ন ঘটান চলতে থাকে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, মিসেস বিশ্বামিত্র, মিসেস আমীর রাজা, এবং অন্যান্য প্রমুখ কংগ্রেস নেত্রীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সভানেত্রী হন লেডী চিন্তামনি; A I W C-র শাখার সভানেত্রী হন মিসেস পি এন সপ্রু। হাজরা বেগমের নেত্রীত্বে কম্যুনিস্ট মেয়েদের দল সম্মেলনের সাফল্যের জন্য ব্যাপক অভিযান চালান। সম্মেলনের সভানেত্রীত্ব করেন লেডী ওয়াজির হাসান। সম্মেলনে বিলকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় যে এই বিল আইনে পরিণত হলে হিন্দু সমাজের সুষ্ঠু এবং সুস্থ উন্নতির সহায়ক হবে। তিনি অত্যন্ত দুখের সঙ্গে জানান যে কিছু স্বার্থী ব্যক্তি বিলের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে বাধা দিচ্ছেন। তিনি এই বিলকে জনসমর্থন লাভের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে এবং দলমত-নির্বিশেষে সকলের সমর্থন লাভের চেষ্টা করার আহ্বান জানান।

অন্ধ্রপ্রদেশেও অন্ধ্র মহিলা সঙ্ঘমের সম্মেলন হয়। ৭০০০ মহিলা ও ৩০০০ পুরুষ উক্ত সম্মেলনে যোগ দেন। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল হিন্দু কোড বিল।

অন্ধ্রের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল বিশেষভাবে সামন্ততান্ত্রিক। জাতি-ভেদ, নানা রকম ধর্মীয় অন্ধ-বিশ্বাস, বহু-বিবাহ, শিশু বিবাহ, পণ-প্রথা, পুরুষদের রক্ষিতা পোষণ, মেয়েদের পর্দা ইত্যাদিতে অন্ধ্রের সমাজ জীবন ছিল অতি ক্লিন্ন ক্লিষ্ট। মেয়েদের অসূর্যম্পশ্যা হওয়া ছিল সম্ভ্রান্ততার পরিচয়।

অন্ধ্রের খ্যাতনামা সমাজ সংস্কারক বিরাশালিঙ্গম পান্তুলু ১৯১৯-২০ সনে প্রথম সমাজের এই সব কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবং সনাতনী-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-বিরোধীদের সাহায্যে তা অগ্রসর হয়। তারপর কম্যুনিস্ট কর্মীরা এই আন্দোলনে সাম্যও নারীমুক্তির বাণী নিয়ে যায় ঘরে ঘরে মহিলাদের জগতে। নতুন ভাবাদর্শের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণা, গুনটুর, পূর্ব-গোদাবরী মহিলা সংঘম। এরা জেহাদ চালায় সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ১৯৪৬ থেকে রাও কমিটির সমর্থনে চলে এই জেহাদ। উত্তরাধিকারের ব্যাপার বোঝানো তেমন কঠিন হয় না। কিন্তু ঠেকতে হয় বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারের ধারায় এসে। সংস্কার এমনি অস্থি-মজ্জাগত যে এইখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারের সুপারিশকে ফিরতে হয় ঘা খেয়ে। বহু বুঝিয়ে বলার পর, বহু দুঃখজনক বিবাহের দৃষ্টান্তের পর বিলের সপক্ষে কিছু সমর্থন ও সই পাওয়া যায়।

মোটামুটিভাবে কাজ সহজ ছিল না, তবু ছিল প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ। ছিল কিষাণ সভা, ইয়ুথ লীগ, বার অ্যাসোসিয়েশন, ছাত্র সংগঠন-গুলি, প্রগতিশীল বহু কংগ্রেসী সভ্য, তাছাড়া কম্যুনিষ্টরা তো ছিলই। এরা সবাই বিলের সমর্থন করে। ১৯৪৪-এর শেষ পর্যন্ত আগের ৭০০০ সই ছাড়াও আরো ৮০০০ সই সংগ্রহ হয়। এ সব সই আসে প্রধানতঃ গ্রাম এলাকা থেকে। সনাতন-পন্থী এলাকাগুলিতেই বিশেষভাবে কাজ করে কম্যুনিস্ট কর্মীরা। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সই সংগ্রহ হয় ৩৫,০০০।

পাঞ্জাবে মহিলা আত্মরক্ষা লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩-এ এবং গ্রামেও তা ছড়িয়ে যায়। গ্রামের মহিলারা এই প্রথম যেন একটু মুক্তির স্বাদ পায়। সামাজিক নিপীড়ন ও নানা অন্যায় অত্যাচারের কথা তারা মুখ ফুটে বলতে আরম্ভ করে।

১৯৪৪-এ রাও বিলের সমর্থনে নানা জায়গায় সভা সমিতি হতে লাগল। বিধায়িকা সীতা দেবী মিছিল করে মেয়েদের নিয়ে যান রাও কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে। মাঝপথে লাহোরের সনাতন শীতলা মন্দিরের সামনে পণ্ডিতরা তাদের রুখে বলে তারা জন সাতেক করে স্বামী চায়, আর সীতা দেবী হলেন সমাজের কলংক। পাণ্ডারা হাজার হাজার মানুষের পাল্টা মিছিল বের করল। ওরা ভয় দেখাতে লাগল, যে মেয়েরা রাও কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবে তাদের ওরা শেষ করে ফেলবে। তাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায় মেয়েরা পাড়া-পড়শীদের সাহায্যে।

১৯৪৫-এ বিবাহ বিধি ইত্যাদি সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রচারের জন্য একটি অভিনব মাধ্যম বের করে পাঞ্জাবের কম্যুনিস্ট মেয়েরা। এদের সাংস্কৃতিক দলগুলি, লোক সংগীতের ধরনে গান রচনা করে, এবং ছোট ছোট নাটিকও রচিত হয়। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, বিত্তহীন মহিলাদের দুরবস্থা এবং হিন্দু কোড বিলের উপকারিতা দেখিয়ে একটি একাঙ্কিকা লেখা হয়। এসব গান আর নাটক মেয়েদের বিশেষভাবে নাড়া দেয়। কায়েমী-স্বার্থীদের অপযুক্তিগুলি যে কত হাস্যকর তা অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় দৃশ্যে দৃশ্যে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কাজ

কম্যুনিস্ট মেয়েরা প্রধানতঃ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আওতায়ই কাজ করেছে। এ কথা বললে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সর্বস্তরের মেয়েদের এনে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনকে একটা শক্তিশালী গণ-সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টাও তারা কম করে নি। ঐ সময়ে নি. ভা. ম. স.-ই ছিল বৃহত্তম সর্বভারতীয় সংগঠন। অধিকাংশ রাজ্যেই প্রধানতঃ কংগ্রেসী মহিলাগণ নি. ভা. ম. স-র সভ্য ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে সাধারণ মহিলারা এই সংস্থাকে আপন বলে বিশেষ ভাবতে পারত না। সদ্য জেল-মুক্ত সংগ্রামী মনোভাব সম্পন্ন কংগ্রেসী মহিলাগণ, বিশেষতঃ যুগান্তর দল (বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটিতে তখন যুগান্তর দলের প্রাধান্য ছিল), অনুশীলন দল, শ্রী সংঘ প্রভৃতি দলের মহিলাগণ কংগ্রেস মহিলা সংঘেই কাজ করতেন।

AIWC-র নেত্রীস্থানীয়ারা বেশীরভাগই ছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণীর ধনী-মানী, শিক্ষিতা, রাণী, মহারাণী, বেগম ইত্যাদি। আবার কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, হংস মেহেতা, রামেশ্বরী নেহরু, মুথুলক্ষ্মী রেড্ডির মত প্রখ্যাতা কংগ্রেস নেত্রীরাও ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে কম্যুনিস্ট মহিলা কর্মীরা চেয়েছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র ওপরতলার মহিলাদের প্রতিষ্ঠান না হয়ে গ্রামের, শহরের মেহনতী, দরিদ্র, পিছিয়ে থাকা সর্বস্তরের, সর্ব দল-মতের, সর্ব অবস্থার মেয়েদের একটি প্রশস্ত, শক্তিশালী সংগঠন হোক; এবং অগুনতি যেসব মেয়েরা আজও পিছিয়ে আছে অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে, সামাজিক অত্যাচারে, তাদেরও অন্ধকার হতে আলোয় আনার কাজে ব্রতী হোক। এই জন্যই তাঁরা চাইছিলেন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক যত রকম নারী সমস্যা আছে, তা AIWC-র কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হোক।

নিখিল ভারত শিক্ষা-সংস্কার সম্মেলন দিয়েই AIWC-র কাজ আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশের ইংরেজ শিক্ষা আধিকারিক ই এফ ওটেন শিক্ষা সংস্কার

সম্বন্ধে মহিলাদের মতামত চেয়ে একটি আবেদন প্রচার করেন। উইমেনস্ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের (নারীর ভোটাধিকার অর্জনের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসান্ট, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বিশিষ্ট মহিলারা) শ্রীযুক্তা হুইডেকুপার তাঁদের প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র স্ত্রী-ধর্মের মাধ্যমে উক্ত প্রচার বার্তাটি পুনঃপ্রচার করেন। ১৯২৭-এর ৫-৭ জানুয়ারী উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি প্রতিনিধি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে শিক্ষার কাঠামো নিয়ে আলাপ আলোচনা হয় এবং সেই সম্বন্ধে গৃহীত মতামত নিয়ে একটি স্মারকলিপি রচিত হয়।

এই সভা বাল্য-বিবাহ-বিরোধী, এবং বিবাহের নিম্নতম বয়স ১৪ বৎসর প্রস্তাব করে হরিসিং গৌর এর বিলকে সমর্থন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পর্দা প্রথার বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বলা হয় যে পর্দা, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায়। সুতরাং এগুলি যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেইসঙ্গে এঁরা এ-ও দাবী করেন যে কিছু পর্দা বিদ্যালয় স্থাপিত হোক, যাতে পর্দানশীন মহিলারা শিক্ষার সুযোগ পায়। এতেই এদের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মনোভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এঁদের অন্যান্য সুপারিশ ও দাবীর মধ্যে ছিল :—

প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের উন্নতি।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উন্নততর শিক্ষণ-ব্যবস্থা।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা এবং ইংরাজী অবশ্য পাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা।

প্রাচীন ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক—হিন্দী এবং উর্দু’কে বিকল্প প্রাচীন ভাষা হিসাবে গণ্য করা।

উক্ত সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন বরোদার মহারাণী। এই সম্মেলন থেকে একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হয়, যার কাজ হবে—প্রথমতঃ যে সব রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে এসেছিলেন—শিক্ষা বিষয়ে সেইসব রাজ্যের মতামত সংগ্রহ ও তার ব্যবস্থা করা ; বিভিন্ন স্থানে যেসব কাজকর্ম করা হচ্ছে তার সঙ্গে পারস্পরিক পরিচয়ের আদান প্রদান ; তৃতীয়তঃ—সাধারণ শিক্ষানীতি সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ করা ; এবং চতুর্থতঃ—১৯২৮ সনে দিল্লীতে এই সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশনের ব্যবস্থা করা।

কমিটির সভ্যরা সকলেই শিক্ষিতা অভিজাত শ্রেণীর, প্রধানতঃ উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর ছিলেন। যথা:—

সভানেত্রী—বরোদার মহারাণী।

সহ-সভানেত্রীগণ—সাংগলির রাণী, লেডী অবলা বসু, সরোজিনী নাইডু।

অধ্যক্ষা—মিসেস্ মার্গারেট কাজিনস্।

সংগঠন-সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষা—কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।

সভ্যাবৃন্দ—শুভলক্ষ্মী আম্মল (মাদ্রাজ), হংস মেহতা (বোম্বে), মিসেস হুইডেকর (ইন্দোর), সুলেমান তায়েবজী (গুজরাট), সারদা মেহতা (বোম্বে), মিস্ ল্যাজারস্ (মহীশূর), রুস্তমজী ফ্যারিদনী (হায়দ্রাবাদ), সরলাদেবী চৌধুরাণী (বাংলা), হামিদ আলি (সিন্ধু), জানকীবাই ভাট্ (মহারাষ্ট্র), লক্ষ্মী মেনন (কেরল-কোচিন), মিসেস চ্যাটার্জি (দিল্লী), পদ্মিনী সঞ্জীব রাও (ইউ পি)।

স্পষ্টতঃই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, হংস মেহতা, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং সরলাদেবী চৌধুরাণী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কয়েকজন ছাড়া সকলেই শুধু স্থিত কাঠামোর মধ্যে সমাজ সংস্কারের কাজেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২৮ সনের ৭-৮ ফেব্রুয়ারীতে দিল্লীতে সম্মেলনের যে অধিবেশন হল, সেইটিই AIWC বা নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে পরিণত হল। এই সম্মেলনের সাফল্যে মুসলমান মহিলাদের বিশেষ অবদান ছিল। ভূপালের নবাব-মাতা বেগম মাইমুনা মুলতানা সভানেত্রী নির্বাচিতা হলেন। অধ্যক্ষা হলেন মিসেস্ হামিদ আলি, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়—সংগঠন সম্পাদিকা; রামেশ্বরী নেহরু—কোষাধ্যক্ষা। এখানেও দেখা গেল—রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ কংগ্রেসের মহিলারা বুর্জোয়া এবং সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর মহিলাদের সঙ্গে একসঙ্গেই কাজ করছেন।

১৯২৯-এর ৩-৭ জানুয়ারী পাটনায় হল তৃতীয় সম্মেলন। স্থির হল কাজ বাড়াতে হবে প্রতিষ্ঠানের, শুধু শিক্ষা নিয়ে থাকা চলবে না। সামাজিক যেসব দুষ্ট বিধি-বিধান শিক্ষা প্রসারে বাধা হচ্ছে সেসব সংস্কারের কাজও হাতে নিতে হবে।

সংবিধান রচিত হল AIWC-র—তার লক্ষ্য হল শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে নারী ও শিশুকল্যাণ। এবারে সভানেত্রী হলেন মণ্ডির রাণী।

AIWC-র চতুর্থ সম্মেলন হয় ১৯৩০ সনের ২০-২১ জানুয়ারী। সভানেত্রী নির্বাচিতা হন সরোজিনী নাইডু এবং সম্পাদিকা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। ছটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এই অধিবেশনে। প্রথম—সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার। দ্বিতীয়—শ্রমজীবী মহিলাদের সমস্যা। সংগঠিত কলে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক মহিলা ও শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত হল।

কংগ্রেস ১৯২৯ সনে পূর্ণ স্বরাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও AIWC-র ১৯২৯ ও ১৯৩০-এর অধিবেশনে তার কোন উল্লেখ বা প্রতিফলন দেখা যায় নি।

১৯২৭ সনে শিক্ষা-সংস্কার সম্মেলনের পুনা অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভান্তে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আমাদের মত বয়স্ক ও বৃদ্ধদের যুগ আর নেই। নতুন যুগ যারা আনবে—তারা আমরা নই। তারা হচ্ছে সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে—আজ তারা এগিয়ে আসছে জাতির সেবায়। এরা গ্রামের হোক, শহরের হোক, ক্ষেতে, মাঠে বা অফিসের চেয়ারেই বসা হোক বা শিশুর দোলায় দোলই দিক—এরাই জাতির নিয়ন্তা।"

তবু উঠল ঝড়—রাজনৈতিক বিষয় নারী আন্দোলনের মধ্যে থাকবে কিনা, অথবা তা নারী আন্দোলনের মুখ্য বিষয় হবে কিনা তা নিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব থেকে দেশ মুক্ত না হলে যে নারী-মুক্তি সম্ভব নয়; অতএব স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব সম্বন্ধে মহিলাদের সচেতন করে তোলা অবশ্য প্রয়োজন। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ উঠল সামন্ততান্ত্রিক ও উঁচু তলার ধনী মহিলাদের তরফ থেকে। এ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে কম্যুনিস্ট মেয়ে এবং যেসব প্রতিষ্ঠানে কম্যুনিস্ট মেয়েরা কাজ করে সেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর বহু সমাজকর্মী মহিলাদের এত বিরাগ কেন? রাজনীতি নিয়ে কাজ করে বলে ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কাছে অপাংক্তেয়। এবং মহিলা-প্রতিষ্ঠান বলে এদের কাছে স্বীকৃতিও পায় না।

জাতীয় সংগ্রাম তীব্রতর ও ব্যাপকতর হল। A I W C র মধ্যেও লাগল তার ধাক্কা। নেতৃত্ব হল দ্বিধাগ্রস্ত। একদল A I W Cকে সমস্ত রকম রাজনীতির বাইরে রাখার পক্ষপাতী। আরেকদল বোঝেন, দেশ স্বাধীন না হলে এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য না লড়লে, মেয়েদের সামাজিক, অর্থনৈতিক কোন মুক্তিই আসবে না।

কমিউনিস্ট মেয়েরা বরাবর আপ্রাণ চেষ্টা করে A I W C-র মধ্যে থেকে কাজ করতে ও প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বস্তরের মেয়েদের একটি সুপরিসর জীবন্ত গণ-প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে, যাতে সকলেই তাদের আশা আকাঙ্খা দাবি ও অধিকার লাভের সংগ্রামের সুযোগ পায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

বঙ্গদেশে কমিউনিস্ট মেয়েরা অগ্রণী হয়ে দক্ষিণ কলকাতা শাখা প্রতিষ্ঠা করে। অর্পণা সেন সম্পাদিকা হন। এই শাখার বিশেষ কর্মক্ষেত্র হল বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহিণীদের মধ্যে। সভ্য সংখ্যাও অনেক হয় এবং শাখাটি বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারকে সংশয়ের চোখে দেখেন। কারণ কমিউনিস্টদের তাঁরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং ভাবতেন তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলিকে কুক্ষিগত করা। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালি চাঁদপুর এলাকায় কমিউনিস্ট মেয়েরা কাজ করতে যাবার সময় অতি কষ্টে তারা A I W C-র সহযোগিতা পায়। A I W C-র সভ্য-চাঁদা ছিল বার্ষিক ৩'০০। কিন্তু যাতে সাধারণ এবং দরিদ্রশ্রেণীর মেয়েদের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের সভ্য হওয়া সহজ হয় সেজন্য দক্ষিণ কলকাতা শাখায় চাঁদার হার ৩'০০ থেকে নামিয়ে চার আনা করা হয়। কিন্তু ১৯৪৬-এর আকোলা সম্মেলনে এই সংবিধান-বিরোধী কাজে আপত্তি হয় এবং দেখা যায় দক্ষিণ কলকাতা শাখার কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশেরই চাঁদা কমানোয় বিশেষ আপত্তি। অতএব বন্ধ হয়ে গেল গরীব আর কৃষক-শ্রমিক মেয়েদের A I W Cতে ঢোকার পথ। মিথ্যে হয়ে গেল সরোজিনী নাইডুর সাধারণ মেয়েদের প্রতি বাণী।

বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায়ই A I W C-র শাখা ছিল। এই সব জায়গায় কমিউনিস্ট মেয়েরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ, রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা, মেয়েদের পতিতাবৃত্তি থেকে রক্ষা করা, তাদের আশ্রয় ও আর্থিক পুনর্বাসন প্রভৃতির কাজে A I W C-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে। যে সব কাজ থেকে নারী সেবাসঙ্ঘের জন্ম হল, সেই সব কাজের মধ্যেও A I W Cকে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে। যে দুর্গতি এসে মেয়েদের ওপর পড়েছে তা থেকে বাঁচার সংগ্রাম করাই তো সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

বাঁকুড়া এবং চট্টগ্রামে কমিউনিস্ট মেয়েরা A I W Cর শাখা গড়ে তুলল।

কতগুলি স্কুল এবং দুধ বিতরণ কেন্দ্র পরিচালিত হত এই শাখাগুলির দ্বারা। কমিউনিস্ট মেয়েদের চেষ্টায় A I W C গ্রামে গ্রামে গিয়েও পৌঁছেছিল ।

১৯৪৬-এ চট্টগ্রাম A I W Cতে বেশ একটা শক্তিশালী দল ছিল কমিউনিস্ট মেয়েদের—তার মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-খ্যাত কল্পনা দত্তও ছিলেন। এঁদের প্রচেষ্টায় A I W C এখানে শ্রমিক কৃষক মেয়েদের সম্পর্কেও আসে। ১৯৪৬-এর ২রা ডিসেম্বর জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন হয়। প্রতিনিধিরা সব এক সঙ্গে হয়ে সভায় আসেন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন শহরের মানুষ। A I W C-র পক্ষেও এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সভানেত্রী হয়েছিলেন শ্রীযুক্তা সান্যাল, A I W C-র স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভ্যা অশোকা গুপ্তা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রয়াত শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়; ছাত্রদের ওপর গুলি চালনার প্রতিবাদ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তি দাবী করেও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম শহরে মেয়েদের জন্য একটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনের দাবী করা হয় এবং শহরে বস্ত্রের দারুণ অভাব ও শিশুদেরও দুধের অভাবের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং যাতে জনসাধারণ এগুলি সহজে পেতে পারে সে ব্যবস্থারও দাবী করা হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন দলের সদ্য কারাগার-মুক্ত কালিকিংকরের একজন আত্মীয়া সভায় বক্তৃতা করেন ও জাতীয় সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য মহিলাদের আহ্বান জানান।

চট্টগ্রামের এই সম্মেলনই প্রমাণ করে কমিউনিস্ট মহিলারা কিভাবে চেষ্টা করে অভিজাত মহিলা ও রাণী, মহারাণীদের প্রতিষ্ঠানকে দুর্বলতর শ্রেণীর মেয়ে এবং শ্রমিক-কৃষক মেয়েদের অত কাছে নিয়ে এসেছে।

বোম্বেতে বহুদিন থেকেই সংগঠিতভাবে কাজ কর্ম হয়ে এসেছে। A I W C-রও বেশ ভাল সংগঠন ছিল সেখানে। কিন্তু কমিউনিস্ট মেয়েদের চেষ্টায় শ্রমিক মেয়েরাও A I W C-র আওতায় আসে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—মহিলাদের জীবনের সব রকম সমস্যাই আলোচিত হয় A I W C-র মঞ্চে। পরে মহিলা সঙ্ঘমের (A I W C-র একটি শাখা) সম্মেলন হয় ১৯৪৩-এর ৩রা ডিসেম্বর। সভানেত্রী ছিলেন মালতী বাদেকার

মারাঠি সাহিত্য জগতে তিনি বালুতাই খারে নামে পরিচিত। তাঁর ভাষণে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে কমিউনিস্ট কর্মীরাই A I W Cকে নতুন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করান। A I W C-র জন্মকাল হতে তার পুরো ইতিহাস বিবৃত করে তিনি বলেন যে প্রথমাবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি অভিজাত মহিলাদের সাপ্তাহিক অবসর বিনোদনের একটি মজলিশ মাত্র ছিল। ক্রমে এর মধ্যে আসেন মধ্যবিত্ত গৃহিণীরা এবং খেটে খাওয়া মহিলারা। এইসব মহিলারাই দেশের নারীজগতের বেশীর ভাগ। এদের জীবনে নতুন আলোক শিখা জ্বালাবার আহ্বান জানান সকলকে। তিনি সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলে মিশে বাংলার দুর্ভিক্ষ ত্রাণ এবং অন্যান্য কাজ করতে বলেন।

আরো বলেন মালতী বাদেকার যে, আগে মেয়েরা ভাবত রাজনীতি তাদের বিষয় নয়। তাদের একমাত্র কাজ হল রান্নাঘরে। আজ তাদের বুঝতে হবে যে রাজনীতি রান্নাঘরেও ঢুকেছে। সুতরাং আজ মেয়েদের আর সরে থাকলে চলবে না। তাদের এই প্রতিষ্ঠানে এসে সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে তাদেরই জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য। নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়—দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, খাদ্য সংকট, বাংলার দুর্ভিক্ষ, জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সমস্যা, শ্রমিক মেয়েদের জন্য প্রসূতি কল্যাণ ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে। মালতী বাদেকার ছাড়াও ভাষণ দেন কল্যাণভাই সৈয়দ, বিমলা রণদিভে, দিলশাদ চারী, কমলাবাই সোহিনী, মালতী নাগারকার, যমুনা মোকাশী,এবং কুসুম রণদিভে। এলাকাটা প্রধানত শ্রমিক এলাকা। কমিউনিস্ট মেয়েদের চেষ্টায় A I W C-র কাজ শ্রমিক এলাকায়ও ব্যাপ্ত হয়।

বাজি রসিদা লতিফকে সভানেত্রী এবং পেরিন রমেশচন্দ্রকে সম্পাদিকা করে পাঞ্জাব মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয় ১৯৪৩-এর প্রথম দিকে। A I W Cও পাশাপাশি কাজ করে চলছিল। শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরু সংস্থা দুটিকে মিলিত হয়ে যাবার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে একটি সম্মেলন হয়; উক্ত সম্মেলনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটির সভানেত্রী হন শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরু এবং সম্পাদিকা হন পেরিন রমেশচন্দ্র।

কিন্তু অন্ধ্রের অভিজ্ঞতা বিপরীত। অন্ধ্র মহিলা সঙ্ঘম বিরাট একটি

গণ-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। ১৯৪৪-এর মধ্যেই এর সভ্য সংখ্যা—২৫০০০-এ পৌঁছে যায়। সভ্যদের অধিকাংশই গ্রামের এবং কৃষক-শ্রেণীর। অন্ধ্র মহিলা সংঘম সেখানকার A I W C র শাখাটির অনুমোদন চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়।

যুক্ত প্রদেশে কমিউনিস্ট মেয়েরা A I W C-র আগ্রা ও এলাহাবাদের শাখাগুলির মধ্যে থেকেই কাজ করে। বিবাহবিধি, উত্তরাধিকার আইন, রাও বিল ইত্যাদি নিয়ে তাদের কাজ করতে হত প্রবল বিরোধিতার মধ্যে। তবু তারা অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছে।

কেবল শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজের গণ্ডীর বাইরেও A I W C-র কাজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল, এবং সমাজের একেবারে নীচের স্তরেও গিয়ে পৌঁছুল। ওপর দিকের মনোভাবেও পরিবর্তন দেখা দিল। জাতীয়তার মনোভাব ক্রমশঃই বাড়তে লাগল। স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, নিপীড়ন-নিবর্তন-বিরোধী আন্দোলন, বন্দী মুক্তি আন্দোলন সব কিছু মিলে A I W C-র চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনল।

এ ছাড়াও, কিসান, মজদুর, ছাত্র, শহরের ও গ্রামের মহিলা আন্দোলন, লাঠি বুলেটের মুখে দাঁড়িয়েও মেয়েদের লড়াই করা, পিকেটিং করা, জেলে যাওয়া, চল্লিশের দশকের এইসব আন্দোলন স্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও AIWC দেখল চোখের সামনে। তাদের দৃষ্টিকোণেও পরিবর্তন এল।

১৯৪৩-এর ২১ নভেম্বর ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির যে মীটিং হল তাতে সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া গেল। সেই সভায় স্থির হল জাতীয় নেতাদের মুক্তির পূর্বে কোন কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এবং এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হল যে জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিয়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হোক। এটাই দেশব্যাপী খাদ্য সংকট-সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

A1WC-র সব শাখাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হল সব জায়গায় বিশেষ করে দুর্দশা-পীড়িত এলাকাগুলিতে ত্রাণকার্যে রত পুরুষের হোক, মেয়েদের হোক সব রকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। এ নির্দেশ আরো তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু মতের ও মনের পরিবর্তন যে সর্বজনীন হয় নি তা বোঝা গেল

সভায় আলোচনার ধারায়। অনেকের মনেই দ্বিধা ও সংশয় রয়ে গেল। মাতৃভূমির স্বাধীনতার কাজে যে সবাই এগিয়ে যেতে পারলেন তা নয়।

সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রস্তাবে গণ্ডগোল হল সব চেয়ে বেশী। শেষ পর্যন্ত সব রকম রাজনৈতিক মতবাদের মেয়েদের সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্নটি বাদ দিয়ে সাধারণভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার কথাই স্থির হল। এতেও অবশ্য অনেকে প্রতিবাদ করেছিলেন।

১৯৪১ সনে কাঁকিনাড়ায় A1WC-র যে সম্মেলন হয়েছিল—তা থেকে অনেক তফাত ১৯৪৪-এর এপ্রিল মাসের সম্মেলনের। তৎকালে, অর্থাৎ ১৯৪১ এর অধিবেশনের সময়ে AIWC-তে প্রাধান্য ছিল অভিজাত এবং রাজভক্ত উচ্চ শ্রেণীর মহিলাদের। তারপর চলে গেছে তিন বছর। এই তিন বছরে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তীব্র আলোড়নের ধাক্কায় সর্বস্তরের মেয়েদের মধ্যে দেশের অন্নাহারে ক্লিষ্ট, দারিদ্র্য-পিষ্ট জনগণের দুঃখ ঘোচাবার সচেতনতা ও আগ্রহ এসেছে।

A1WC-র চারিত্রিক পরিবর্তনের এই হল মুখ্য কারণ। বম্বের অধিবেশন হল ১৯৪৪-এর ৭-৯ই এপ্রিল। বিপুল অভ্যর্থনা জানান হল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে তাঁর অবদানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান হল। দাদার মহিলা সমিতি A1WC-র প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানালেন। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বাংলা দেশে ত্রাণ সাহায্য পাঠানোর কাজকে ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানালেন।

A1WC-র নেত্রীস্থানীয়া মুসলমান কর্মীদের আহ্বানে ৫00 মুসলমান মহিলা এলেন সম্মেলনে। বম্বে এবং A1WC, এ দুইএর পক্ষেই এ এক অভূতপূব ব্যাপার।

প্যারেল প্রধানতঃ একটি শ্রমিক এলাকা। সেখান থেকে প্রায় ২000 মহিলা এল নেত্রীদের বক্তব্য শুনবার জন্য। A1WC-র এই শাখাটি নবতম শাখা এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের উদ্যোগে গড়া। ২000 শ্রমিক মেয়ে অতি সুশৃংখল, সংযতভাবে বসে শুনল সভার আলোচনা। দেখে অবাক হয়ে গেল কংগ্রেসী মহিলা এবং গৃহিণীরা। এ তাদের পক্ষে একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

সম্মেলনের সাধারণ আবহাওয়া ছিল—সর্বস্তরের মেয়েদের নিয়ে একটা কার্যকরী কর্মসূচী ঠিক করা হোক। কিন্তু এর মধ্যে কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট পার্টির ছোট একটা কমিউনিস্ট-বিরোধী দল কমিউনিস্টরা A1WC-কে

কুক্ষিগত করার ফিকিরে আছে, এই জিগির তুলে মহা সোরগোল তুললেন। সম্মেলন উদ্বোধন করতে উঠে মেয়র মিনু মাসানী স্বয়ং এই জেহাদের নেতৃত্ব দিলেন। কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট পার্টি চায়নি যে খাদ্যের ব্যাপারে অথবা দুর্ভিক্ষ ত্রাণের ব্যাপারে A1WC-র কোন প্রকার নেতৃত্ব থাকুক। প্রথম দিনের অধিবেশনে, তারা অশালীন ভাষায় কয়েকজন কমিউনিস্ট মহিলাকে গাল দিয়ে তাদের মুখপত্র 'হিন্দ্ প্রজার' একটি বিশেষ সংখ্যা বের করে। এই মহিলাদের মধ্যে দুজন ছিলেন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভ্যা। যাই হোক এতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। বাংলা দেশে ত্রাণ সাহায্য পাঠাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও দু'জন কমিউনিস্ট মহিলা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে নির্বাচিতা হন। কংগ্রেস-সোশ্যালিষ্ট পার্টির কার্য কলাপে প্রতিনিধিরা এত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হল যে স্বয়ং সভানেত্রী এবং বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রকাশ্যভাবে A1WC-র পক্ষ থেকে তাদের নিন্দা করেন।

গোলমালকারীদের জবাব দিলেন প্রতিনিধিরাও। A1WC-র সব চেয়ে ভালো কর্মীদের একটি তালিকা নির্বাচিত হল। তার মধ্যে ছিলেন দুইজন কমিউনিস্ট মহিলাও—পাঞ্জাব থেকে পেরিন রমেশচন্দ্র ও বঙ্গদেশ হতে রেণু চক্রবর্তী। রেণু চক্রবর্তীর ওপর ভার পড়ল শিশু এবং রমণী নিয়ে ব্যবসা প্রতিরোধের। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির কার্যকরী সমিতির নির্বাচনে সব চেয়ে বেশী ভোট পান পেরিন রমেশচন্দ্র।

সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনটি ছিল একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এতে আসেন সর্বস্তরের প্রায় ৩০০০ মহিলা। প্রতিদিন বহু শ্রমিক মেয়ে প্যারেল থেকে কয়েক মাইল মিছিল করে হেঁটে আসত সভায়।

শ্রীভুলা ভাই দেশাই তাঁর ভাষণে সোভিয়েট মহিলাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেন যে এরাই পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সমান অধিকার এবং সমান সুযোগের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ এবং বর্তমান যুদ্ধে এবং যুদ্ধোত্তর পর্বে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করবে রাশিয়া। এর পরেই ভাষণ দিলেন মেয়র মাসানী। তাঁর ভাষণের প্রথম বক্তব্যই ছিল লাল জুজুর জিগির, যার যথাযোগ্য জবাব ছিল শ্রীভুলা ভাই'এর ভাষণে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর ভাষণে বাংলার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে যতশীঘ্র সম্ভব সেখানে ত্রাণ-সাহায্য পাঠাবার জন্য A1WC-র প্রতিটি শাখাকে আহ্বান জানান। বম্বের এই অধিবেশনে, উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী মহিলারা কমিউনিষ্টদের

সঙ্গে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে সমস্ত রকম নিষ্ক্রিয়তা এবং কাজে বাধাদানের চেষ্টাকে নিন্দা করেন।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির পরের অধিবেশনটি হয় কলকাতায় ১৯৪৫-এর জুলাই মাসের ২৬-২৮ তারিখে। এই অধিবেশনে AIWC ডাক-তার ধর্মঘটীদের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে, এবং তাদের দাবীর সপক্ষেও বলিষ্ঠ সমর্থন জানায়। AICW-র বিশ বছরের ইতিহাসে এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন করা এই প্রথম। তাঁরা সরকারকে ডাক-তার কর্মীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় আসতে অনুরোধ করেন। AIWC-র পক্ষে এ একটি বৃহৎ পদক্ষেপ।

AIWC ভারতের স্বাতন্ত্র্য এবং দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার সপক্ষে হলেও, দেশের জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ অধ্যুষিত দেশীয় রাজ্যগুলির স্বৈরতন্ত্রী শাসনের নিন্দা এ যাবৎ করেনি। কিন্তু এইবারে পূর্ণ দায়িত্বশীল এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ঐ রাজ্যগুলোতে যে গণ আন্দোলন হচ্ছে তার সমর্থন জানান হল AIWC-র মঞ্চ থেকে। এবং সভা-সমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা, নাগরিক অধিকারের অস্বীকৃতি এবং ব্যাপকভাবে নেতাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদও জানান হল কিন্তু মৌন রইল কাশ্মীর এবং শেখ আবদুল্লার মুক্তির প্রশ্নে।

রাজনৈতিক দলগুলির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার, যাবতীয় রাজবন্দী, বিশেষ করে বাংলার সংস্কার-পূর্ব বন্দী, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ এবং নৌবিদ্রোহী বন্দীদের সকলের মুক্তি দাবী করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চা-বাগানের শ্রমিকদের কাজের অবস্থা সম্বন্ধে একটি বেশ ভালো প্রতিবেদন পাশ করা হয়। তাতে চা-বাগানের শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে ইউনিয়ন গঠনের অধিকার ও চা-বাগানে সকলের প্রবেশাধিকার দাবী করা হয়। এ ছাড়াও ছাত্রীদের জন্য আরও হস্টেলের ব্যবস্থা, বস্ত্র উৎপাদন বাড়ানো এবং গণ-কমিটিগুলির সাহায্যে কাপড়ের সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। খাদ্যের অবস্থা সম্পর্কে জানাবার জন্য খাদ্য আমদানী করা, গণ-কমিটির সহ-সহযোগিতায় একমাত্র সরকারের দ্বারা খাদ্য-শস্য সংগ্রহ, মজুতদারীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবী করে একটি স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর একটি প্রস্তাব করা হয়।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির কলকাতা অধিবেশনের আলাপ-আলোচনা, প্রস্তাবাদি

থেকে বোঝা যায় AIWC তাদের প্রথমকার সীমিত লক্ষ্য থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

১৯৪৬-এর ২৭ ডিসেম্বর আকোলাতে AIWC-র উনিশতম অধিবেশন হয়। ১৯৪৪-এর এপ্রিলে বম্বে অধিবেশনের পর থেকে, AIWC-কে সমগ্র নারীদের একটি প্রাণবন্ত গণ-সংগঠন করে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছে কমিউনিস্ট মেয়েরা। তারপর বন্দী আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ও বন্দী নৌ-বিদ্রোহীদের মুক্তি আন্দোলনের মত যে-সব বড় বড় ঘটনা দেশে ঘটছিল তা-ও ব্যাপকভাবে মেয়েদের—জাতীয়তাবাদী মেয়েদের মধ্যেও একটা নূতন জাগরণ আনে। আকোলা সম্মেলনে দেখা গেল, তা হারিয়ে যায়নি।

১৯৪৪-এর মাত্র ৮০০০ বিত্তবান উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সভ্যাদের ক্ষুদ্র সংগঠনটির সভ্য সংখ্যা ১৯৪৬-এ দাঁড়ায় ৩৫,০০০-এ ; এবং এই সভ্যরা এসেছেন মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, শ্রমিকশ্রেণী থেকে। যত বড় বড় প্রতিনিধিদল এসেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সমাজকর্মী, মহল্লার মেয়েরা, শিক্ষয়িত্রী, সোশ্যালিষ্ট, কমিউনিস্ট কংগ্রেসী মহিলা—সব। পর্যবেক্ষক এসেছেন মার্কিন মুলুক ও বৃটেন থেকে। প্রতিনিধি এসেছেন ইনটারন্যাশন্যাল অ্যালায়েন্স থেকে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ও ইওরোপের প্রতিরোধ আন্দোলন-কারীদের তরফ থেকে এবং চীন থেকে একজন।

অধিবেশনে আলোচনা খুবই প্রাণবন্ত হয়। প্রতিনিধিদের তরফ থেকে বহু সংশোধনী প্রস্তাব আসে—সম্মেলনের কাজকর্মে যে প্রতিনিধিরা কতটা উৎসুক এবং আগ্রহশীল, এ তারই পরিচয়। প্রতিনিধিরা নিজেরাই অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক আর আলোচনা, অভিজ্ঞতা-বিনিময় ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। সামাজিক সমস্যা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশীয় রাজ্যগুলির গণ আন্দোলন প্রভৃতি অবলম্বন করে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও তাঁরা করেন।

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-খ্যাত কল্পনা দত্তের সঙ্গে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। তাঁরই চেষ্টায় চট্টগ্রাম AIWC প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলে থাকাকালীন তিনি কম্যুনিস্ট হন। পরম আগ্রহে সবাই তাঁর কাছ থেকে শোনেন—সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় কি করে শতকরা আশী ভাগ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা থেকে দূরে থেকে দাঙ্গা ঠেকাতে পেরেছিলেন।

দশ হাজার মহিলা উপস্থিত ছিলেন আকোলা সম্মেলনে। নিবিষ্ট চিত্তে তাঁরা শোনেন সভার আলোচনা-পর্যালোচনা। AIWC-র কোনও সম্মেলনে এতবড় সমাবেশ কখনও হয়নি। বস্ত্রকলের শ্রমিক মেয়েরা তখন ধর্মঘট করছিল। তারা দলবদ্ধ হয়ে এসে নারী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে গেল।

সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রামেশ্বরী নেহরু, রাজকুমারী অমৃত কৌরের মত প্রবীণ নেত্রীরা এবারের সভায় উপস্থিত ছিলেন না। জনকয় কংগ্রেসী নেত্রী ছিলেন সভায়, কিন্তু যে-সব সমস্যায় মেয়েদের জীবন পর্যুদস্ত, উত্তেজিত, তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে না পারায় তাঁরা নেতৃত্ব দিতে পারলেন না।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে তখন গণ-সংগ্রাম তুঙ্গে। তা সত্ত্বেও দেশীয় রাজ্যের রাজ পরিবারের মহিলারা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বেরারের রাজকুমারীর সভানেত্রীত্বে AIWC-র একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। কম্যুনিস্ট প্রতিনিধি সহ অর্ধেক প্রতিনিধিরা উক্ত সভা বয়কট করেন—কারণ হায়দ্রাবাদে নারী-নির্যাতনের কথা কেউ ভুলতে পারেনি। হায়দ্রাবাদের মাচিরেড্ডী পল্লী প্রভৃতি কতগুলি গ্রামে মেয়েদের ওপর যে বর্বরতা অনুষ্ঠিত হয়, পদ্মজা নাইডু তার বিশদ বর্ণনা দেন। AIWC-র কতগুলি শাখায় এইসব ঘটনা নিয়ে আন্দোলন করা হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ১৯৪২ সনে AIWC-র কাঁকিনাড়া সম্মেলনে নাগরিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত প্রস্তাবটি স্বয়ং উত্থাপন করেন, তিনিই এবার পুলিশী এবং ফৌজী অত্যাচারের বেসরকারী অনুসন্ধান এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও নৌবিদ্রোহের বন্দীদের মুক্তির দাবী সম্বলিত প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী দুর্গাবাই দেশমুখ এবং দিল্লীর কম্যুনিস্ট নেত্রী সরলা গুপ্তার প্রস্তাবটির পক্ষে অগ্নিগর্ভ ভাষণে সভায় প্রচণ্ড আলোড়ন জাগে। প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হলে কমলা দেবী মাত্র দুটি ভোট পান।

সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবে, মহিলাদের ঐক্য-কমিটি গড়া, যুক্তভাবে ত্রাণ কার্য করা, নোয়াখালি ও বিহারে সৌহার্দ্যমূলক প্রতিনিধিদল পাঠানো—ইত্যাদি কাজ করতে বলা হয়; কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে যে বৃটিশ সরকারের চতুর হাতটি কাজ করেছে, তার উল্লেখ ইচ্ছা করেই বাদ

দেওয়া হয়, যদিও বহু শাখার সম্মেলনে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবেই প্রস্তাবে যুক্ত হয়েছে।

দেশীয় রাজ্যগুলোতে জনগণের ওপর যে বর্বরতা ও সন্ত্রাসের অনুষ্ঠান চলছে আকোলা অধিবেশনে স্পষ্ট ভাষায় তার নিন্দা করা হয়। শুধু তাই নয়—স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থারই তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানে অতীতে এবং বর্তমানে রাণী, মহারাণী ও বেগম সাহেবাদের নাম সভানেত্রীর পদকে অলংকৃত করেছে—সেই প্রতিষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঐ রকম একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ বলতে হবে। এই সম্মেলনে আরও দাবী করা হয়:

> ভারত হতে বৃটিশ সেনা প্রত্যাহার, ভারতের সেনাবাহিনীর জাতীয়করণ এবং ভারতেই অস্ত্র-নির্মাণ;
>
> শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন দান করে, এবং নিপীড়ন দ্বারা ধর্মঘট ভাঙ্গার নীতি-বর্জন প্রভৃতি দ্বারা শ্রমিক-কল্যাণ ব্যবস্থার আরও উদারীকরণ;
>
> কর্মরত মহিলাদের চাকুরীর নিরাপত্তা, ছুটির নিয়ম, প্রসূতি-কল্যাণ, জীবন-ধারণের উপযোগী বেতন, পুরুষের সঙ্গে সমান কাজে সমান বেতন, শিশু-পালন কেন্দ্রের ব্যবস্থা;
>
> জমিদারী প্রথার বিলোপ। (এই বারই প্রথম AIWC তে কিসান মহিলাদের সমস্যা বিবেচিত হল।)

সম্মেলনে পর্তুগালের অধিকার থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য গোয়া যে সংগ্রাম করছে, তার প্রতিও সমর্থন জানানো হয়।

শুধু শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজ ছাড়াও AIWC মেয়েদের নানা সমস্যা, তাদের উন্নতির পথের নানা বাধা-বন্ধ প্রতিকারের কাজও হাতে তুলে নিয়ে সর্বস্তরের মেয়েদের একটি জীবন্ত গণ-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক, এই চেষ্টাই কম্যুনিস্ট মেয়েরা বরাবর করে এসেছে। তাদের সে চেষ্টা আংশিক সফল হল বটে, কিন্তু সফল হল না বাৎসরিক ৩্ চাঁদাকে নামিয়ে চার আনায় এনে শ্রমিক, কৃষক, ও গরীব মেয়েদেরও AIWC তে প্রবেশ সহজ-সাধ্য করার চেষ্টা। সংবিধানের কাছে আর ভোটের জোরে তা ব্যর্থ হয়ে গেল। নেত্রীরা সম্ভবতঃ ভয় পেয়েছিলেন, যে এত কম্যুনিস্ট এলে ওঁদের হঠতে হবে।

আকোলায় নতুন করে যে সংবিধান তৈরী হল সেই অনুসারে শাখাগুলি

থেকে আরো প্রতিনিধি নিয়ে স্টানডিং কমিটিকে আরো বড় করা, এবং মহল্লায় মহল্লায় ও গ্রামে গ্রামে আরো প্রাথমিক কমিটি স্থাপন করার ব্যবস্থা হল। হল না শুধু ওই একটি কাজ—চাঁদার হার কমানোর কাজ। গরীবেরা তাই AIWC-র বাইরেই রয়ে গেল।

পুনার মহারাষ্ট্র-রাজ্য-মহিলা মণ্ডল AIWC-র একটি শাখা। এঁরা একটা নতুন কাজ করলেন যা ভারতের ইতিহাসে প্রথম। ১৯৪৭-এর ৩-৪ মে শিল্পে এবং বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত মেয়েদের একটা সম্মেলন করলেন।

১৯৪৬ সনে AIWC-র সভানেত্রী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে ভারতীয় মহিলাদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে একটি সনদ পেশ করেন। তার মধ্যে কর্মরত মহিলাদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধেও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। ওই সনদ অনুসারে ১৮৯২ সনে শিল্পে নিযুক্ত মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৪৩ ৫৯২ ; ১৯৪৩ সনে ওই সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৬৫,১০৯-এ।

১৯৪৬-এ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বহু কর্মী মেয়েকে ছাঁটাই এর সম্মুখীন হতে হয়। এরা বেশীর ভাগ রেশনের দোকানে ও ডাক তার বিভাগে কাজ করত।

যাই হোক, পুনার ঐ সম্মেলনে সমস্ত রকম শিল্প ও সেবা বিভাগ থেকে বহু প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে ছিলেন প্রায় ১000 মহিলা।

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের জনক শ্রী এন্ এম যোশী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। AIWC-র লেডী রমা রাও সভানেত্রীত্ব করেন। শান্তা মুখার্জি (ভালেরাও), এবং কপিলা খাণ্ডওয়ালা ভাষণ দেন। পার্বতীবাই ভোরে বম্বের বস্ত্র-কলের শ্রমিক মহিলাদের মধ্যে কাজ করতেন—তিনিও সভায় বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলন কতগুলি প্রশ্ন মহিলাদের দেয়। ৮00 জন মহিলা এই প্রশ্নাবলীর জবাব দেয়। এই সব জবাব থেকে দেখা যায় যে, নানা সেবা-নিগমে কর্মরত মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশই পরিবারের প্রধান উপার্জন-কারী। কর্মরত মেয়েদের কাজের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একটি দাবী উত্থাপন করা হয় সম্মেলনে।

কর্মরত মেয়েদের আর একটি সম্মেলন করেন AIWC-র বম্বে শাখা ১৯৪৭ এর ডিসেম্বরের ১৩ এবং ১৪ তারিখে। ব্যাংক কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী, হাসপাতাল, কল-কারখানা সবখান থেকে ১১00 মহিলা আসেন সম্মেলনে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল যে কতগুলি কারখানা থেকে বিশেষত বস্ত্র এবং রেশম কলগুলি থেকে বহু শ্রমিক মেয়েরাও আসেন।

সরোজিনী নাইডু, এন্ এম যোশী, বম্বের মেয়র সবাওয়ালা, কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী, গণ-পরিষদের সদস্যা আম্মু স্বামীনাথম্ সম্মেলনের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন-বাণী পাঠান।

কপিলা খাণ্ডোয়ালা বলেন মেয়ে কর্মীরা পুরুষদের চেয়ে কম বেতন পান। সরকারী হাসপাতালগুলিতে সেবিকারা ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করেও বেঁচে থাকার মত বেতন পায় না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা অত্যন্ত কম বেতন পায়। বিবাহিতা মেয়েদের প্রায়ই কাজে নিতে চায় না মালিকেরা। নিলেও তাদের প্রসূতি ছুটি দেওয়া হয় না। শিশু-পালন কেন্দ্র নেই বললেই হয়। তিনি মেয়ে কর্মীদের শোচনীয় অবস্থার বহু দৃষ্টান্ত দেন।

দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগের দাবী করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গিরনি কামগার ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা পার্বতীবাই ভোরে, শ্রমিক মহিলা ভগুলবাই সাভান্ট, ভাগীরথী বাই বিঠলভাই, গঙ্গুবাই প্রভৃতির উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনে সভার সকলেই মুগ্ধ এবং উদ্দীপ্ত হন। বিঠলভাই মোরারজি গোকুলদাস মিলের কর্মীদের একজন নেত্রী এবং সম্প্রতি ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে মিলে একটি ধর্মঘট পরিচালনা করেন। মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের জন্য একটি জোরাল আবেদন রাখেন ভগুলবাই সাভান্ট। তাঁর বক্তৃতার সময় বহুক্ষণ যাবৎ হাততালি পড়তে থাকে। শিক্ষয়িত্রীদের সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব রাখেন যমুনা মোকাশী। কর্মরতা মেয়েদের সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সরকারের কাছে একটি কমিটি নিয়োগের দাবী করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

AIWC-র পতাকাতলে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর মেয়েরা এই সব সম্মেলনে মিলিত হন। এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। AIWC যে শ্রমিক শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে এইটুকুই কম্যুনিস্ট দলের একটি সাফল্য।

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কম্যুনিস্ট মেয়েরা AIWC-র মধ্যে অনলস পরিশ্রম করে। তারপর পার্টি নিষিদ্ধ হলে বহুকর্মী জেলে যায়, অনেকে আত্মগোপন করে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারণ

ইওরোপের ফ্যাসি-বিরোধী শক্তিগুলির অসীম সাহস ও অমিত আত্ম-ত্যাগের, বিশেষতঃ সোভিয়েত দেশের নর-নারী ও লাল সেনার মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যের দ্বারা হিটলার বাহিনীর পরাজয় ঘটে ১৯৪৫-এর ১০ই মে। নাৎসীরা আত্ম-সমর্পণ করে, এবং বার্লিনে লাল পতাকা উড্ডীন হয়।

ফ্যাসি বর্বরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে সারা পৃথিবী। এবং ফ্যাসিদের পতনের পরেই সর্বত্র জাতীয় আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এ সাক্ষ্য মিলবে ইতিহাসের পাতায়।

আমাদের দেশেও বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন নতুন করে প্রবল হয়ে ওঠে। সেনা-বাহিনীতে চঞ্চলতা দেখা যায়। তারপরে ঘটে নৌ-বিদ্রোহ, এবং সেনা-বাহিনী ও বায়ু সেনার কোন কোন ইউনিটেও বিদ্রোহ দেখা যায়। শ্রমিক জগতের নানা বিক্ষোভ চরমে পৌঁছায় ডাক-তার ধর্মঘটে। দেশীয় রাজ্যগুলির গণ-আন্দোলনও তীব্রতর হয়। এবং তারপর আসে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশের-মুক্তি দিবস।

সঙ্গতভাবেই একটা প্রশ্ন উঠছে—জাপানী ফ্যাসিবাদ ভারতে প্রবেশ করলে তার ফল কি হত? তারা কি সম্পূর্ণভাবে ভারতকে পদানত করত, না, করলেও তা সাময়িকই হত? তবে আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম যে আরো দুঃখবহ হত, জাপানী বুটের নিষ্পেষণে মানুষকে যে আরো দুঃখ, নির্যাতন সইতে হত, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

হিটলারী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বস্ব পণ করে সব রকমে সামনের সারিতে, পেছনের সারিতে, গেরিলা হিসেবে অন্যভাবে সাহায্য করে সোভিয়েতের মহিলারা নতুন শক্তি, নতুন প্রাণ লাভ করে যেন পুনর্জন্ম লাভ করেন। তাঁরা বুঝলেন পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশকে গড়ে তোলার শক্তি তাঁদের আছে। তাঁরা পণ করলেন, আর যুদ্ধ নয়—এই সর্বনেশে যুদ্ধের সম্ভাবনা পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে তাঁরা মুছে ফেলবেন।

নারী হৃদয়ের এই দৃঢ়সংকল্প থেকে জন্ম নিল ২৫টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে উইমেনস্ ইনটারন্যাশনাল ডেমক্র্যাটিক ফেডারেশন (সংক্ষেপে W I D F)। ফরাসী মহিলাদের উদ্যোগে ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে প্যারীতে এর সম্মেলন হয়। ৩০টি দেশ থেকে ৪০০ জন প্রতিনিধি আসেন। ৭২টি দেশ আসতে পারেনি, তারা অভিনন্দন বাণী পাঠায়।

প্রতিনিধিরা সবাই এসেছিলেন যুদ্ধরত দেশগুলি থেকে। এঁরা পুরুষদের পাশে থেকে ট্রেঞ্চে, ভূমিতে, ফ্রন্টে, বা গোপন প্রতিরোধ আন্দোলনে থেকে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, বা ক্ষেতে, কলে, কারখানায় খেটে উৎপাদন অব্যাহত রেখে দেশকে আকাল আর অনাহার থেকে বাঁচিয়েছেন।

সম্মেলন থেকে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধোত্তর সরকার এবং ভাবী সরকারের কাছে দাবী জানান হয় যে সরকারে অংশগ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার এবং দেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজে তাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অংশ নেবার অধিকারের। আরো যে-সব দাবী করা হয় তা হল ভোটের অধিকার, কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার এবং মাতৃত্বের অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত আইন। ইনটারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স প্রেম অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে WIDF-এর দৃষ্টিকোণের বিশিষ্ট পার্থক্য হল যে WIDF দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফ্যাসীবাদ এবং বর্ণ-বিদ্বেষের, এবং সর্বোপরি, সর্বপ্রকারের ঔপনিবেশিকতার তীব্র নিন্দা করে। সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের রক্ষা এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হবার সংকল্পও গ্রহণ করে।

নীনা পপোভা, কোচুলাকভের মতো সোভিয়েত নেত্রীবৃন্দ, ডোলোরেস ইবারুরি ও যুগোস্লাভিয়ার অর্থমন্ত্রী কুরোর মতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলাগণ নারী-মুক্তির প্রবলতম অন্তরায় ফ্যাসিবাদের প্রতিরোধ এবং স্পেনে ফ্রাঙ্কো শাসনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলার জন্য প্রাণস্পর্শী ভাষায় সকলের কাছে আবেদন জানান।

ভারত থেকে উপস্থিত ছিলেন A I W C র দুজন প্রতিনিধি। তাঁরা উপনিবেশগুলিতে নারীর অবস্থার বিবরণ দেন এবং বলেন যে ফ্যাসিবাদের মূল হল সাম্রাজ্যবাদ ; তাই সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রয়োজন। এলা রীড এবং বিদ্যা কানুগাও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সকল দেশের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বৃটিশ এবং মার্কিন প্রতিনিধি আণবিক শক্তির ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের দাবী সূচক একটি প্রস্তাব পেশ করেন।

W I D F-এর সভানেত্রী নির্বাচিতা হলেন অতি মর্যাদা সম্পন্না, অতি কোমলা, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাদাম ইউজিন কোঁতোঁ। সহ-সভানেত্রীদের মধ্যে ছিলেন সোভিয়েত, আমেরিকা, স্পেন ও চীনের নেত্রীস্থানীয়া মহিলারা।

W I D F-এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে প্রচণ্ড কাজ—যুদ্ধকালীন সর্বাত্মক ধ্বংস থেকে উদ্ভূত নানা সমস্যার মোকাবিলা, গৃহ সমস্যা, যুদ্ধের সময় কার্যরত কিন্তু এখন বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি নানা কাজ। কালোবাজারী আর মজুতদারী ঠেকানো, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতিও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারপর আছে মেয়েদের নাগরিক অধিকার অর্জন; আইনসভায় আর সরকারে অধিকসংখ্যায় মেয়েদের নির্বাচন, তাদের কর্ম-সংস্থান এবং বেতনের প্রশ্ন, সামাজিক আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়াস চালানোও।

১৯৪৬-এর জুন মাসে W I D F-এর কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হয় পারীতে। এই অধিবেশনে ঔপনিবেশিক দেশগুলির অবস্থা এবং সেখানকার মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং ঔপ-নিবেশিক দেশগুলির বোনেদের সৌহার্দ্যমূলক সাহায্য দান করারও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আরো দুটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়, তার মধ্যে একটি হল, মার্কিন, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আলজিরিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি কমিশন আফ্রিকার ঔপনিবেশিক এলাকা সম্বন্ধে সমীক্ষণের জন্য পাঠানো; এবং বৃটেন, মার্কিন, রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত আর একটি কমিশন পাঠানো এশিয়াস্থিত উপনিবেশগুলি দেখতে।

কার্যকরী সমিতির পরবর্তী অধিবেশনটি হয় মস্কোতে ১৯৪৬-এর ১৫ই অক্টোবর। A I W C হতে নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধির এই সভায় আসার অনুমতি মিলল না A I W C-র কাছ থেকে। A I W C ইনটার-ন্যাশনাল অ্যালায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত হল।

১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে W I D F-এর দুজন প্রতিনিধি প্রথমবার

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলার নারী আন্দোলনের কথা যত বিশদভাবে লিখতে পারব—অন্যান্য প্রদেশের কথা স্বভাবতঃই ততটা লিখতে পারব না।

নারী-আন্দোলনের ভূমিকা যে শুধু সমাজ-সংস্কারের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমিত, এমন সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কম্যুনিস্ট মেয়েদের কখনও ছিলনা। এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে, যে-সমাজে ব্যক্তিগত-মুনাফা ও গণ-শোষণ-ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে গঠিত সরকারের হাতে ক্ষমতা, সেই সমাজে নারীর স্থিতাবস্থাকেই মেনে নিতে হয়; যেহেতু এই সরকারের অধীনে একচেটিয়া ব্যবসা বাড়ে; অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হয়, বেকারী আর দারিদ্র্য বাড়ে; বিশেষ করে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে মানুষের ওপর অর্থনৈতিকভাবে এবং সাবেকী চিন্তাধারার দিক দিয়ে সামন্ত-তান্ত্রিক চাপ বাড়ে এবং সাবেকী অন্ধ-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার বিচারকে কায়েম রাখার জন্য সর্বপ্রকারে সামন্ত-তান্ত্রিক প্রভাব প্রয়োগ করা হয়।

সুতরাং নারীর সবচেয়ে বড় কাম্য তার সন্তান ও পরিবারের জন্য সুখ-শান্তি, খাদ্য আর আশ্রয় এবং নিজের জন্য মর্যাদা ও সমানাধিকারের জীবন—এটুকুর দাবী উঠলেই সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শক্তির কাছ থেকে তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ উঠবেই। সেই জন্যই কম্যুনিস্ট মেয়েরা, কৃষকদের জমির লড়াই, মজুরীর লড়াই, বেগার-প্রথা থেকে মুক্তির লড়াইকে, পর্দা প্রথা, পণ প্রথা, বাল্য-বিবাহ, স্ত্রী-ঠ্যাঙ্গান, বিয়ে এবং উত্তরাধিকারে অসাম্য, সমাজে মেয়েদের হেয় করে রেখে নানা অত্যাচার নিপীড়ন প্রভৃতি সাবেকী সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে নারী সমাজের সংগ্রামের সমগোত্রীয় ভেবেছে। শ্রমিকের রুটি রুজির সংগ্রাম, কাজের জন্য আর ছাঁটাই, লে-অফ এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আর প্রসূতি-কল্যাণ-ব্যবস্থার জন্য, বরখাস্তের বিরুদ্ধে, অসমান মজুরীর বিরুদ্ধে মেয়েদের বিশেষ সমস্যার জন্য লড়াই—এ দুইএর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না।

কম্যুনিস্ট মেয়েরা নারী আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে এল—কিষাণ, ক্ষেত-মজুর, শহরের দরিদ্র বস্তিবাসী, শ্রমিক মেয়ে, শ্রমিকের বউ—যাবতীয় খেটে খাওয়া মেয়ের দলকে। নতুন ধারা বইল নারী আন্দোলনের স্রোতে, চোখে এল নতুন দৃষ্টি। মহিলা সংগঠনগুলিও জীবিকার সমস্যা, দারিদ্রের সমস্যা এবং মেয়েদেরই বিশিষ্ট অন্যান্য সমস্যাগুলিকে তাদের কর্মসূচির আওতায়

নিয়ে এল। কিষাণ-শ্রমিকের লড়াইতে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তি ফৌজ হয়ে লড়ল মেয়েরাও। এই নবচেতনা দলে দলে মেয়েদের, বিশেষ করে আদিবাসী ঘর হতে বের করে নিয়ে এল বাংলার, তেলেঙ্গানার আর হায়দ্রাবাদের তে-ভাগা আন্দোলনে আর মহারাষ্ট্রের ওয়রলি বিদ্রোহে। এদের অনেকেই এল অন্যান্য নারী আন্দোলনেও।

দেশের মুক্তি আন্দোলন এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যেকার যোগসূত্রটি মহাত্মা গান্ধীই প্রথম দেখিয়ে দিলেন। তবু তাঁর বহু অনুগামী, কম্যুনিস্ট মেয়েরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় নারী-আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করে বলে, তাদের প্রকৃত নারী কর্মী এবং তাদের সংগঠনগুলিকে প্রকৃত নারী সংগঠন বলে স্বীকৃতি দেন না; তাঁদের মতানুসারে যে-সব সংস্থা স্থিত সামাজিক-অর্থনৈতিক সীমারেখার মধ্যে থেকে কেবলমাত্র সমাজ সংস্কারের কাজ করে সেই সব সংস্থাই নারী সংগঠন বলে গণ্য হবার যোগ্যতা রাখে। সেই জন্যই অন্যান্য মহিলা সংগঠনগুলি কোন বিশিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে কোন সংযুক্ত প্রয়াস করলে কম্যুনিস্ট মেয়েরা এবং যে-সব প্রতিষ্ঠানে তারা কাজ করে সে সব বাদ পড়ে। কিন্তু একলা চলার ভয় নেই কম্যুনিস্ট মেয়েদের—কারণ তারা এক গতিময় আদর্শে সংকল্প-বদ্ধ, যে আদর্শ হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার—যে সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি হবে এবং তার অধিকার সুরক্ষিত হবে।

যে-সব সংস্থায় কম্যুনিস্ট মেয়েরা কাজ করত—প্রয়োজন হলে সর্বদাই তারা জাতীয় রাজনৈতিক বিষয়কে সেই সব সংস্থার কর্মসূচির অন্তর্গত করে নিয়েছে। ১৯৪২-এর পরের পর্বে সারা দেশ জুড়ে যখন কম্যুনিস্ট-বিরোধী প্রবল ক্রুদ্ধ আন্দোলন চলছে তখনও কম্যুনিস্ট মেয়েরা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের জেলে বন্দী জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় একতার ভিত্তিতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক আন্দোলন করে এসেছে। সুদূর চল্লিশ বৎসর আগে নিজেদের মঞ্চ থেকেই কম্যুনিস্ট মেয়েরা এই আন্দোলনের বাণী পৌঁছে দিয়েছে দূরদূরান্তের দুষ্প্রবেশ্য গ্রামে গ্রামে, সব থেকে পিছিয়ে পড়া এলাকার মেয়েদের কাছে; কিষাণ-মেয়েদের কাছে। তারা যে শুধু ত্রাণ সাহায্য দিতে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালিতেই গেছে তা নয়; তারা যোগ দিয়েছে শান্তি-সেনাবাহিনীতেও যা মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে দাঙ্গার পেছনের চক্রান্তের খেলাকে, ডাক দিয়েছে সর্ব-সম্প্রদায়ের ঐক্যের আর

মৈত্রীর। ঈদের সময় তারা মুসলিম বস্তীতে নিয়ে গেছে মৈত্রীর স্কোয়াড। আর পূজোর সময় তাদেরই চেষ্টায় মুসলমান বোনেরা হিন্দু বস্তীতে এসে পূজোর অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। যে বিরাট শান্তি মিছিলের ফলে মহাত্মাজী অনশন ত্যাগ করতে রাজী হলেন, সেই শান্তি মিছিলে যোগ দিয়েছে কম্যুনিস্ট মেয়েদের প্রতিষ্ঠানগুলিও।

যে-সব জাতীয় রাজনৈতিক বিষয়ের প্রভাব সন্তান এবং পরিবারের ওপর পড়ে সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে মেয়েদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়; সুতরাং এই সব প্রশ্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের সামিল হতে কোন বাধাই থাকা উচিৎ নয় বলেই কম্যুনিস্ট মেয়েরা এবং যে-সব সংগঠনে তারা কাজ করে তারা মনে করে। বিপদের সময় সাহায্য দেওয়াটাকেই তারা একমাত্র কাজ বলে বিবেচনা করে না। তারা মনে করে, যে কারণে সমাজে বিপর্যয় ঘটে তার মূল কারণ খুঁজে বের করে তা জনগণকে বিশেষ করে মেয়েদের বোঝানো দরকার, যাতে তারা চেষ্টা করে, লড়াই করে সমাজের সেই মূল কারণগুলি দূর করতে পারে, যাতে বারে বারে বিপর্যয় না ঘটে এবং বারে বারে, নিঃস্ব হয়ে, আশ্রয়-হীন হয়ে, দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছে ত্রাণ শিবিরে আসতে না হয় তাদের।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুক্তি-যুদ্ধের সঙ্গে শান্তি ও সংহতির প্রশ্ন মেয়েদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত; কারণ জীবনের স্রষ্টা মেয়েরা; সেই সৃষ্ট জীবনকে তারা বুক দিয়ে রক্ষা করে, লালন করে। সেই বুকের ধনেরা আণবিক যুদ্ধের বীভৎসতার শিকার হোক, তা চায় না কোন মা। তাই কম্যুনিস্ট মেয়েরা অনলস সংগ্রাম করে চলেছে বিশ্ব শান্তির জন্য, আণবিক অস্ত্রের ধ্বংসের জন্য, নিরস্ত্রীকরণের জন্য। সমস্ত মেয়ে ও মায়েদের এই একান্ত কাম্যটি বিশ্বের নারী আন্দোলনে ঐক্য ও সংহতির বনিয়াদ।

যারা সাম্রাজ্যবাদ, নির্যাতন, ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব ও বর্ণ-বৈষম্যের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের সঙ্গে শুধু শান্তি ও সংহতি রক্ষাই একমাত্র কাম্য বলে কম্যুনিস্ট মেয়েরা মনে করে না। তারা মনে করে এ প্রশ্ন সারা বিশ্বের নারী ও শিশু-কল্যাণ এবং বিশ্বের মানুষের মানবাধিকারের প্রশ্নের সাথে এক হয়ে আছে। সে সব সংগঠনে কমিউনিস্ট মেয়েরা কাজ করে সেসব জায়গায় মেয়েদের এই কথাই বুঝিয়েছে তারা যে,

রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া শোষণের হাত থেকে প্রকৃত মুক্তি নেই এবং মানবিক মর্যাদাও লাভ করা যায় না। মহাত্মাজীর বাণী শুধু ভারতের পক্ষেই নয়, বিশ্বের নারীজাতির পক্ষেও সত্য। সেই বাণীকে তারা পৌঁছে দিয়েছে জনগণের কাছে, নীচের তলার প্রতিটি মানুষের কাছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা দিবস-টিকে কম্যুনিস্ট মেয়েরা বর্ণ-বৈষম্য-বিরোধী দিবস বলে মনে করে বলে আগস্ট মাসের সেই দিবসটিকে পালন করতে তারা ভোলেনা। পৃথিবীর নিকৃষ্টতম সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারের ফৌজের সঙ্গে ভিয়েৎনামের বোনেরা যখন প্রাণপণে লড়ছিল—তাদের সমর্থন জানাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি কম্যুনিস্ট মেয়েরা। শান্তি যেমন অবিভাজ্য; সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামও তেমনি অবিভাজ্য; এবং দুইই একেবারে এক হয়ে আছে নারীর মুক্তি-সংগ্রাম এবং সন্তান ও পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য সংগ্রামের সঙ্গে। এই হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সংহতির দৃষ্টিকোণ। এবং এই দৃষ্টিকোণই কম্যুনিস্ট মেয়েদের দ্বারা সমর্থিত। এখানেই হচ্ছে কম্যুনিস্ট নারী সংগঠনগুলির বৈশিষ্ট্য।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিবসটি পালিত হয় নারীর অধিকার অর্জনের সংগ্রামের জন্য নতুন করে শপথ নেবার দিন হিসাবে। আন্তর্জাতিক নারী-সংহতির এই দিনটি ক্রমশঃই বেশী স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং এরই মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের শক্তির স্বীকৃতি। শুধু কম্যুনিস্টরাই নয় অন্যরাও এই আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করছেন।

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ভারতে চরম দুর্গতি ও বিপর্যয় এসেছিল। অন্যান্য বহু জাতির ওপর দিয়ে যুদ্ধে যে বিপুল প্রাণহানি ও ধ্বংসের তাণ্ডব গেছে, সে তুলনায় তা কম হলেও তার ব্যাপকতা এমন কিছু কম ছিল না। মানুষ মরেছে লাখে লাখে আকালে আর অনাহারে যে আকাল যুদ্ধের সুযোগে কালোবাজারী আর মুনাফাখোরদের দ্বারা সৃষ্ট; মনুষ্য-সৃষ্ট এই চরম দুর্গতিতে পিষ্ট হয়ে গেছে মানুষ; সে দিকে ফিরেও চায়নি বিদেশী রাজের হৃদয়হীন আমলারা। উজাড় হয়ে গেছে গ্রাম-বাংলা আর তার চাষী, মজুর, ক্ষেতমজুর, কামার-কুমোর-তাঁতী-ছুতোর প্রভৃতি শিল্পীরা। এর মধ্যেও বেশী ভুক্তভোগী নারী আর শিশুর দল। এদের—দেশের এই আসল সর্বহারাদের বাঁচিয়ে তোলা, বাঁচিয়ে রাখা ছিল একটা বড় কাজ। হাতের

পায়ের বেড়ীটি ছাড়া খোয়াবার মত কোন বিত্তই তাদের ছিল না—ছিল শুধু বেঁচে থাকার আশাটুকু। এই আশাটুকুকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করতেই হল সহৃদয় মানুষকে।

তাই সর্বশক্তি নিয়ে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল কম্যুনিষ্ট মেয়েরা। অতি-বামেরা এই ত্রাণের কাজকে সংস্কার-মূলক কাজ বলে দেখেছে। ৪২-এর আন্দোলনের সমর্থকেরা বললেন—এ হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী লড়াইকে এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দী; এঁরা ভাবতেন—যত বেশী গুদাম বাজার লুট হবে, অরাজকতা আর মানুষের দুর্গতি বাড়বে, ততই লড়াই জোরদার হবে। কিন্তু সব নিন্দা, দুর্নাম সয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কম্যুনিস্ট মেয়েরা আর ছেলেরা প্রাণপণ শক্তিতে সর্বহারা মানুষদের বাঁচানোর কাজে, গ্রাম-বাংলাকে বাঁচানোর কাজে, নারীর ইজ্জত বাঁচানোর কাজে এগিয়ে আসতে বিদেশী সরকারকে বাধ্য করার জন্য বিরাট লড়াই-এর মোর্চা গড়ে তুলেছে। প্রাণগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার বিশেষ দরকার হল এই লড়াইএর জন্যই। মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ধুকতে থাকা মানুষ দিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদই হোক আর জাপানী ফ্যাসীবাদই হোক, কারো বিরুদ্ধেই লড়াই চলে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে বেঁচে থাকার এই লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল—বিশেষ করে চাষী শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখা আরো বেশী জরুরী ছিল—কারণ আমাদের মুক্তি সংগ্রামে এরা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেনাদল।

বহু সংখ্যায় সর্বস্তরের মেয়েদের নারী আন্দোলনের সামিল করতে সর্বদাই চেষ্টা করেছে কম্যুনিস্ট মেয়েরা। এখন প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই একটি নারী বিভাগ আছে। রাজনীতি আর মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। এ বিষয়েও অবদান কম্যুনিস্ট মেয়েদের। কিন্তু তফাত হল প্রতিটি দলের নারী বিভাগে শুধু সেই দলের মেয়েদেরই প্রবেশাধিকার থাকে। এই জন্যই সাধারণভাবে নারী-ধর্ষণ, বৌকে পুড়িয়ে মারা, হরিজন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন প্রভৃতির মত বিষয়েও এরা প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারে না। কিন্তু কম্যুনিস্ট মেয়েরা চেষ্টা করেছে তাদের সংগঠনগুলির দরজা সকলের জন্য খোলা রাখতে—কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, লেখিকা, শিল্পী—সর্বস্তর, সর্বমত পথের সকলেই স্বাগত। এবং সকলেই সামাজিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সবরকম রাজনীতিতেই যোগ দেন।

বিশেষ করে কম্যুনিস্ট-বিরোধী উন্মত্ততার দিনগুলোতে একাজ বড় সহজ ছিল না। তবু কাজ এগিয়ে গেছে কর্মীদের আন্তরিকতায়। জীবনকে সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত করে এমন সব জীবন্ত সমস্যা তারা হাতে নিয়েছে—আর তাই সব মত-পথের মেয়েরা এগিয়ে এসেছে কম্যুনিস্ট পরিচালিত সংগঠন-গুলির দিকে। যেখানে বেশীরভাগ কর্মী কম্যুনিস্ট মেয়েরা, সেখানেও অকম্যুনিস্টদের মত নেওয়া হয়েছে এবং তাদের মতকে যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয়েছে। এভাবেই গণসংগঠনগুলি শুধু আয়তনেই বাড়েনি—তারা দলীয়তা, সংকীর্ণতা, ও অগণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি পরিহার করে হয়েছে উদার ও প্রশস্ত; তাই সব রকম মেয়েরাই তাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার সভ্য এবং কর্মকর্তাদের পরিচয়ই এর সাক্ষ্য দেবে।

এর জন্য খাটতেও হয়েছে বিস্তর এবং নানাভাবে। প্রথম দিকে বাড়ী বাড়ী না গেলে মহিলাদের সাক্ষাৎই পাওয়া যেত না। কোন মিটিং করতে হলে—প্রতিটি বাড়ী গিয়ে বলে আসা, দুদিন আগে একবার মনে করিয়ে দেওয়া সেই বাড়ী বাড়ী গিয়ে; আবার মিটিং-এর সময় হলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সবাইকে সঙ্গে করে মিটিং-এ নিয়ে আসা। পথ-সভা তখনকার দিনে তেমন চালু ছিল না। তবু দু একটা সভায় মেয়েরা বলেন নি এমন নয়। কিন্তু মিটিংগুলিতে মেয়েদের ধরে রেখে বক্তৃতা শোনানো এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। তার জন্য উদ্যোক্তাদের নাচ, গান, নাটক ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হত। শুধু ব্যবস্থা নয়—গান, নাটক লেখা, তার প্রযোজনা, অভিনয়াদি সবই করতে হত উদ্যোক্তাদের, কারণ তখন পেশাদারী বিনোদন শিল্পীগোষ্ঠী পাওয়া যেত না। অনুষ্ঠানের প্রায় সব রচনাই হত বাস্তব সমস্যা-ভিত্তিক। মেয়েদের বিনোদন ব্যবস্থা তখন সুলভ্য ছিল না বলে মহিলাদের এসব খুবই ভালো লাগত, তাঁরা জানতেন, শিখতেনও অনেক।

বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শোভাযাত্রাও আন্দোলনের একটি বড় রকম হাতিয়ার ছিল—এর উদ্দেশ্য ছিল বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিষয়টির সঙ্গে মহিলাদের যুক্ত করা এবং তাদের দাবী ও সমস্যাগুলি বৃহত্তর জন-সমাজের গোচর করা।

আজকাল বিধানসভায় শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়া একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু সেই ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের বছর গ্রামের কঙ্কালসার মেয়েদের মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিধানসভার গেটে। কলকাতার মানুষ বিস্ফারিত চোখে শিশু-কোলে সেই কংকালের মিছিল দেখেছিল।

কম্যুনিস্ট মেয়েরাই সেই প্রথম বিধানসভার দরজায় মিছিল নিয়ে যাবার পথিকৃৎ।

উপরতলার মহিলাদের প্রতিষ্ঠানগুলি বিক্ষোভ-প্রদর্শনকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। তাদের ভাষায় এসব কম্যুনিস্ট মার্কা কাজ। কিন্তু পরবর্তী-কালে দেখা গেল যে শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, অ্যাডভোকেটরাও—ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক দলগুলির মতোই দাবী জানাবার জন্য নেমে আসছেন পথে। এবং এই পথে নেমে মিছিল করে বিক্ষোভ প্রকাশ করাটাই এখন একটি স্বীকৃত পন্থা। ৪০ বছর আগে এই পদ্ধতির পথ দেখিয়েছিল কম্যুনিস্ট মেয়েরাই।

নারী সংগঠনগুলি ছড়িয়ে পড়েছে শহর ছেড়ে গ্রামে গ্রামান্তরে। ছোট-খাট বৈঠক থেকে আজ হয়েছে বৃহৎ গণসংগঠন। তার কাজেরও সুর পাল্টেছে। আজ তার কাজ শুধু গরীবের উপকার, কটা সেলাই-কেন্দ্র, কটা আশ্রম, বা স্কুল খোলায় সীমিত নেই। এগুলির গুরুত্ব আছে, কিন্তু ঐটুকুই সব নয়। আজকের প্রয়োজন এক বৃহৎ আন্দোলনের, যে আন্দোলন শোষণ, অসাম্য আর অমর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলবে—বুঝবে প্রয়োজন সমাজের সম্পূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর। সেদিন মানুষের জন্য এক শান্তি মৈত্রী স্বাধীনতার পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল সবার চোখে। তাই গড়ে তোলা হল আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক আর সামাজিক সমস্যার মধ্যে রইল না কোন ভেদ।

এই আদর্শই সামনে রেখে চলেছিল কম্যুনিস্ট মেয়েরা। এই আদর্শ যে নির্ভুল ছিল, তা আজ বৃহত্তর স্বীকৃতি পেয়েছে।

কিন্তু লড়াইয়ের জিৎ এখনও হয় নি। আরো ব্যাপক, আরো বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই সমাজ থেকে শোষণ যাবে—আর নারী পাবে সাম্য আর মর্যাদার জীবন; সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীই হবে শিশুর নিরাপত্তা আর সুখের নিকেতন।